শিবব্রত বর্মন
রোমেন রায়হান • আদনান মুকিত

আগস্ট ২০২৫ । দাম ৫০ টাকা

কণ্ঠ

কিশোর আলো

একদিন ছুটি হবে

Fresh Classroom-এ
বাধাহীন
থাকো লেখালিখিতে

Fresh
Stationery

সব মামার সেরা

বিস্কি ক্লাব

মামা

ওয়েফার



ওয়ান্ডার

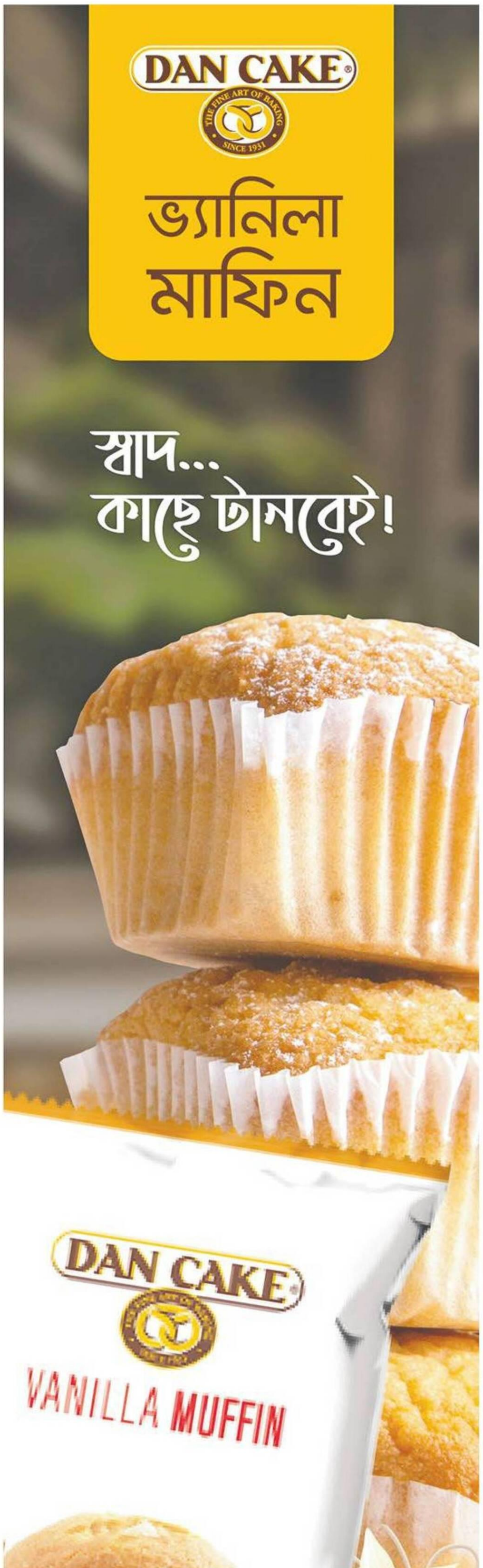
মাফিন কেক

চকলেটি স্বাদে ভরপুর





বাইটে বাইটে ওয়ান্ডার



কিশোর আলো

আগস্ট ২০২৫, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩২
৫০ টাকা ● বর্ষ ১২ ● সংখ্যা ১১

কথা বলো...

মাইলস্টোন কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় যে বিপর্যয় ঘটে গেছে, তা আমাদের সবাইকে বিমর্ষ করে রেখেছে। এই আঘাতে আমরা এখনো শোকাহত হয়ে আছি।

পরিবারগুলোর দুঃখ-বেদনার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারছি না। আহত ব্যক্তিদেরও কত কষ্ট হচ্ছে। স্কুলের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মচারী, অভিভাবক—সবাই এখনো ট্রমার মধ্যে আছেন।

আমরা সবার মঙ্গলের জন্য দোয়া করি, প্রার্থনা করি। সবার সুস্থতা প্রার্থনা করি।

যাদের মনে কষ্ট হচ্ছে, তাদের জন্য পরামর্শ হলো, বড়দের সঙ্গে কথা বলো। কথা বললে মনের ভার কমে যায়। আকাশে মেঘ জমলে বৃষ্টি হলেই কেবল আকাশ পরিষ্কার হয়।

স্কুলের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মী ও অভিভাবকেরা মনোচিকিসকের পরামর্শ নিতে পারেন।

আমরা কিশোর আলোয় ডা. মোহিত কামালের পরামর্শ অনলাইনে প্রকাশ করেছিলাম। পড়ে নিতে পারো।

রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে, বর্ষার দিনে সবাই শুনি। এমন দিনে তারে বলা যায়। সেই গানে আছে :

নামাতে পারি যদি মনোভার?
শ্রাবণবরিষনে একদা গৃহকোণে
দু কথা বলি যদি কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার!

খেয়াল করে দেখিনি, আজ দেখছি, যদি তুমি তোমার বাবা-মা, বন্ধু কিংবা মনোচিকিৎসকের কাছে বসে দুটো কথা বলো, তোমার মনের ভার নেমে যেতে পারে।

আনিসুল হক

অনিবার্য কারণে এ সংখ্যায় ফাহিম আনজুম রুম্মানের ধারাবাহিক কমিকস 'কেমন করে উড়তে হয় না' প্রকাশিত হলো না। পরের সংখ্যা থেকে কমিকসটি নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক : আনিসুল হক
সহযোগী সম্পাদক : আদনান মুকিত
জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক : আহ্‌সাদ মুদ্দাসসের
শিল্পনির্দেশক : সৈয়দ লতিফ হোসাইন
গ্রাফিকস : মাহ্‌বুব রহমান, রনী হোসেন
ম্যাগাজিন সমন্বয়ক : শাহাদাত ফয়েজ ওয়াইসি
বিপণন ব্যবস্থাপনা : মো. মহিউদ্দিন রওনক
মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা : শামসুল হক

প্রচ্ছদ : আরাফাত করিম

প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮ কর্তৃক মুদ্রিত।
যোগাযোগ : কিশোর আলো, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩ । ওয়েবসাইট : www.kishoralo.com
ই-মেইল : editor@kishoralo.com
ফেসবুক : fb.com/kishor.alo। ইনস্টাগ্রাম : instagram.com/kishoralo

পরিবেশক : প্রথমা ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

সূচিপত্র

ছড়া

১০ | আমাদের আর পড়াশোনা নেই
রোমেন রায়হান

১১ | আইডি কার্ডে ছবিটা নেই!
আহমেদ সাব্বির

প্রচ্ছদ রচনা

১৭ | ওরা ভাসছিল কাগজের প্লেনের স্বপ্নে
সুজন সুপান্থ

২০ | আজ আমাদের ছুটি...
রাজীব হাসান

গল্প

২৪ | মল্লিকদের বাড়ি
শিবব্রত বর্মন

৩০ | পাতালপুরী
নাবিল মুহতাসিম

৩৬ | আমাদের অদ্ভুত ফ্যামিলি
আদনান মুকিত

ধারাবাহিক উপন্যাস

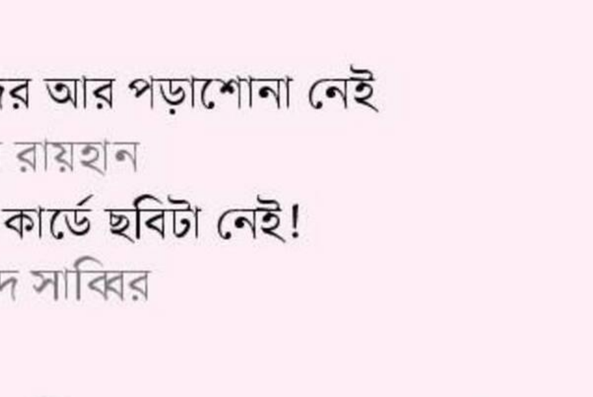
৪০ | অয়ন-জিমি : অভ্রভেদী
ইসমাইল আরমান

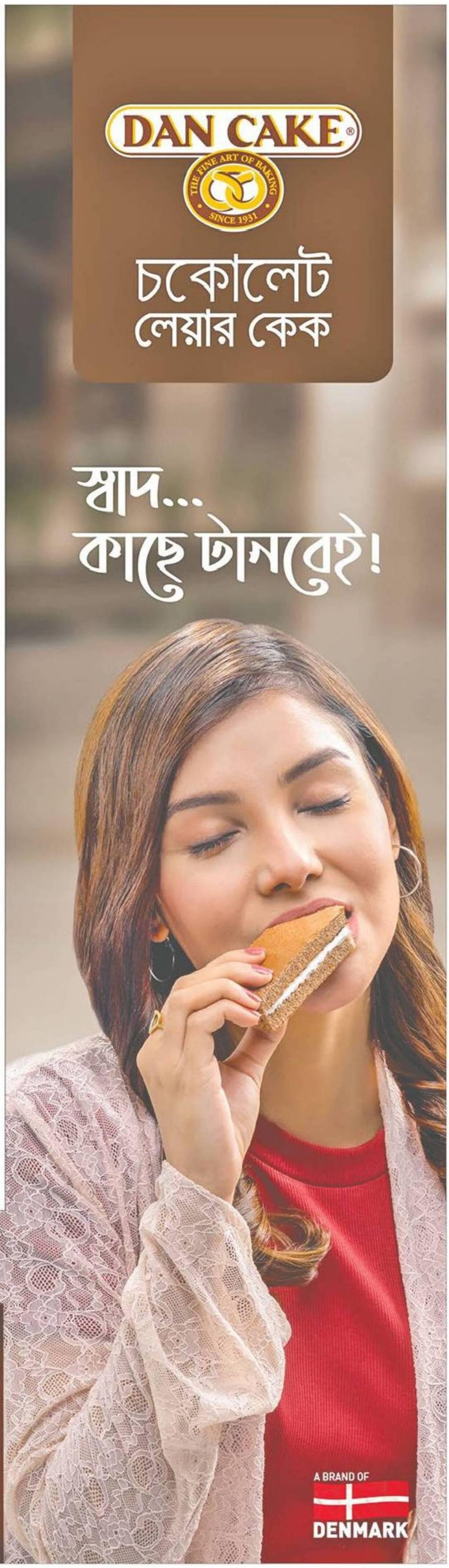
ফিচার

৪৮ | বৃষ্টিভেজা কৈশোর
আবদুল গাফফার রনি

নিজেকে জানো

৫৪ | তুমি কতটা পরিশ্রমী
আহমাদ মুদ্দাসসের







সূচিপত্র

বিচিত্র

৫৮ | পৃথিবীর মতো আরেকটা পৃথিবী!
সুজন সুপান্থ

গেমস

৬২ | যেভাবে গড়ে উঠেছে মাইনক্রাফট জেনারেশন
আসহাবিল ইয়ামিন



খেলা

৬৯ | টি-টোয়েন্টিতে নতুন স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ
মৃণাল সাহা

ফুটবল

৭১ | ঋতুপর্ণা-মারিয়াদের যে লড়াইয়ের গল্প কেউ জানে না
বদিউজ্জামান মিলন

ধারাবাহিক কমিকস

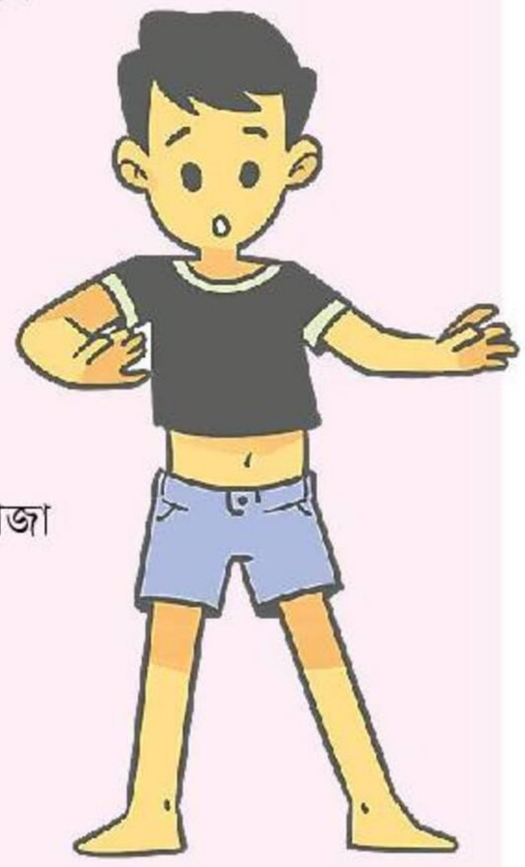
৭৬ | জাদুশিলা রহস্য
গল্প ও পেনসিল : মেহেদী হক
ইঙ্ক ও রং : সব্যসাচী চাকমা

৮০ | অ্যাডভেঞ্চার অব ইলু বিলু
লেখা : আদনান মুকিত
আঁকা : সব্যসাচী চাকমা

কমিকস

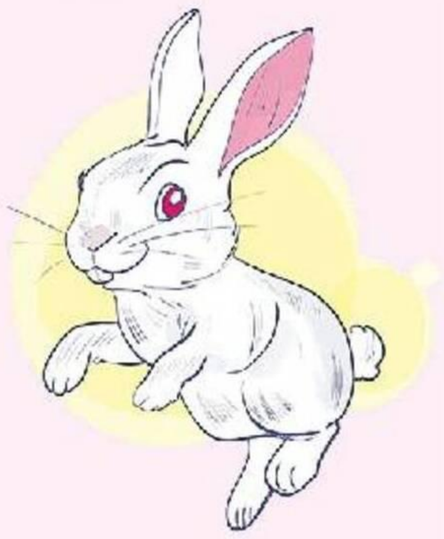
৮২ | দেখা
তানভীর আহমেদ

৮৭ | তাতা
বাসব রায়

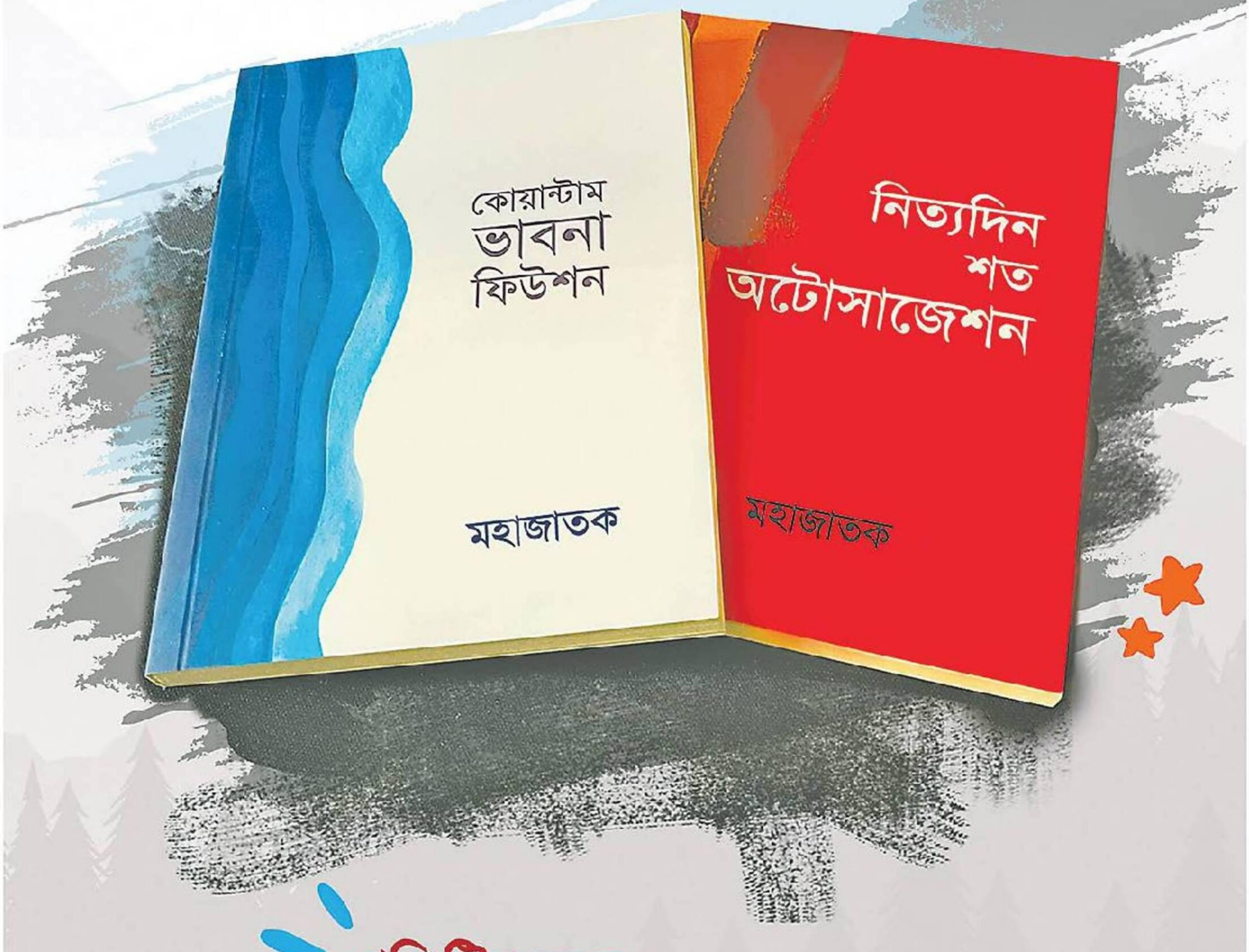


নিয়মিত বিভাগ

৬ | চিঠিপত্তর
১২ | আমরা সবাই রাজা
২২ | জন্মদিন
৩৯ | শব্দের খেলা
৬১, ৯২ | আয়োজন
৬৫ | অরিগ্যামি
৬৬ | স্বাস্থ্য
৭৪ | মিম
৮৮ | বুদ্ধির ব্যায়াম
৯০ | গণিতের ধাঁধা
৯২ | কিআড্ডা
৯৩ | কুইজ



সুখী সফল জীবনের শত সূত্র



প্রতিটির মূল্য
৫৫ টাকা মাত্র

অর্ডার করুন
০১৩২৯৭৪৬৬০৪

quantummethod.org.bd



প্রিয় কিআ,
তোমার ওপর রেগে আছি। কেন রেগে আছি, তা নিজেও জানি না। বেশির ভাগ পাঠকই তোমার ওপর রেগে চিঠি পাঠায়, হুমকি দেয়। তারপর তুমি তাদের চিঠি ছাপাও। এই নিষ্পাপ শিশু-কিশোরদের রাগানো কি উচিত তোমার? এটা অপরাধ। চিঠি তো ঠিকই ছাপাও, রাগানোর পর।

চারদিকে শুধু রাগের ছড়াছড়ি। রাগ নিয়ে একটা সংখ্যা বের করলে কেমন হয়? যদিও আগে 'নিজেকে জানো' বিভাগে রাগ নিয়ে লিখেছ, তবু আরেকটা রাগ নিয়ে সংখ্যা বের করো। সেখানে রাগ নিয়ে বিভিন্ন গল্প, কবিতা, কমিকস থাকবে। সারাক্ষণ ভূত সংখ্যা নিয়ে থাকলে হবে না। রাগের কি কোনো দাম নেই? বাংলাদেশের নিষ্পাপ শিশু-কিশোরদের মূলত তুমিই রাগাও, তারপর দোষ হয় আমাদের, আমরা নাকি হুমকি দিই। এসব আর মানব না। 'রাগ সংখ্যা' বের না করলে তোমার সব রাগী পাঠককে নিয়ে ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকায় হামলা করব। দূরে থাকি তো কী হয়েছে? টিকিট কেটেছি তোমাকে শায়েস্তা করার জন্য।

(রাগিণী) জারিন আহমেদ
ষষ্ঠ শ্রেণি, সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা

কিআ : চমৎকার আইডিয়া। এই সংখ্যায় এমন সব আয়োজন থাকবে, যেন তোমাদের রাগ আরও বেড়ে যায়। ধরো, চিঠিপত্তর বিভাগটাই থাকল না। কুইজ আছে, কিন্তু কবে কোথায় পাঠাতে হবে ঠিকানা নেই। নিজেকে জানোতে প্রশ্ন আছে, কিন্তু উত্তর নেই। আমরা সবাই রাজায় লেখা আছে, কিন্তু তোমাদের নাম ছাড়া...আর সব শেষে লেখা থাকবে—এই কিআ পড়ে রাগে ছুড়ে ফেলতে হবে। মজা না?

সিরিয়াসলি বলি, রাগ নিয়ে সংখ্যা করা যেতে পারে। একটু চিন্তা করে দেখি। তবে আমাকে শায়েস্তা করার জন্য বিশেষ টিকিট চালু হয়েছে জেনে ভালো লাগল। কোথায় পাওয়া যায় এমন টিকিট?

প্রিয় কিআ,
কত দিন তোমায় লিখিনি, জানো? এ বছরে এটাই প্রথম। কী করব বলো, নতুন ক্লাসে ওঠার পরই পড়াশোনার এমন চাপে পড়ে গেছি! শুধু আমি নই, আমার অন্য বন্ধুদেরও একই অবস্থা। তবে কোনো চিন্তা কোরো না, তোমার প্রতিটি সংখ্যাই খুব ভালো করে পড়েছি। এবারের ভূতের গল্পগুলো দারুণ লেগেছে। বিশেষ করে 'ওলা ওঠা' গল্পটি চমৎকার ছিল। সবার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি অনেক স্কুলেই যাচ্ছ। আমাদের স্কুলে কবে আসছ? আমাদের এখানে কিন্তু তোমার প্রচুর পাঠক আছে (প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে। এখানে এলে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব)। যদিও অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা চলছে, তবু পাঠ্যবইকে সরিয়ে রেখে তোমায় লিখতে বসেছি। এবার বিদায় বলতে হবে, নয়তো পাঠ্যবই আবার আমায় বিদায় বলে দেবে!

মাইদা জারিয়াত
নবম শ্রেণি, কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম

কিআ : কী খবর মাইদা? আমিও ভেবেছিলাম, নিশ্চয়ই পড়ার চাপে ব্যস্ত তুমি। তোমাদের স্কুলে কবে আসব? কঠিন প্রশ্ন। ধরো, গিয়ে দেখলাম, তোমরা সবাই পড়ার চাপে পিষ্ট। আমার সঙ্গে দেখা করার সময়ই নেই। তখন কী হবে? ভালো হয়, তোমরা একটা সময় বলো। তারপর দেখি যাওয়া যায় কি না।

প্রিয় কিআ,
তোমার কাছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল। সেটা হলো—তোমার কুইজের উত্তর তো অনেকেই পাঠায়, এমনকি আমিও। যদিও তুমি আমার উত্তরটা কখনো নাও না। তোমরা লটারি করো, নাকি সবার হাতে কিআ পৌঁছে যাওয়ার পর যে সবার আগে উত্তর পাঠায় তারটাই নাও?

আহনাফ তাহমিদ ওয়াসির
সপ্তম শ্রেণি, খুলনা জিলা স্কুল, খুলনা

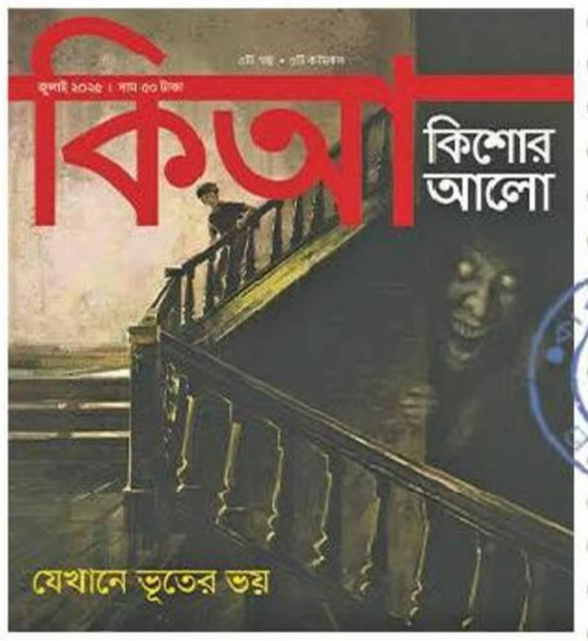
কিআ : আমাদের কিছু রোবট আছে। ওরা খাম খুলে সঠিক উত্তরটা বেছে দেয়। তারপর আমরা লটারি করি। বলতে পারো এটা কিআ প্রকাশের সর্বশেষ কাজগুলোর একটা। আর যে রোবটের কথা বললাম শুরুতে, ওরা আসলে রোবট নয়, মানুষ। সবাই কিআর স্বেচ্ছাসেবক। কিন্তু চিঠি বাছাইয়ের কাজটা ওরা করে রোবটের মতো, যেন কোনো ক্লান্তি নেই।

প্রিয় কিআ,
গত ২১ জুলাই ঢাকার মাইলস্টোন স্কুলে বিমান বিধ্বস্ত হয়েছিল। কত নিরীহ শিক্ষার্থী নিহত এবং আহত হয়েছে, ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। না জানি কত পরিবারে শোকের ছায়া। যে পরিবারগুলো তাদের স্নেহের তারাগুলোকে হারিয়েছে, তাদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। আমার কাছে থাকা সব কিআ ঘেঁটে মাইলস্টোন স্কুলের কয়েকজন শিক্ষার্থীর নাম খুঁজে বের করেছি, যাদের নাম ও লেখা কিআয় ছাপা হয়েছে। প্রথমেই রাইনা হোসেনের কথা বলি। সেপ্টেম্বর ২০২৪ সংখ্যায় 'কে ভিন্ন' বিভাগের কুইজ জিতেছিল সে। তারপর এপ্রিল ২০২৫ সংখ্যায় 'সুডোকু' বিভাগে এবং জুন ২০২৫ সংখ্যায় 'কাকুরো' বিভাগে কুইজ জিতেছিল। এরপর সাদিয়া তাসনিমের কথা বলি। মার্চ ২০২৫ সংখ্যায় 'মিম' বিভাগে তার মিম ছাপা হয়েছিল। তারপর জানুয়ারি ২০২৫ সংখ্যায় 'আমরা সবাই রাজা' বিভাগে নাবিলা নাহরীন ও সাবীন ইয়াদীদ ইসলামের লেখা যথাক্রমে 'তুই কি আমার বন্ধু' ও 'আশা না হারানোর গল্প' ছাপা হয়েছিল। আবার মার্চ ২০২৪ সংখ্যায় 'আমরা সবাই রাজা' বিভাগে জিমি রহমানের লেখা 'বিস্কুট কে দিল' ছাপা হয়েছিল। আশা করি তারা সবাই ভালো আছে এবং সুস্থ আছে। আমি তাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

রেদুয়ান ইসলাম
অষ্টম শ্রেণি, পঞ্চগড় বিষ্ণু প্রসাদ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, পঞ্চগড়

কিআ : তুমি একটা অসাধারণ কাজ করেছ। সত্যি, অসাধারণ। আমাদের কাছে মাইলস্টোন স্কুলের যাদের নম্বর ছিল, আমরা তাদের কল দিয়ে খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যোগাযোগ করতে পারিনি। তোমার মতো আমরাও আশা করি, সবাই সুস্থ আছে।

প্রিয় ক্রূর কিআ,
সম্বোধনটা খুব যৌক্তিক। আমার ক্ষেত্রে তুমি কিছুটা ক্রূর বটে! তবে দিন শেষে কিশোর আলো নামটা আমার কাছে সদা জাজ্বল্যমান। আমি জানি, নিত্যনতুন আবদারের জনস্রোতে তোমার নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা হয়। তুমি পরিশ্রমী, এটাও



তোমার চিঠি ও লেখা পাঠাও এই ঠিকানায়

চিঠিপত্তর, কিশোর আলো
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
ই-মেইল : editor@kishoralo.com
ফেসবুক : fb.com/kishor.alo
ওয়েবসাইট : www.kishoralo.com

জানি। কিন্তু মস্তিষ্কে হতাশার পিঁপড়া আলতো করে হুল ফুটিয়ে দেয় যখন, আমি তখন উপলব্ধি করি, আমার করা প্রতিটি আবদার তুমি সযত্নে ডাস্টবিনে ফেলে দাও। আগেরবারের মতো অনর্থক হুমকি দেব না। শুধু জেনে রাখো, আমার খুব ম্রিয়মাণ লাগে। আচ্ছা থাক, বিষাদটাকে না হয় আপাতত শিকেয় তুলে রাখলাম। কেমন যেন ফেসবুকের স্ট্যাটাসের মতো লাগছে। সে যাকগে, বই পড়া নিয়ে তুমি সংখ্যা প্রকাশ করছ জেনে কী যে ভালো লাগে! আচ্ছা কেমন হয়, লেখালেখি নিয়ে একটা সংখ্যা বের করলে? বেশ হয় কিন্তু! সেখানে থাকতে পারে লেখালেখি নিয়ে বিভিন্ন টিপস, 'নিজেকে জানো' বিভাগে থাকতে পারে আমরা লেখক হওয়ার যোগ্য কি না, বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত। যাহোক, সবকিছুর কম্বিনেশনটা তুমিই ভালো করতে পারবে। এদিকে সৃষ্টিকর্তাই জানেন যে আমার আইডিয়াটাকে ঠুনকো মনে করে তুমি আবার কিআ কার্যালয়ের বাইরে ফেলে আসো কি না! লেখালেখিতে আগ্রহী নয়, বই পড়ে না—জড় বস্তুর একটু অসুবিধা হতে পারে ওই সংখ্যায়। তবে বিশ্বাস করো, আমি মনে করি, তোমার বদৌলতে প্রত্যেক কিআ পাঠকই তার আগ্রহের বাইরের বিষয়াদি সম্পর্কে জানতে কৌতূহলী হচ্ছে। আপন করে নিচ্ছে অন্যের মতামত। 'পরমতসহিষ্ণুতা' নামক মূল্যবোধটা তো তোমার কাছেই শেখা। পরিশেষে একটাই স্থায়ী চাওয়া, ভালো থেকো। কেননা তুমি ভালো না থাকলে আমরাও নেতিয়ে পড়ি যে!

[বি.দ্র. যদিও তোমার কাছে আইডিয়াটা অবলা, তবু আমার ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয় তবে প্রকাশিত সংখ্যায় কথাসাহিত্যিক হান কাংকে নিয়ে লিখতে ভুলো না কিন্তু!]

ইচ্ছা
অষ্টম শ্রেণি, কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম

কিআ : খুবই সুন্দর লিখেছ। কথা দিচ্ছি, তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে। লেখালেখি নিয়ে আমরা আগেও সংখ্যা করেছি। কিন্তু তুমি যেভাবে গুছিয়ে লিখেছ, তোমার সম্মানে আবারও লেখালেখি নিয়ে সংখ্যা না করলে অন্যায় হবে। অনেকগুলো আইডিয়া দিয়েছ তুমি। কয়েকটা কিন্তু তুমি নিজেই লিখে পাঠাতে পারো। তুমি ভালো লেখো, এটা তোমার কাছে কোনো ব্যাপারই না। ভালো থেকো।

প্রিয় কিআ,
তুমি ভাবতে পারবে না জুলাই সংখ্যার 'কে হবে আগামীর বিটিএস' লেখায় এনহাইপেনকে দেখে আমি কত্ত বড় লাফ দিয়েছি। সিলিংয়ে মাথা ঠুকে যাচ্ছিল প্রায় (উচ্চতার দিক থেকে আমাকে খাটোই বলতে পারো)। তাহলে বুঝতেই পারছ, আমি কতটা খুশি হয়েছি। যদিও অনেকের বিষয়টা পছন্দ না-ও হতে পারে, তবু আমাদের মতো কে-পপ ফ্যানদের আবদার তুমি রেখেছ, এটাই অনেক। আমি তোমাকে নিয়মিত চিঠি লিখি বলব না, তবে প্রায়ই লিখি। তুমি ছাপবে, সে আশায় লিখি না। কিছু বেস্ট ফ্রেন্ড থাকে না, যারা উত্তর না দিলেও তাদের সঙ্গে কথা শেয়ার করতে ভালো লাগে? তুমিও আমার সে রকম বেস্ট ফ্রেন্ড। তোমাকে চিঠি পাঠিয়েই আমি খুশি। আমি যখন থেকে পুরো বাক্য বানান না করে পড়তে শিখেছি, তখন থেকে তোমার নিয়মিত পাঠক। সেই ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে। বুঝতেই পারছ, আমার পুরো শৈশব আর কৈশোর, দুটোই তোমার সঙ্গে। আমার বাসায় কিন্তু তোমার একজন বিশেষ পাঠক আছেন—আমার বাবা। নামটা তোমার 'কিশোর আলো' হলেও তোমাকে প্রতি মাসে বাসায় আনার পর আমার কিংবা আমার ভাইয়ের আগে বাবাই তোমাকে পড়ে শেষ করে ফেলেন, হা হা। এভাবেই সব সময় আমাদের আনন্দ দিয়ো। ভালো থেকো আমার প্রিয় বন্ধু।

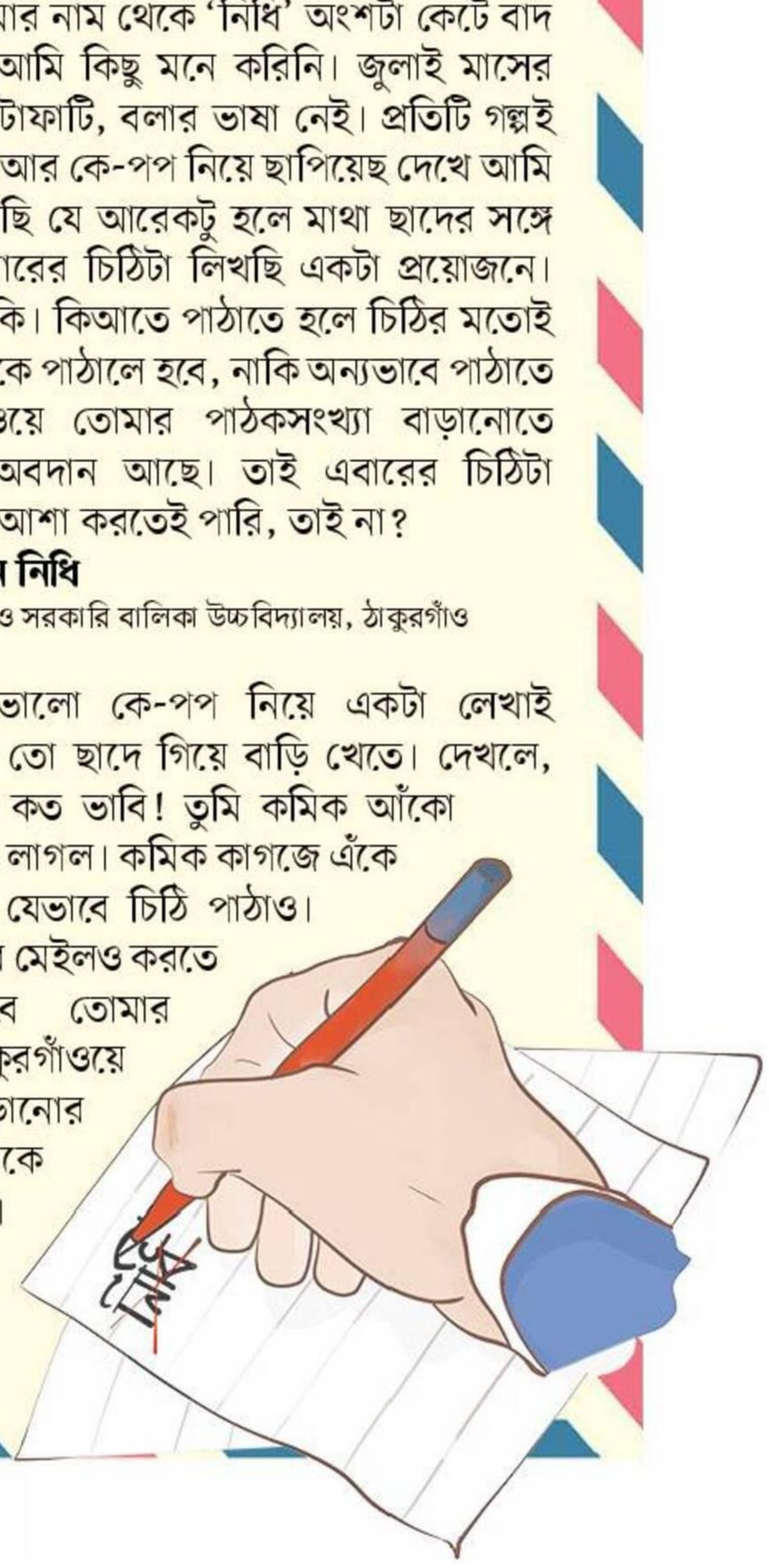
নুযহাত ইসলাম
এসএসসি পরীক্ষার্থী ২০২৫, বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, বরিশাল

কিআ : ভাগ্যিস সিলিংয়ে মাথা ঠুকে যায়নি তোমার। সিলিংয়ের যদি কিছু হয়ে যেত? কী জবাব দিতাম তোমার বাবাকে? অনেক পুরোনো পাঠক তুমি। এত দিন ধরে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ তোমার বাবাকেও। সবাই ভালো থেকো।

প্রিয় কিআ,
চিনতে পারছ আমাকে? দুবার চিঠি ছাপিয়েছিলে আমার এবং দুবারই আমার নাম থেকে 'নিধি' অংশটা কেটে বাদ দিয়েছ। অবশ্য আমি কিছু মনে করিনি। জুলাই মাসের সংখ্যাটা এত ফাটাফাটি, বলার ভাষা নেই। প্রতিটি গল্পই অসাধারণ ছিল। আর কে-পপ নিয়ে ছাপিয়েছ দেখে আমি এমন লাফ দিয়েছি যে আরেকটু হলে মাথা ছাদের সঙ্গে লেগে যেত! এবারের চিঠিটা লিখছি একটা প্রয়োজনে। আমি কমিক আঁকি। কিআতে পাঠাতে হলে চিঠির মতোই কাগজে এঁকে ডাকে পাঠালে হবে, নাকি অন্যভাবে পাঠাতে হবে? ঠাকুরগাঁওয়ে তোমার পাঠকসংখ্যা বাড়ানোতে আমার যথেষ্ট অবদান আছে। তাই এবারের চিঠিটা ছাপাবে, তা তো আশা করতেই পারি, তাই না?

আমায়রা হোসেন নিধি
অষ্টম শ্রেণি, ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও

কিআ : ভাগ্য ভালো কে-পপ নিয়ে একটা লেখাই ছেপেছি। নইলে তো ছাদে গিয়ে বাড়ি খেতে। দেখলে, তোমাদের নিয়ে কত ভাবি! তুমি কমিক আঁকো জেনে খুব ভালো লাগল। কমিক কাগজে এঁকে পাঠাতে পারো। যেভাবে চিঠি পাঠাও। আবার স্ক্যান করে মেইলও করতে পারো। যেভাবে তোমার সুবিধা। ঠাকুরগাঁওয়ে পাঠক বাড়ানোর কারণে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আশা করি, তুমি আরও পাঠক বাড়াবে।





প্রিয় কিআ,
শুনেছি তুমি নাকি ই-মেইলের চিঠির উত্তর দাও না। জানি না তুমি আমার চিঠি ছাপাবে কি না। কিন্তু আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানাতে চিঠি লিখছি। আমি আমার বাসার রান্নাঘরের পাশে আমগাছে দুই দিন এক জোড়া সাদা-ধূসর রঙের ঘুঘু দেখেছি। *প্রথম আলোয়* প্রায়ই দেখি অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি কোনো দুর্লভ প্রাণী বা উদ্ভিদের ছবি এবং এর সম্পর্কে লেখা পাঠান। আমি তো ওনাদের মতো জ্ঞানী-গুণী নই। আর তুমি যেহেতু *প্রথম আলোর* বন্ধুর মতো (ছোট ভাইয়ের মতো), তাই তোমাকে এ সম্পর্কে জানালাম। আমি সাদা ঘুঘু সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না। শুধু জানি সহজে দেখা যায় না। কিন্তু তুমি যদি আমাকে এ সম্পর্কে বলো, আমি খুব খুশি হব।

ফাইজা আদিফাহ
অষ্টম শ্রেণি, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর

কিআ : এত অল্প জায়গায় সাদা ঘুঘু সম্পর্কে বলা কঠিন। আর আমি পাখিবিশেষজ্ঞ নই, ঘুঘুদের সম্পর্কে ভুল বলে ফাঁদে পড়তে চাই না। তবে তুমি ঠিকই বলেছ। সাদা ঘুঘু সচরাচর দেখা যায় না। তোমাকে পরের সংখ্যায় সাদা ঘুঘুর গল্প শোনাব। আপাতত এটা ট্রেইলার। আর হ্যাঁ, শোনা কথায় কান দিতে হয় না, বুঝেছ তো?

প্রিয় কিআ,
জুলাই মাসের সংখ্যাটা ছিল অসাধারণ। 'পেত্তুনি' গল্পটা আমার এত ভালো লেগেছে, যা বলার বাইরে। কিন্তু আমার মন খারাপ। আমার পরীক্ষা এখনো শেষ হয়নি। এ চিঠিটি ছাপিয়ে মন ভালো করে দাও। এটি আমার প্রথম চিঠি, তাই কোনো আবদার নেই। আজকে এটুকুই। ভালো থেকো।

নাফিস তাজুয়ার
ষষ্ঠ শ্রেণি, রানী বিলাসমণি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, গাজীপুর

কিআ : পরীক্ষা নিয়ে মন খারাপ কোরো না। মানুষ মাত্রই পরীক্ষা। এটাই বাস্তব। আশা করি তোমার পরীক্ষা ভালো হয়েছে।

প্রিয় কিআ,
আমি এত দিন শুধু আমার বন্ধুদের মুখেই তোমার নাম শুনেছি। আমিও এখন কিআ-যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছি। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাসার সামনের দোকান থেকে একটা কিআ কিনে এনেছি। আর এখান থেকে কিছু চিঠি ও কিছু গল্প পড়েছি (কমিকসগুলো যদিও বুঝতে পারছি না)। কিআ আমার খুবই ভালো লাগছে। তাই আজ থেকে আমি তোমার সঙ্গে সুন্দর এই পথচলা শুরু করব।

মো. আবদুল্লাহ আল আতিপ
অষ্টম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

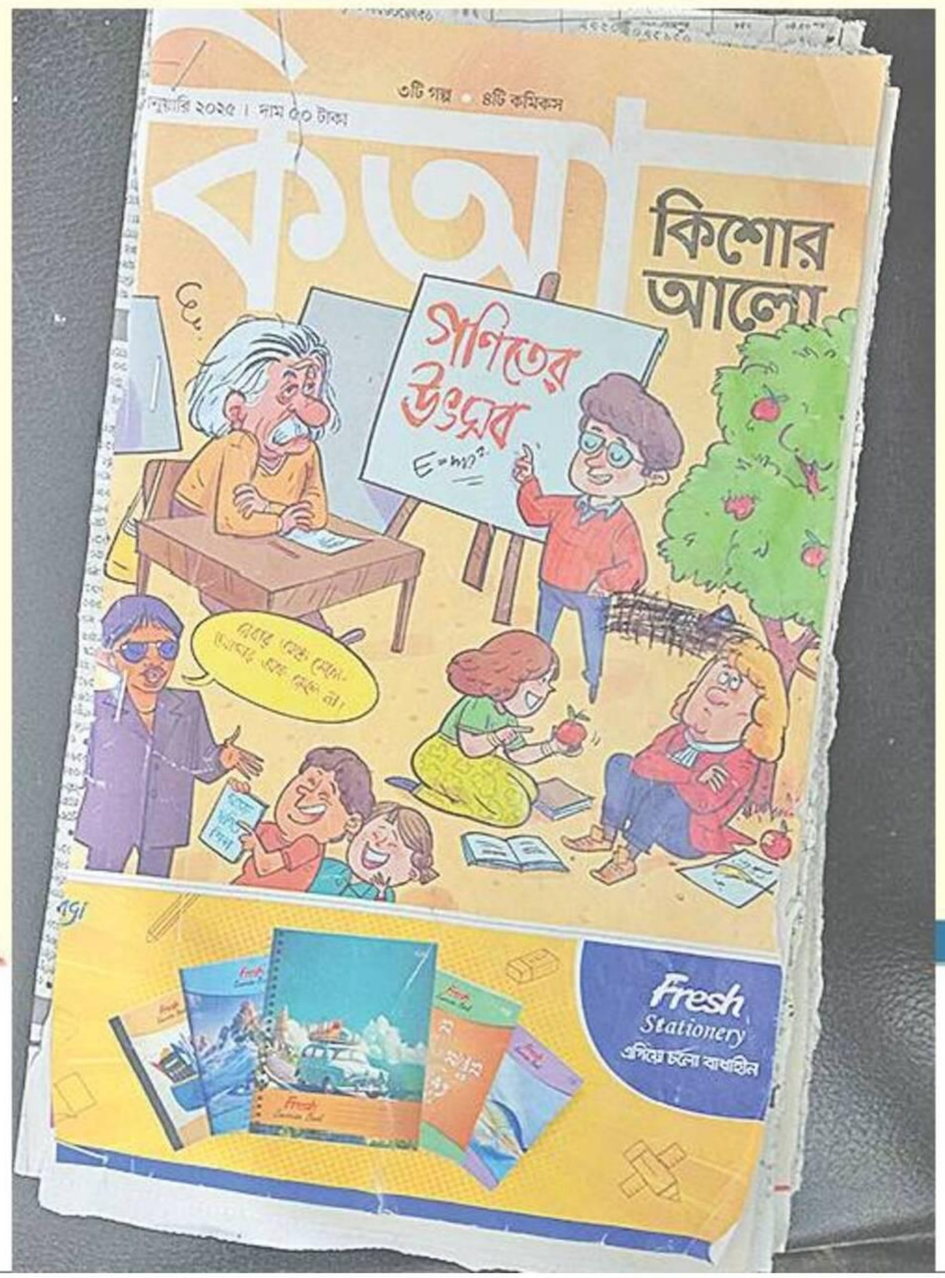
কিআ : আমার মনে হয় ধারাবাহিক কমিকসগুলো বুঝতে পারছ না, যেহেতু অনেকগুলো পর্ব তুমি মিস করেছ। তোমাদের জন্য আমরা কমিকসগুলো কিশোর আলোর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করব। সেখানে তোমরা সব পর্বই পাবে।

প্রিয় কিআ,
কী বলব দুঃখের কথা! জুনের ২৪ তারিখ থেকে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র হওয়ায় পরীক্ষা শেষ হবে আগস্টের ১১ তারিখ। কিন্তু আমার পরীক্ষা ১১ তারিখেও শেষ হবে না। পরীক্ষার মাঝেই জুনের ২৯ তারিখ থেকে টাইফয়েড জ্বরে ভুগছি। তারপর জুলাইয়ের ৫ তারিখ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আমাকে। ১০ তারিখ রিলিজ পাই। হাসপাতালে ভর্তি থাকায় আমার একটি পরীক্ষা মিস হয়। কষ্টের কথাগুলো শুধু তোমাকেই বলতে পারছি। তারপর বাবা তোমাকে বাসায় নিয়ে আসে। আমি দুই ঘণ্টায় তোমাকে পড়ে শেষ করে ফেলেছি। আমার মন ভালো নেই। অসুস্থতার কারণে পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটেছে। বোরিং সময়ে আমাকে সাহায্য করার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। ভালো থেকো। বিদায়।

মুহাম্মদ মুস্তাবীন শরীফ
সপ্তম শ্রেণি, বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম

কিআ : খুবই দুঃখের ব্যাপার। টাইফয়েড খুব মারাত্মক রোগ। ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া না করলে লম্বা সময় ভোগাবে তোমাকে। শাকসবজি আর ফল খাবে বেশি করে। আর পানি খাওয়ার ব্যাপারে খুব সতর্ক থেকো। বাইরের খাবার যত কম খাবে, ততই ভালো। খুব দ্রুতই তোমার মন ভালো হয়ে যাবে আশা করি। ভালো থেকো।

প্রিয় কিআ,
আগের চিঠিটাতে নকল কিআর ছবি পাঠাতে বলেছিলে। এই যে সেই ছবি। এটা তৈরি করতে আমার 'গণিতের উৎসব' কিশোর আলোর প্রচ্ছদ ছিঁড়তে হয়েছিল (R.I.P গণিতের উৎসব) এরপর সেটা কিছু পেপারের সঙ্গে স্টেপল করেই তৈরি করে ফেলেছি নকল কিআ! (দেখতে একটু ছেঁড়া বা নষ্ট, কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না! কারণ, আসলে লাইব্রেরিতে থাকা সব কিশোর আলোই হালকা ছেঁড়া বা নষ্ট, এগুলো অনেক পুরোনো...এমনকি একটি কিশোর আলো ২০১৩ সালের)। এবং তুমি বলেছিলে যে আমার বন্ধুরা আমার চিঠিটা দেখে আগে সতর্ক হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা কোনোভাবেই হবে না আশা করি। কারণ, ওরা তো আর কিশোর আলোর পাঠক না। আমাদের যখন লাইব্রেরি ক্লাস থাকে, তখনই কিশোর আলো পড়ে। আরেকটি কথা, আমার এবার অরিগ্যামি খুবই



ভালো লেগেছে (সব সময় ভালো লাগে, কিন্তু এবার আরও বেশি ভালো লেগেছে)। অনেক লিখেছি। বিদায় নেওয়ার আগে বলছিলাম, আসলে আমি এটি লাইব্রেরিতে করব না। আগে ভেবেছিলাম করব, কিন্তু যদি শিক্ষক দেখে ফেলেন? তখন তো আমি শেষ!

মাইশারাহ্ মেহেক
পঞ্চম শ্রেণি, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি মডেল স্কুল, রাজশাহী

কিআ : আরে, এ তো দেখছি একেবারে আসল কিআর মতো। একদম নিখুঁত বানিয়েছ। ঠিকই ভেবেছ। এটা তোমার কাছে স্মৃতি হিসেবে রেখে দাও। অনেক দিন পর দেখে হয়তো আমার কথা মনে পড়বে। মজা হবে তখন। ভালো থেকো। এবারের অরিগ্যামিটা কেমন লেগেছে?

প্রিয় কিআ,
জুলাই সংখ্যাটা আমার জন্য দারুণ চমক ছিল! কারণ, আমার জন্মদিন জুলাই মাসে। ভেবেছিলাম, এই মাসে একটা সুন্দর লেখা পাঠিয়েছি, আর তুমি সেটা আগস্টে ছেপে আমাকে উপহার দেবে। কিন্তু তুমি যে হঠাৎ করে জুলাই সংখ্যায় 'জন্মদিন' ছাপলে! আরও বড় ব্যাপার হলো, ১০ তারিখে আরেক পাঠিকার জন্মদিন, আমারও তো সেদিনই জন্মদিন! তুমি যেন আমাকে আগেই দারুণ একটা উপহার দিয়ে দিলে! মাখতুম ই জান্নাতকে অসংখ্য ধন্যবাদ, সে তোমাদের সঙ্গে না থাকলে হয়তো এ উপহারটা আমার হাতে আসত না।

এ ছাড়া ভূত সংখ্যা! কী আশ্চর্য, আমার জন্মমাসেই আমাকে নিয়ে সংখ্যা (হা হা, আমি নিজেকে সব সময় একজন ভূত মনে করি)! 'তুমি কি ভূতে ভয় পাও?' কুইজে আমার ফলাফল কী হবে, তা আমার নিশ্চিত জানা ছিল। আমি কিচ্ছুতে ভয় পাই না! যদিও বেশির ভাগ ভূত ভিতু হয়, আমি আলাদা।

২০১৯ সাল থেকে আমি তোমাকে পড়ি। তখন আমি ক্লাস ওয়ানে ছিলাম। সেই সময় থেকে আমি গল্প ও কবিতা লেখার সঙ্গে জড়িত। এত দিনে আমার কাছে তোমার অনেকগুলো সংখ্যাই জমা হতো, কিন্তু করোনার কারণে কিশোর আলো পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মাঝেমধ্যে কিনতাম, তবে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে আবার নিয়মিত পড়া শুরু করেছি।

২০১৯ সালে আমার একটা পরিকল্পনা ছিল। আমি তোমাকে 'সাক্ষাৎকার' বিভাগ চালু করতে বলব—পাঠকদের সাক্ষাৎকার! তবে এখন আর সেটা দরকার নেই।

তবে যদি সম্ভব হয়, সমাজকর্ম নিয়ে একটি সংখ্যা প্রকাশ করো। কোনো চাপ বা হুমকি নয়, একজন সমাজকর্মী হিসেবে এটা আমার খুব পছন্দ হবে। আমি জানি, তোমাকে লাখ লাখ অনুরোধের মুখোমুখি হতে হয়, আমি সেটা বাড়াতে চাই না। আমি ফুটবলও খুব ভালোবাসি। তবে আমি নিশ্চিত, ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য তোমরা অবশ্যই বিশেষ সংখ্যা বের করবে।

এবার কিছু প্রশ্ন :

১. আমি কি 'আমরা সবাই রাজা' ছাড়া অন্য কোনো বিভাগে লেখা ছাপাতে পারব? যেমন যে গল্পটা লিখছি, সেটা কি 'গল্প' হিসেবেই ছাপানো যাবে? তাহলে আমি লেখাটা লম্বা করতে পারব। এ ছাড়া 'খেলা' বিভাগে লিখতে পারব কি? যদিও খুব সম্ভবত না।
২. 'ইলু-বিলুর অভিযান' কত পর্বে শেষ হবে?

আজ আর নয়। ভালো থেকো।
(আমিও হয়তো ধারাবাহিক চিঠি লিখব। এটা হয়তো প্রথম পার্ট)

নুসাইবা ইনায়া
সপ্তম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

কিআ : ইনায়া, তুমি দারুণ কিছু আইডিয়া দিয়েছ। একটা হলো—পাঠকের সাক্ষাৎকার। তুমি কী ভেবে লিখেছ, জানি না। তবে তোমারটা পড়ে আমার মনে হলো, জিনিসটা করা যায়। এ রকম হতে পারে যে তোমরা তোমাদের সম্পর্কে ছোট একটা পরিচিতি লিখে পাঠালে। জানালে তোমাদের পছন্দ-অপছন্দের কথা। তারপর আমরা তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা সাক্ষাৎকার নিলাম। কেমন হবে? জানিয়ো। জানিয়ো সমাজকর্ম সম্পর্কে তুমি কী কী চাও বা তুমি কী ধরনের সমাজকর্মে জড়িত।

তোমার প্রশ্ন দুটির উত্তর : অবশ্যই তুমি 'আমরা সবাই রাজা' বিভাগ ছাড়াও গল্প পাঠাতে পারবে। কয়েক সংখ্যা আগে তোমাদের স্কুলের নুসাইবা বিনতে সাহেদের একটি গল্প ছাপা হয়েছিল। গল্পটির নাম 'মগজখেকো'।

ইলু-বিলুর অভিযান কত পর্বে শেষ হবে, এটা এখনো ঠিক হয়নি।

খুব সুন্দর চিঠির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। লেখার অপেক্ষায় রইলাম।

প্রিয় কিআ,
আমি তোমার কাছে একটি নাম জানতে চাই। আশা করি, তুমি একটি সুন্দর নাম বলবে। আর যার নাম বলবে, সে হলো একটি খরগোশ। তার গায়ের রং সাদা, চোখগুলো সূর্যের মতো লাল। ওর বয়স ১ মাস ৩ দিন।



মাহিদা নুর শিফা
সপ্তম শ্রেণি, অলির বাজার আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়, কুমিল্লা

কিআ : নিশ্চয়ই গোল গোল কিউট চোখ খরগোশটার। গুল্টু নামটা কি তোমার পছন্দ হয়?

অলংকরণ : **নাইমুর রহমান**

কিআ প্লেলিস্ট

এ মাসে তোমাদের চিঠি পড়তে পড়তে এই গানগুলো শুনছিলাম আমরা। তোমরাও শুনে দেখতে পারো।

ভাবান্তর	— ওউন্ড
গুলবাহার	— ইশান
ডোন্ট স্টপ বিলিভিন	— জার্নি
কল অব দ্য মাউন্টেনস	— এলভেইটি
গুরেন নো ইউমিয়া	— লিঙ্কড হরাইজন

এ মাসের সভা 'কিআড্ডা'র সময়, অংশগ্রহণের নিয়ম ও নিবন্ধন ফরম পাবে এই লিংকে। একই সঙ্গে অনলাইন সভার ফরমও আছে লিংকটিতে।
www.kishoralo.com/4zrv2pfcmh
চলে এসো নির্ধারিত সময়ে কিশোর আলো কার্যালয়ে। অথবা উপস্থিত থেকো অনলাইন সভায়।

আমাদের আর পড়াশোনা নেই

রোমেন রায়হান

বুঝলে বাবা-মা? তোমরা ছিলে না, অফিসে-বাসায় ছিলে
হঠাৎই আগুন ঝাঁপ দিয়ে এল, আমাকে ফেলল গিলে!
তোমরা বলোনি, পরিচিতদের কেউই বলেনি আগে!
এভাবে যে প্লেন আছড়িয়ে পড়ে, এভাবে আগুন লাগে!

লকলক করা আগুন পোড়াল যা যা ছিল আশপাশে
ক্লাসটা পুড়েছে, মাঠটা পুড়েছে, আগুন লেগেছে ঘাসে!
পুড়ে গেছে ড্রেস, পুড়ে গেছে ব্যাগ, ব্যাগে থাকা বই-খাতা
সারা গা পুড়েছে, জুতা পুড়ে গিয়ে পুড়েছে পায়ের পাতা!

এইখানে এসে অবাক হয়েছি, ব্যাপার কী হলো, শোনো!
পোড়ার কষ্ট পুরোপুরি হাওয়া, দাগই পাবে না কোনো!
বাবা-মা, তোমরা মিছেই কাঁদছ, কাঁদার নেই তো কিছু
আমার ক্লাসের অনেক বন্ধু এসেছে আমার পিছু।
বন্ধুর সাথে বন্ধু থাকবে, তোমরা না বলেছিলে!
ফুলের বাগানে হাসছি-খেলছি আমরা সকলে মিলে!

আরেকটা কথা চুপি চুপি বলি, হাতে গোনা লোকে জানে
মাসুকা এবং মাহেরীন মিসও এসে গেছে এইখানে!
শুনে কী ভাবছ? পড়াশোনা নিয়ে আমরা রয়েছি চাপে?
আরে না না! পড়া চাপা পড়ে গেছে আমাদের দৌড়ঝাঁপে!
আমাদের আর পড়াশোনা নেই, কী করে থাকবে বলো!
পোড়া বই-খাতা এখানে আসেনি, কাউকে করেনি ফলো!

আমাদের নিয়ে টেনশন ছাড়ো, চোখ মোছো সব ভুলে
আমরা এখানে আনন্দে আছি, ওড়াউড়ি ফুলে ফুলে!



আইডি কার্ডে ছবিটা নেই!

আহমেদ সাব্বির

রোজ-প্রতিদিন একই রুটিন ঘড়ির কাঁটায় ছোটা
ঘুমজড়ানো কুসুম ভোরে বিছনা ছেড়ে ওঠা।
'ওয়াশরুমে যাও'
'ব্রাশ করে নাও'
'নাশতা রেডি প্লেটে'
'জলদি করো, হর্ন বেজেছে, বাস দাঁড়িয়ে গেটে।'

চুল আঁচড়িয়ে টাইটা বেঁধে প্যারেড পিটির তালে
আজকে চুমু কপালে তো কালকে চুমু গালে।
জুতোর ফিতে বাঁধা হলেই ব্যাগটা পিঠে তুলে
দুরন্ত খরগোশের মতো, একছুটে ইশকুলে।

ইশকুলে আজ হয়নি যাওয়া, সময় গেছে চলে!
থমকে আছে ঘড়ির কাঁটা ভোর আসেনি বলে।
ইশকুলে আজ হয়নি ছুটি, মিস বলেনি টা টা
আগুনপোড়া আর্তনাদে বাজেনি ঘণ্টাটা।

জেট ফুয়েলের সেই যে আগুন, সেই যে আকাশ কালো
সেই নিশি আর ভোর হলো না, আর ফোটেনি আলো।
তীব্র আগুন ছড়িয়ে গেল ক্যানটিনে আর ক্লাসে
টিংকার বেল, স্পাইডার-ম্যান কেউ ছিল না পাশে।

ঘরটা এখন শূন্য খাঁ খাঁ, ভোরটা কেবল স্মৃতি
দুপুর হলেই বুকের ভেতর বিস্ফোরণের ভীতি।
চার দেয়ালে রঙের আঁচড় পড়ছে খসে খসে
দুপুর কাটে অপেক্ষাতে, এই বুঝি ফিরল সে।

বই-খাতা-ড্রেস, সব পুড়ে ছাই, ঝলসে গেছে আঁচে।
আইডি কার্ডে ছবিটা নেই, নামটা কেবল আছে।
সে নাম ধরে ডাকছি কত, দেয় না মানিক সাড়া
এক আগুনে সব পুড়ে শেষ, প্রাণপাখি হাতছাড়া।



অলংকরণ : **এস এম রাকিব**

তোমাদের লেখা

আমরা সবাই রাজা

নির্বাক আলো

সেদিন সন্ধ্যায় বৃষ্টি শুরু হয়েছিল আচমকা। ছাতা ছিল না, তাই পাশের গলিটার ছায়াঘেরা মোড়টায় এসে দাঁড়ালাম। একটাই দোকান খোলা—ছোট খাবারের দোকান। ভেতরে গোলাপি আলো, দুজন মানুষ দেখা যাচ্ছে আবছা, যেন টিভির পর্দায় ঝাপসা ছবি।

আমি ঠিক জানি না; কিন্তু কেন যেন দোকানটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। ঠিক ভয় না, আবার স্বস্তিও নয়। হয়তো বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ, না হয় গলির নিস্তব্ধতা—সব মিলিয়ে একরকম অচেনা চাপ চাপ একটা ঘোর।

হঠাৎ খেয়াল করলাম—দোকানের ওপরের বিদ্যুতের তারগুলো একটু অস্বাভাবিকভাবে কাঁপছে, যেন কেউ ওপর থেকে দুলিয়ে দিচ্ছে; কিন্তু বাতাস তো নেই!

আমি মোবাইল বের করে ছবি তুললাম। ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠতেই একমুহূর্তের জন্য চারদিক আলোকিত হয়ে গেল, আর ঠিক তখনই দোকানের ভেতরে আমি আর একটা মুখ দেখতে পেলাম। না, ভেতরে থাকা দুজনের নয়। জানালার এক কোনায়, হঠাৎ যেন উদয় হওয়া একটা মুখ—সাদা, ফ্যাকাশে, একগাল হাসি।

আমি ভয় পেলাম না; বরং মোবাইলে সেই ছবিটা দেখে ঘাবড়ে গেলাম।

ছবিতে সেই মুখটা নেই।

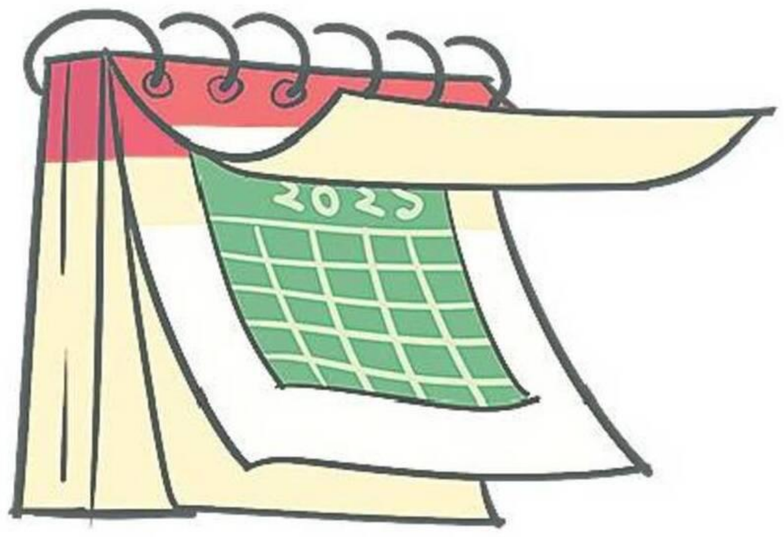
ভেতরের আলোটা এবার নিভে গেল হঠাৎ। আর তখনই বৃষ্টি আরও বেড়ে গেল। গলিটা জলে ভেসে যাচ্ছে প্রায়। আমি পেছনে ফিরেই হাঁটা শুরু করলাম; কিন্তু একটা কথা মাথায় ঘুরছিল—ছবিটায় মুখটা থাকল না কেন?

বাসায় ফিরে আবার ছবিটা খুললাম। এবার গলা শুকিয়ে গেল।

ছবিতে দেখি, দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি নিজেই। কিন্তু... আমি তো তখন ছবি তুলছিলাম!



মো. নানজিব ফাহিম
অষ্টম শ্রেণি, বর্ণমালা আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা



বিদায়ের প্রহর গুনে

সময় কত দ্রুত চলে যায়! আজও মনে হয়, এই তো সেদিন এলাম এই স্কুলে। কেমন করে চোখের পলকে কেটে গেল সাত বছর। আর মাত্র চার বছর বাকি—ভাবলেই মনে উঁকি দেয় অজস্র স্মৃতি। এই স্কুলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত হাসি, কান্না, অভিমান, দুষ্টুমির স্মৃতি। মাঝখানে বদলেছে অনেক কিছু। বদলেছি আমি। পেছনে তাকাতেই ভেসে ওঠে কত রঙিন দিন। যতই ভাবি, ততই মনটা খারাপ হয়ে যায়। ভাবতেই কষ্ট হয়, আমরা আর এই বেঞ্চে বসতে পারব না। সাদা-আকাশি এই স্কুলড্রেস পরে আর আসতে পারব না এই প্রিয় প্রাঙ্গণে—এসব কিছু ভাবতেই মনটা ভারী হয়ে ওঠে। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

আনিশা তাবাসসুম
সপ্তম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

লগড ইন লাইফ

একটি অলস দুপুর। ক্লাস শেষ করে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। জানালার ফাঁক দিয়ে রোদের আলো পড়ছে আমার ডেস্কের ওপর। আমার ল্যাপটপটা খুলে বসলাম। মাথায় শুধু একটি চিন্তা—হাই গ্রাফিকসের ফ্রি গেম পাওয়া যায় না স্টিমে? স্টিম খুলতেই চোখ আটকে গেল একটি গেমে, নাম—'Door.exe'।

কোনো কোম্পানির নাম বা রিভিউ নেই। এমনকি গেমের সাইজও মাত্র ৩.২ জিবি।

'ফ্রি তো, দিই দেখি, ট্রাই করি,' বলেই ইনস্টল বাটনে চাপ দিলাম।

প্রবেশ :

গেম চালু হতেই স্ক্রিনে শুধু একটি জিনিস—একটি ধাতব দরজা। নিচে লেখা—

'Enter your reality to change it.'

আমি মজা করেই 'NazhaZarif_Real' লিখে Enter চাপলাম।

হঠাৎ স্ক্রিন ঝাপসা হয়ে গেল। কাঁপতে শুরু করল ল্যাপটপ। হাত সরাতে গেলাম, পারলাম না।

আলো নিভে গেল। চোখ খুলতেই দেখলাম, আমি একটি অদ্ভুত ভার্চুয়াল শহরে। ঠিক যেন আমার কল্পনার মতো।

এটি কোনো সাধারণ গেম নয়, এটি একটি ডায়নামিক রিয়েলিটি সিমুলেশন। যেখানে আমি যেটি ভাবি, সেটি গড়ে ওঠে।

প্রথমে মজা লাগছিল। একটি গেম ক্যাফে বানালাম, যেখানে সবাই ফ্রি গেম খেলতে আসে। নিজের মতো করে জীবন গড়ছিলাম; কিন্তু ধীরে ধীরে দেখলাম, আমার ভয়, টেনশন, লজ্জা—এসবও রূপ নিচ্ছে। রাস্তায় আমার স্কুলের লোকেরা, কেউ ব্যঙ্গ করছে, কেউ

সেই রাত



২০২১ সালের কথা। আমি তখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি। জানুয়ারির ৪ তারিখে দাদুর বাসা থেকে বাবার কাছে ফোন এল। দাদুমণি অসুস্থ। বাবা ঠিক করলেন, দাদুর বাসায় যাবেন; কিন্তু একা। (আমরা সাধারণত বছরে দুবার দুই ঈদে দাদুর বাসায় যাই) মায়ের অনেক জোরাজুরিতে বাবা আমাদেরও নিয়ে যেতে রাজি হলেন। পরদিন গিয়ে দেখি, অন্য বড় আব্বু ও ফুফুরাও এসেছেন। রাতে আমরা যে ঘরে ছিলাম, দুটি বিছানা ছিল সেখানে। একটি বিছানায় আমি, আপু, মা আর এক ফুফু। অন্য বিছানায় ছিলেন একজন বড় আম্মু আর তাঁর ছেলেমেয়ে। অনেক দিন পর দেখা, গল্প করতে করতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে ঘুমিয়েছি। হঠাৎ তীব্র ঠান্ডায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, রুমের দরজা খোলা, ঘরে কেউ নেই। শুধু আমি আর আমার পাঁচ বছরের জ্যাঠাতো ভাই। দূরে কোথায় যেন অনেক মানুষের অস্পষ্ট কথা বলার শব্দ শুনতে পেলাম। তখনই অন্য বিছানায় থাকা ভাইটা ঘুম থেকে উঠে গেল। সে-ও ঠিক আমার মতো চারদিকে দেখতে লাগল। আমাকে দেখে বলল, 'মা কোথায়?' আমি তখন কী মনে করে বললাম, 'মায়ের কাছে যাবা?' (অথচ তখন আমি নিজেই অনেক ছোট ছিলাম) দাদুর বাসায় আবার তিনজন বড় আব্বু থাকেন। গ্রামের বাড়ি, এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে একটু হাঁটতে হয়। তারপর ওকে নিয়ে বের হয়ে শুনলাম, সে শব্দটা আসলে দাদুমণির ঘর থেকে আসছে। সেদিকে যতই এগোতে লাগলাম, ততই শব্দটা জোরালো হতে লাগল। একসঙ্গে অনেকের ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ শুনে বুকের ভেতর ধক করে উঠল। গিয়ে দেখি, সবাই সেখানে। সবার চোখে পানি। আমার সব সময়ের সঙ্গী আপুকে আমি খুব একটা কাঁদতে দেখিনি; কিন্তু আপুর চোখেও পানি ছিল তখন। কারণ, আমার দাদুমণি আর নেই।

সেদিন ছিল জানুয়ারির ৫ তারিখ। এখনো সেই রাতের কথা আমার মনে পড়ে। আমি বোধ হয় কখনো সেই রাতের কথা ভুলব না। আমি তোমাকে অনেক মিস করি দাদুমণি। তুমি যেখানেই থাকো ভালো থেকো।

সাবিহা সুবাহ
সপ্তম শ্রেণি, পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর



প্রশ্ন করছে—

'তুমি এখনো এভাবেই বাঁচতে চাও?'

রহস্য শুরু হয় তখন। আমি বুঝলাম, এই গেম শুধু আমার ইচ্ছা নয়, আমার মনের গোপন দিকগুলোও প্রকাশ করছে। একটি ছায়া আমাকে অনুসরণ করতে লাগল। তার মুখ নেই, চোখ থেকে শুধু লাল আলো বের হয়।

সে আমার ভয়গুলোকে শক্তি বানিয়ে আমাকে ধ্বংস করতে চায়। তাকে থামাতে হলে দরজার উৎস খুঁজে বের করতে হবে।

শেষ :

অনেক বাধা পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত আমি সেই ধাতব দরজার কাছে পৌঁছালাম। দরজার ওপাশে লেখা ছিল, 'তোমার ভয়, তোমার সম্ভাবনা—যেটা বেছে নেবে, সেটিই সত্য হবে।' আমি চোখ বন্ধ করে বললাম—

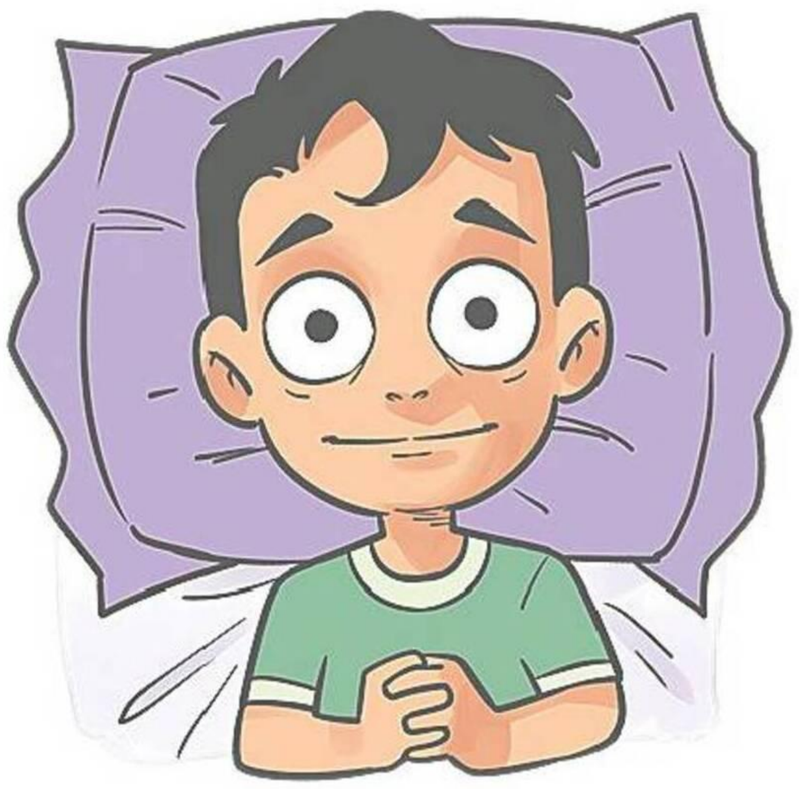
'ভয় নয়, আমি ভবিষ্যৎ বেছে নিই।' চোখ খুলতেই নিজেকে আবার ল্যাপটপের সামনে পেলাম। ডেস্ক, জানালা, আলো—সব আগের মতো; কিন্তু একটিই পার্থক্য—

ডেস্কটপে নতুন একটি ফোল্ডার, নাম—'Reality BackUp'।

আমি আর ক্লিক করলাম না। কারণ আমি জানি, সবচেয়ে বড় গেম, নিজের জীবনটাই।

আর এবার আমি সেটি নিজের মতো করে খেলব।

নাজহা জারিফ
দশম শ্রেণি, খুলনা জিলা স্কুল, খুলনা



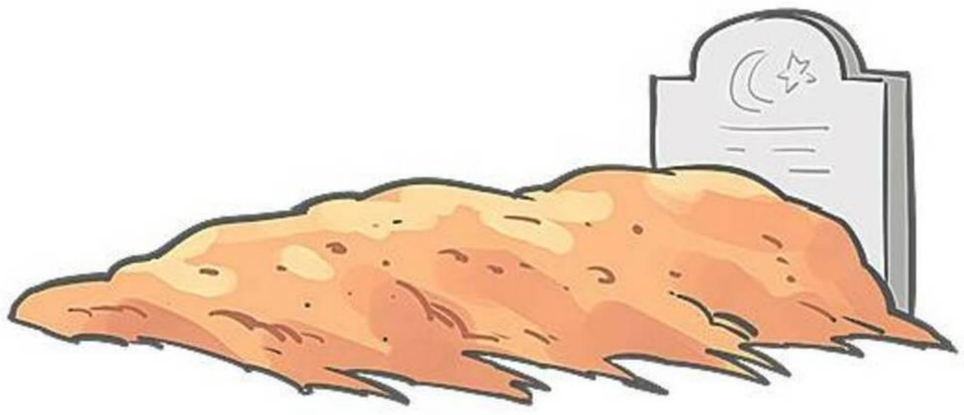
একা ঘুমানো

ছয় মাস আগে ঠিক করেছিলাম রাতে একা ঘুমাব। সবাইকে দেখিয়ে দেব যে আমি একা ঘুমাতে পারি। তাই ঘরের বিছানা ঠিক করে, রাতের খাবার খেয়ে ঘুমাতে গেলাম। নিজের ঘর, অথচ সেখানে প্রথমবার ঘুমাব! আমি আসলে নিজের ঘরে পড়াশোনা বা অন্য অনেক কাজ করলেও রাতে ভয়ে ঘুমাই না।

ঘুমানোর জন্য বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু চোখে একটুও ঘুম নেই। রাস্তার কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করছে। ধীরে ধীরে বাসার সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। আমার ভয় যেন বেড়েই চলেছে, ঘুম আসছে না কিছুতেই। রাত আনুমানিক দুইটা-তিনটা বাজল যখন, তখন চোখে হালকা ঘুম এল। তবু ঘুমটা যেন পুরোপুরি আসছিল না। অবশেষে আবছা আবছা ঘুম এল। পরে ফজরের আজান শুনে ঘুম ভেঙে গেল আবার।

আসলে আমি চাইলেই একা ঘুমাতে পারি, কিন্তু ঘুমাই না। কারণটা বোধ হয় তোমরা আন্দাজ করতে পারছ।

সমতা
চতুর্থ শ্রেণি, রেডিও কলোনি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা



শূন্যতা

আষাঢ় মাসের শেষ দিন। সারা দিন বৃষ্টি। কখনো গুঁড়ি গুঁড়ি, আবার কখনো তুমুল বর্ষণ। একটুখানি রোদের দেখা মেলেনি। বিকেলে হালকা দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি থাকায় ভেজার সম্ভাবনা নেই, তাই আমি রায়েরবাজার বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ কবরস্থানে চলে গেলাম।

জায়গাটা আমার বেশ পছন্দ। নিরিবিলি। প্রকৃতিঘেরা লেকের সবুজ জলে নানা রকম নাম না জানা মাছের লাফালাফি। গাছের সবুজ পাতার আড়াল থেকে নানা রকম পাখির কিচিরমিচির আমাকে ভীষণ মুগ্ধ করে। পরিচিত-অপরিচিত শত শত মানুষের সমাধি, তাঁদের নীরব নিশ্চুপ ঘুমিয়ে থাকা আমাকে জীবনের পাঠ শেখায়।

একা একা সমাধিগুলোর দিকে তাকিয়ে বাবা না থাকার শূন্যতা, তাঁর নীরব হয়ে ঘুমিয়ে থাকা, দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গে দেখা না হওয়া, তাঁর কাঁধে চড়ে না ঘোরা—কেন যেন ফেলে আসা স্মৃতিগুলো জ্বলজ্বল করে ওঠে। দুটো চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে বাবা না থাকার বিষণ্নতার নোনা জল। বাবাকে দেখতে খুব ইচ্ছা হয়, এই পৃথিবীতে তাঁর মতো আপন তো কেউ নেই।

কিন্তু তিনি তো পাড়ি জমিয়েছেন পরপারে, যেখানে যাওয়া যায়, তবে ফেরা যায় না।

প্রিয় বাবা, আর মাত্র অল্প কিছুদিন পরই তোমার সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী এসে যাবে। জানো বাবা, লোকে যখন বলে, 'তোমার বাবা নেই?' আমার তখন ভীষণ কষ্ট হয়। মাঝেমধ্যে প্রায়ই আম্মুকে দেখি, জায়নামাজে বসে তোমার জন্য প্রার্থনা করেন।

প্রিয় বাবা, আজ বিকেলে যখন কবরস্থানে হাঁটছিলাম, আমার মতোই বাবাহীন এক আপুকে দেখলাম। সে তার বাবার কবরের পাশে বসে কেমন কান্না করছিল। ফুলগাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে বাবার কবরের ওপর ছড়িয়ে দিচ্ছিল। তার জন্য আমার ভীষণ মায়া হচ্ছিল।

বাঁধন আহমেদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

● গল্প

রাগ

২১ জুলাই ২০২৫। বেলা ১টা। মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ক্লাস চলছে। সাদাবের দিকে তাকিয়ে আবিদ বলল, 'তোকে আর আমি জীবনেও খাতা দেখাব না। তুই আমারটা দেখে দেখে লিখে আমার চেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে গেছিস।' সাদাব হাসতে হাসতে বলল, 'আরে, ৫ নম্বরই তো বেশি পেয়েছি। এত রাগছিস কেন? গত বছর, ক্লাস ফোরে বার্ষিক পরীক্ষায় তুই তো আমার খাতা দেখে লিখেই পাস করেছিলি, এবার নাহয় আমি লিখলাম!'

সাদাবের কথার উত্তর না দিয়ে স্কুলের ব্যাগ নিয়ে হাঁটা শুরু করল আবিদ। সাদাব বলল, 'কী রে, আজ কোচিং করবি না?' আবিদ বলল, 'নাহ্, ইচ্ছা করছে না।' সাদাব বলল, 'যা, বাড়িতে যা। বাড়িতে গেলেই তো আন্টির কাছে ঝাড়ি খাবি।' আবিদ কিছু না বলেই ওর স্কুলের ব্যাগ নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করল। সাদাব বলল, 'কী রে, একটা বাইও বলে যাচ্ছিস না?' আবিদ গোমড়া মুখে বলল, 'তোর সঙ্গে কথা বলতেই আর ইচ্ছা করছে না।'

আবিদের বাড়ি মাইলস্টোন স্কুল থেকে খুব বেশি দূরে নয়। হঠাৎ 'বুম' করে একটা শব্দ শুনতে পেল। তারপর দেখল, ওর স্কুলের দিক থেকে মানুষজন ছুটতে ছুটতে এদিকে আসছে। মানুষজনের মুখে আবিদ শুনল, মাইলস্টোন স্কুলে নাকি প্লেন ক্র্যাশ হয়েছে। কিছু না ভেবেই তাড়াতাড়ি স্কুলে গেল ও। তারপর দেখতে পেল, স্কুলে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আবিদ দেখল, ওদের ক্লাসেরই বেশ কিছু বাচ্চা দৌড়ে পালাচ্ছে। অনেকের মরদেহ স্বেচ্ছাসেবকেরা নিয়ে যাচ্ছে। ও তাড়াতাড়ি সাদাবকে খুঁজতে লাগল। হঠাৎ মাঠে পড়ে থাকা সাদাবের নিথর দেহের দিকে আটকে গেল ওর চোখ। সাদাবের অর্ধেক শরীর পুরো ঝলসে গেছে। মুখের চামড়াও কেমন যেন সাদা হয়ে গেছে। ও তাড়াতাড়ি সাদাবের কাছে গিয়ে সাদাবকে ঝাঁকাতে লাগল। 'এই সাদাব, ওঠ, চোখ খোল। ভয় পাস না, ডাক্তারের কাছে গেলেই তুই ঠিক হয়ে যাবি।' আবিদ

ফ্ল্যাট নম্বর জি নাইন

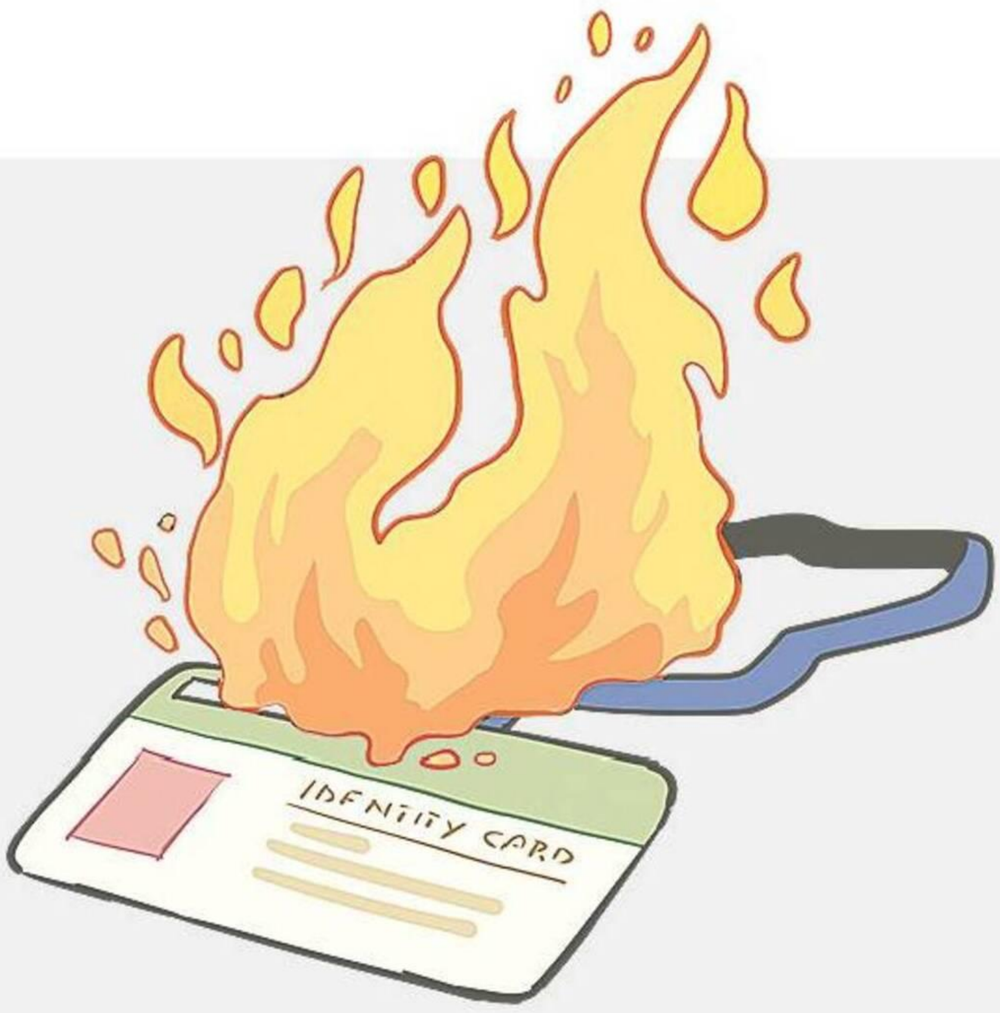
নাজিমরা নতুন বাসায় এসেছে এক সপ্তাহ হলো। বিল্ডিংয়ের 'জি এইট'-এ তাদের ফ্ল্যাট। বিল্ডিংটা বেশ পুরোনো, ২০০০ সালের আগে তৈরি। ওদের ওপরের তলায়, অর্থাৎ 'জি নাইন'-এ কে থাকে, তখনো জানতে পারেনি ওরা। সমস্যাটা শুরু হলো কদিন পর। সারা দিন ওপরের তলায় কোনো শব্দ হয় না, কিন্তু রাতে যখন নাজিমরা সবাই ঘুমাতে যায়, তখন শোনা যায় বিচিত্র সব শব্দ। শুনে মনে হয়, ভারী আসবাব সরানো হচ্ছে। কখনো চেয়ার, কখনো অন্য কিছু।

শুরুতে ব্যাপারটাকে পাত্তা দেয়নি নাজিমরা। ওদের বাসায় শিশু বা বৃদ্ধ কেউ নেই। শব্দে তেমন কোনো সমস্যাও হতো না। কিন্তু শব্দগুলো হতে থাকল দিনের পর দিন। স্বভাবতই নাজিমরা একটু বিরক্ত হলো। ওর মা ওপরের তলায় 'যাব যাব' করেও যাওয়া হয়ে উঠছিল না। মাস দুয়েক পর ওর মা যখন ওপরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, সেদিন রাতে আর কোনো শব্দ হলো না। পরদিন সকালবেলা নাজিমের মা ওপরে গিয়ে দেখেন যে রংমিস্ত্রি কাজ করছেন। ম্যানেজারকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাড়াটে চলে গেছে?' ম্যানেজার বললেন, 'কী বলেন আপা! ভাড়াটে যাবে কেন? সাত-আট মাস ধরে তো বাসাটা ফাঁকাই পড়ে ছিল। ভাড়াটে উঠবে বলে মালিক রং করাচ্ছেন।'

তাহলে এত দিন নাজিমরা কিসের শব্দ শুনে এসেছে?

ফারাহ দিবা
বিসিএসআইআর উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা





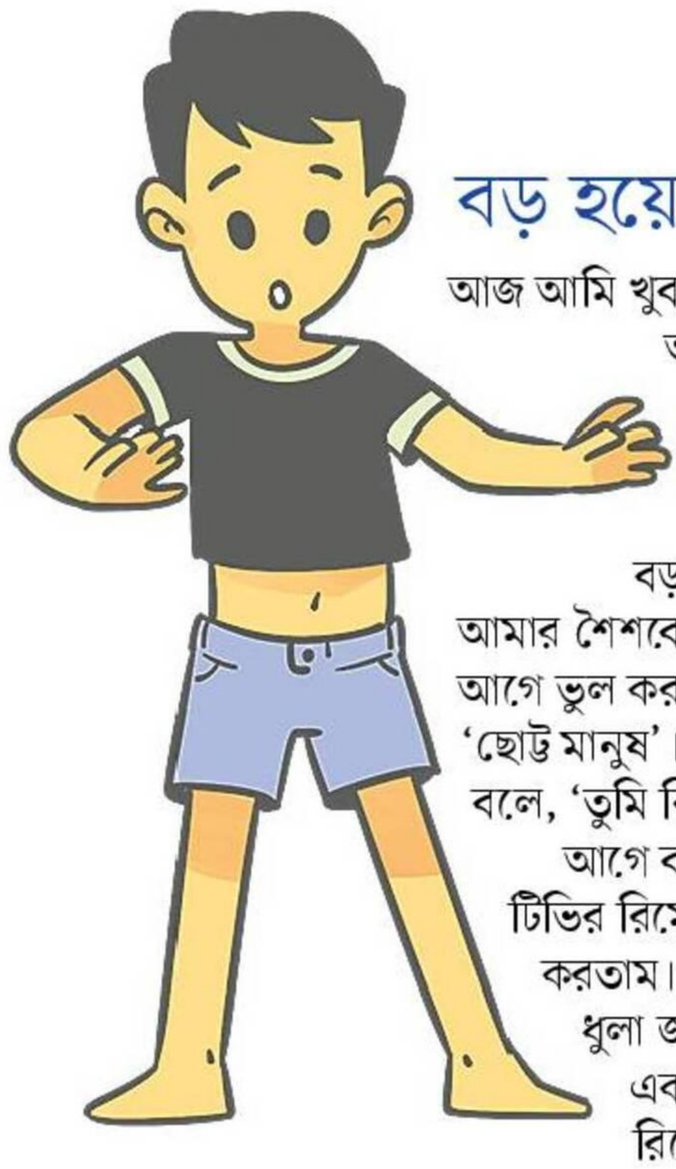
তাড়াতাড়ি একজন স্বেচ্ছাসেবককে ডেকে বলল, 'আঙ্কেল, আমার বন্ধু অজ্ঞান হয়ে গেছে। প্লিজ, ওকে একটু তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান।' স্বেচ্ছাসেবকটি কয়েক সেকেন্ড সাদাবকে দেখলেন। তারপর আবিদের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'বাবু, শোনো, তোমার বন্ধু আর বেঁচে নেই। তুমি কি ওর মা-বাবা কাউকে চেনো?'

এ কথা শুনে আবিদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। ও বলল, 'এসব কী বলছেন! সাদাবের সঙ্গে একটু আগেই আমার কথা হয়েছিল।' তারপর সাদাবকে ধরে জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগল। বলল, 'এই সাদাব, ওঠ। দেখ এই আঙ্কেল বলছে, তুই নাকি মরে গেছিস! আর কতক্ষণ এভাবে মটকা মেরে পড়ে থাকবি? আমি প্রমিজ করছি, এবার থেকে তোকে প্রতিটা পরীক্ষার খাতা দেখাব। তুই বেশি নম্বর পেলেও তোর সঙ্গে ঝগড়া করব না। প্লিজ, উঠে পড়, একবার চোখটা অন্তত খোল।'

সাদাব যদি আর একবার চোখ খুলত, তাহলে দেখতে পেত, যে ছেলে ওর সঙ্গে কথা বলবে না বলে বাড়ির দিকে হাঁটা দিয়েছিল, সে-ই এখন শুধু ওর চোখ খোলার অপেক্ষায় উন্মাদের মতো চিৎকার করছে!

মারিয়া ইসলাম
দশম শ্রেণি, শহীদ নজমুল হক বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, রাজশাহী

বড় হয়ে গেছি



আজ আমি খুব খুশি। আমি যে আমি সত্যিই বড় হয়ে গেছি, সেটা বুঝতে পারছি আজ। অনেক বড়, যেমনটা আমি আমার শৈশবে হতে চেয়েছিলাম। আগে ভুল করলে সবাই বলত 'ছোট্ট মানুষ'। আর এখন তারাই বলে, 'তুমি কি এখনো ছোট?' আগে বড় বোনের সঙ্গে টিভির রিমোট নিয়ে ঝগড়া করতাম। আজ সেই রিমোটে ধুলা জমেছে। টিভি রুমের এককোণে পড়ে আছে রিমোট। আগে একা স্কুলে যেতে চাইলে যারা বাধা দিত, স্কুলের পথে আজ তাদের সঙ্গ কল্পনাও করা যায় না। টিফিনের টাকা জমিয়ে যে স্টিকার কিনতাম একসময়, সেগুলো এখন দেখতেও ভালো লাগে না। যারা একদিন আমাকে ছোট বলে ক্ষমা করেছিল, আজ তারাই আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে আমি আর ছোট নেই।

আসলে আমারই দোষ। যেদিন আমি নতুন কলম হাতে পেয়ে খুশিতে প্রিয় পেনসিলটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম, সেদিনই আমার বোঝা উচিত ছিল যে আমি আর ছোট নেই। আমি মূলত সেদিনই বড় হয়ে গিয়েছিলাম। আমার বোঝা উচিত ছিল যে পেনসিল দিয়ে করা ভুল মোছা গেলেও কলম দিয়ে করা ভুল মুছে ফেলা যায় না। কলম দিয়ে করা ভুল আমি হয়তো শুধরে নিতে পারব, কিন্তু তার চিহ্ন, দাগ বা স্মৃতি আজীবন সেই পৃষ্ঠায় থেকে যাবে। আজ কলম দিয়ে অনেক কাটাছেঁড়া করার পর আমি বুঝতে পেরেছি, আমি আর ছোট নই, আমি এখন বড় হয়ে গেছি। অনেক বড়।

মো. খাইরুল বাসার
অষ্টম শ্রেণি, মুকুল নিকেতন উচ্চবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

লাল মলাটে মোড়া এক অদ্ভুত পৃথিবী



লাল মলাটের ওপর সবুজ রঙে আঁকা একটা বিড়াল 'সুকুমার সমগ্র'। মলাট উল্টে বই খুললেই তার মধ্যে একটা বিশাল পৃথিবী। যেখানে খুব সহজেই আবোলতাবোল বকা যায়, নির্দ্বিধায় করা যায় নিত্যনতুন পাগলামি। সেই পৃথিবীতে হাঁটতে হাঁটতে কখনো শোনা যায় অর্ফিয়ুসের বীণার সুর, কখনো দেখা যায় পাগলা দাশুর অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা। অলস দুপুরে নিজের ঘরের বিছানায় গা এলিয়েও আমি শুনতে পেতাম দখিন হাওয়ার দেশে জ্যোৎস্না রাতে ভাঙা তারার সাতটা টুকরো নিয়ে মাতারিকির দীর্ঘশ্বাস!

কবে তা মনে নেই, বেশ ছোটবেলায় আব্বুর সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে *সুকুমার সমগ্র* কেনা। তারপর সেই পৃথিবী দেখা। এখনো যখন বইটা হাতে নিয়ে পড়তে থাকি, গোটা গোটা ফন্টের শব্দগুলো একেকটা ছবি হয়ে যায়। মন খারাপের দিনগুলোয় দমবন্ধ এই কংক্রিটের শহর থেকে সোজা চলে যাওয়া যায় সবুজ মাঠে। যেখানে রুমাল হয়ে যায় বিড়াল। পুরোনো হতে থাকা বইটার ঘ্রাণ সেই মাঠ, সেই পৃথিবীকে যেন আরও মায়ায় জড়িয়ে রাখে।

প্রীতিলতা প্রাতিস্বিক
দ্বাদশ শ্রেণি, সিদ্ধেশ্বরী কলেজ, ঢাকা

অলংকরণ : **সব্যসাচী চাকমা**

রূপালী ব্যাংক

নিয়ে এলো আকর্ষণীয় ৩টি নতুন স্কিম



স্কিমের নাম	স্কিমের মেয়াদ	সুদ/মুনাফার হার	জমার পরিমাণ (টাঃ)	মাসিক মুনাফা/ মেয়াদপূর্তিতে পরিশোধ
রূপালী আস্থা রূপালী মান্থলি আর্নিং স্কিম	০৩ (তিন) বছর	১০.২৫% (বার্ষিক)	সর্বনিম্ন ১ লক্ষ অথবা এর গুণিতক	প্রতি ১ লক্ষ এর মাসিক মুনাফা টাঃ ৮৫৪.০০
রূপালী শ্রদ্ধা রূপালী মান্থলি বেনিফিট ফর সিনিয়র সিটিজেন	০৩ (তিন) বছর	১০.৫০% (বার্ষিক)	সর্বনিম্ন ১ লক্ষ অথবা এর গুণিতক তবে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ	প্রতি ১ লক্ষ এর মাসিক মুনাফা টাঃ ৮৭৫.০০
রূপালী ডাবল বেনিফিট স্কিম আরডিবিএস	৬ (ছয়) বছর ০৯ (নয়) মাস	১০.৮২% (বার্ষিক)	সর্বনিম্ন ১ লক্ষ অথবা এর গুণিতক	প্রতি ১ লক্ষ এর বিপরীতে মেয়াদপূর্তিতে প্রদেয় টাঃ ২ লক্ষ

* বিধি মোতাবেক সরকার নির্ধারিত হার অনুযায়ী উৎসে কর এবং আবগারী শুল্ক প্রযোজ্য হবে।

হিসাব খোলার জন্য রূপালী ব্যাংকের নিকটস্থ শাখায় যোগাযোগ করুন

রূপালী ব্যাংক পিএলসি

উত্তম সেবার নিশ্চয়তা

www.rupalibank.com.bd



ওরা ভাসছিল কাগজের প্লেনের স্বপ্নে

সুজন সুপান্থ

‘ও নদীরে তুই যাস কোথায় রে
কলকলাইয়া ছলছলাইয়া
কোন সাগরে
যাস যেথা নে না তুই আমারে...’

বাংলাদেশি ব্যান্ড রেনেসাঁর এই গান গেয়ে সুর, হাসি আর আনন্দে কাটছিল রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছোট শিক্ষার্থীদের। সুখদেব সূত্রধর নামের একজন ফেসবুকে উত্তরা মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের গান গাওয়ার এমন কয়েকটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। ক্লাসরুমে সুখদেব গান শেখাচ্ছেন তাদের। সুখদেবের পরিচয়ে লেখা—সংগীত শিক্ষক, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

এর পরের ঘটনা হৃদয়বিদারক। নিশ্চয়ই সবার জানা। ২১ জুলাই দুপুরে রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে বিমানবাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। এরপরই আগুন ধরে যায় স্কুল ভবনে। এ ঘটনায় বুধবার পর্যন্ত ৩২ জনের নিহত হওয়ার খবর জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)। এর মধ্যে অধিকাংশই খুদে শিক্ষার্থী।

নদী যেখানেই যাক, গানে গানে শিশুরা তার সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। নরম মনের মানুষ কি এই হিংস্রতা আর জঞ্জালে ভরা শহরে থাকতে পারে! তাই হয়তো নদীর লোভে সারা দিন জলের মতো হয়ে থাকে নরম মনের শিশু। ড্রয়িং খাতায় এঁকে রাখে একটি ঘর, যে ঘর থেকে বেরিয়ে নদীর কাছে যাবে। আর আঁকে মাছের শরীর। আর খাতার অর্ধেকজুড়ে আঁকা থাকে ঢেউ আর জল। তবু তারা নদীর কাছে যেতে পারেনি। গেছে অন্য কোনো দূরে।

মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সামিউল করিম। সামিউল সোমবার স্কুলে যেতে চায়নি। মায়ের কাছে আবদার করেছিল সে বাসায় থাকবে। সকালে উঠে ছোটবেলার খেলনা উড়োজাহাজ শোকেস থেকে নামিয়ে মুছে পরিষ্কার করে খেলছিল সামিউল। কিন্তু তার মা বুঝিয়ে-শুনিয়ে স্কুলে যেতে রাজি করান। বাবা রেজাউল সোমবার সকালে ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে গেটের সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। ছেলে যখন দোতলার সিঁড়ি বেয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে, তা দেখে বাসায় ফিরে অফিসে যান। বেলা একটার দিকে তিনি আবার স্কুলের গেটে ছেলেকে বাসায় নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। স্কুল ছুটি হয়েছে তখন, সামিউল কাঁধে ব্যাগ নিয়ে হেলেদুলে বাবার দিকে আসছিল। বাবা তাঁর ৫ ফুট দূরত্বে। ঠিক ওই সময় বিধ্বস্ত বিমানের একটি জ্বলন্ত অংশ সামিউলের পেছনে আঘাত করে। রেজাউল হতবিহ্বল হয়ে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে শুধু কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, ‘আমার ছেলেকে বাঁচান।’ কিন্তু বাঁচতে পারেনি সামিউল। এ রকম বাঁচতে পারেনি আরও অনেক ফুলের মতো শিশু, আমাদের হীরামণি ফুল।

যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে আগুন লাগার পর একটি



ছবিতে দেখা গেছে, স্কুলের ইউনিফর্ম পরা একটি শিশু আহত হয়ে পড়ে আছে। আর তাকে ধরে একই পোশাক পরা আরেকটি শিশু আর্তচিৎকার করছে। হয়তো তারা সহপাঠী, হয়তো তারা বন্ধু। ঘাসের ওপর বন্ধুর পোড়া ক্ষতের ব্যথার পাশে উপশম হয়ে বসে আছে আরেক বন্ধু। বন্ধুকে বাঁচানোর কী প্রাণান্ত চেষ্টা তার! এই দৃশ্য আমাদের আরেকবার বুঝিয়ে দিল, বন্ধুর জন্য বন্ধুর ভালোবাসা কত! বুঝিয়ে দিল, প্রতিটি শিশুই একেকটি ফুলগাছ। যার সৌন্দর্য, সারল্য, ক্ষমা ও ভালোবাসার কাছে আমরা বারবার হেরে যাই।

বাড়ি ফিরে এসব শিশুর মাকে জাপটে জড়িয়ে থাকার বয়স। ঘুড়ির লেজে ঘাস বেঁধে নিজেকে ওড়ানোর বয়স। প্রজাপতির পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ানোর বয়স। অথচ জীবন বড় আশ্চর্য জায়গায় এসে থেমে গেল তাদের। যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের পর লাগা আগুনে নিভে গেছে তাদের জীবন। সেদিন সকালে শেষবারের মতো মাকে জাপটে জড়িয়ে ধরে তাঁর বুক থেকে ছুটি নিয়ে সমস্ত মানুষ ও মোহ পেরিয়ে বহুদূরে চলে গেছে তারা। যেখানে কোনো দিন কোনো ঘুড়ি কাটা পড়েনি, যেখানে নিজেদের ওড়ানো কাগজের প্লেন আছড়ে পড়লে, বিধ্বস্ত হলেও ছিঁড়বে না কোনো ফুলের পাপড়ি।

এই জগৎ ছোট শিশুদের ধরে রাখতে পারল না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই কবে বলেছেন, 'কোটি কোটি ছোটো ছোটো মরণেরে লয়ে/ বসুন্ধরা ছুটিছে আকাশে,/ হাসে খেলে মৃত্যু চারিপাশে।/ এ ধরণী মরণের পথ,/ এ জগৎ মৃত্যুর জগৎ।' মরণের পথ এ ধরণীতেই এত দিন হেসে খেলে, গান গেয়ে বড় হচ্ছিল মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছোট শিক্ষার্থীরা। স্কুলে তাদের কারও সেকশনের নাম ছিল 'ক্লাউড', কারও সেকশনের নাম ছিল 'স্কাই'। কী আশ্চর্য, সত্যিই তারা চারদিকে মেঘ ছড়িয়ে বিশাল আকাশের অংশ হয়ে গেল। প্রজাপতির সঙ্গে নিশ্চয়ই তাদের হৃদয়ের সম্পর্ক। খুব কাছের সম্পর্ক। নইলে এত দ্রুত ডানা পেয়ে তারা উড়ে গেল কীভাবে!

ফেসবুকে পোস্ট করা সুখদেব সূত্রধরের আরেকটি ভিডিওতে দেখা গেছে, একটি ক্লাসে সহপাঠী শিশুরা একে অপরের হাত ধরে গাইছে—

'একদিন ছুটি হবে অনেক দূরে যাব
নীল আকাশে সবুজ ঘাসে খুশিতে হারাব।
যেখানে থাকবে না কোনো বাঁধন
থাকবে না নিয়মের কোনো শাসন।
পাখি হয়ে উড়ব ফুল হয়ে ফুটব।
পাতায় পাতায় শিশির হয়ে হাসি ছড়াব।'

যদিও গান গাওয়া সেই শিশুরা সুস্থ আছে, কিন্তু গানটি শুনলেই মনে পড়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো শিশুদের কথা। অকালে তারা চলে গেল অনেক দূরে। সেখানে কি থাকবে আমাদের এসব কোমল মনের শিশুর গানের ইশকুল? তারা হয়তো একে অপরের হাত ধরে গোল হয়ে দুলে দুলে গান গাইবে। সেখান থেকে নিশ্চয়ই তারা ফুল হয়ে ফুটবে, পাতায় পাতায় শিশির হয়ে হাসি ছড়াবে।

অলংকরণ : **তনি সুভংকর**

EXPORTED TO 50+ COUNTRIES

WALTON
Smart Fridge

ওয়ালটন ঘরে ঘরে বিশ্বজুড়ে

এখন দেশের সীমানা পেরিয়ে
পৃথিবীর ৫০টিরও বেশি দেশে



For Details: **16267** **08000016267** (Toll Free) **waltonbd.com**



আজ আমাদের ছুটি...

রাজীব হাসান

গাছের নিচে ক্লাস বসেছে। কী প্রশান্তিময় ছায়া! হাত বাড়ালেই পেঁজা পেঁজা মেঘ। কত রকমের ফুল ফুটেছে! প্রজাপতির ডানায় এত রংও হতে পারে! নাম না-জানা কত পাখির কিচিরমিচির।

ক্লাস নিচ্ছেন মাহেরীন মিস।

একটু দূরেই কলকল শব্দে বয়ে চলেছে ঝরনা। ঝরনায় পা ডুবিয়ে বসে আছে আরিয়ান। শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। আনিকা আর সাদ মিলে ভাসাচ্ছে কাগজের রঙিন নৌকা। নাফির দুরন্তপনা একটুও কমেনি। নাজিয়া খুব সুন্দর ঝুঁটি বেঁধেছে চুলে।

মাসুকা মিস খেয়াল করলেন, বাপ্পির মন খারাপ। ধীরপায়ে এগিয়ে গেলেন। বাপ্পির চুলে মমতার পরশ বুলিয়ে দিলেন। রংপেনসিলে বাপ্পি তার মায়ের ছবি এঁকেছে।

মাসুকা মিস ছবিটা হাতে তুলে নিলেন। বললেন, 'বাহ, বেশ সুন্দর হইছে তো!' বাপ্পি একটু তাকাল। নিষ্পাপ চোখে কিসের যেন কাতরতা! মাসুকা মিস বললেন, 'আম্মুর কথা মনে পড়তেছে?' বাপ্পি মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। মাসুকা মিস বাপ্পিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ধুর বোকা! এখানে কি মন খারাপ করতে আছে? দাঁড়াও...।'

নিজেই রং-পেনসিল টেনে নিলেন। বাপ্পির মায়ের ছবির পাশে একদম বাপ্পির মতো দেখতে একজনকে এঁকে ফেললেন। শক্ত করে বাপ্পির হাত ধরে আছেন তার মা। ছবিটা দেখে বাপ্পির মন খুশিতে ঝলমল করে উঠল...।

খুব ভাবতে ইচ্ছা করছে, আমাদের এই মৃত্যুর ফাঁদ পেতে থাকা ধুলো-কাদার পৃথিবী থেকে অনেক দূরে, আকাশের অন্য পাশে, অন্য কোনো অপার্থিব জগতে তারা বেশ আনন্দে আছে। যেখানে দুঃখ স্পর্শ করে না। যন্ত্রণার সুচ এসে বেঁধে না গায়ে। আগুন পোড়ায় না পুতুলের মতো শরীরগুলোকে।

সেই জগতে মাহেরীন মিস আর মাসুকা মিস ক্লাস নিচ্ছেন। সেই ক্লাসে কোনো হোমওয়ার্ক নেই। ১৩-এর ঘরের নামতা শেখার জটিলতা নেই। যে কেউ যেকোনো সময় বাজিয়ে দিতে পারে ছুটির ঘণ্টা। সবাই মিলে গায়, আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি...।

২

সেদিন তারাও অপেক্ষা করছিল ছুটির জন্য। স্কুল প্রায় ফাঁকা। অল্প কজন আছে। আকাশে প্লেনের শব্দ তাদের কাছে অচেনা নয়। কিন্তু তারা জানত না, এবার গর্জন তুলে যে বিমান ধেয়ে আসছে, সেই ফাইটার জেট আসলে কালো কাপড়ে মোড়া মৃত্যুদূত।

উত্তরার মাইলস্টোনে বিমান দুর্ঘটনার খবর প্রথম শুনি সহকর্মী শুভ্রর কাছে। উত্তরা, মাইলস্টোন, প্লেন ক্রাশ...এই শব্দগুলো আমাকে মুহূর্তেই হতবিহ্বল করে



দিল। শুভ্র আরও কী জানি বলে চলেছে। আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। রোবটের মতো ফোনটা হাতে নিলাম। মনে মনে আল্লাহকে ডাকছি। ফোন রিসিভ হলো। ওপাশ থেকে মানুষের আর্তচিৎকার, কান্না, বাঁচার আকুতি ভেসে আসছে। মুগ্ধর গলার স্বর বেশ উঁচুতে। বলল, 'মামা, এখন কথা বলতে পারব না। আমরা রেসকিউ করতেছি...।' ফোন কেটে গেল। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

একটু পরেই অপরাধবোধ আমাকে গ্রাস করল। মুগ্ধ আমার বড় বোনের প্রথম সন্তান। মুগ্ধকে আমরা আদরে, যত্নে আগলে রেখে বড় করেছি। সে মাইলস্টোনেই পড়ে। বিমান যখন আছড়ে পড়ে, পাশের ভবনেই ছিল মুগ্ধ। তার কোনো ক্ষতি হয়নি ভেবে স্বস্তি পাওয়ার পরেই যে ভাবনা আমাকে গ্রাস করল, আচ্ছা বিমান যেখানে বিধ্বস্ত হলো, সেখানে তো আরও অনেক 'মুগ্ধ' ছিল। তারাও কারও ভাগনে-ভাস্তে। কারও সন্তান।

একটু পরেই পুরো ফেসবুক ভেসে গেল মন গুঁড়িয়ে দেওয়া আবেগে। আমি খুবই দুর্বলচিত্তের মানুষ। সামান্য রক্তপাত সহ্য করতে পারি না। ফেসবুক বন্ধ করলাম, সারা দিনে আর ঢুকিইনি। তবু বাতাস বয়ে আনতে থাকল একের পর এক খবর। বয়ে আনতে থাকল গুজবও।

সেদিন অফিস শেষে কীভাবে বাসায় গেছি মনে নেই। নৈঋতা দরজা খুলে দিল। প্রতিদিনই দেয়। আমার ফেরার অপেক্ষা করে। আমি শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম তাকে। নৈঋতা চকলেট আনতে বলেছিল ফোনে। একদমই ভুলে গেছি। অভিমান করে গাল ফুলিয়ে নৈঋতা চলে গেল। বাবার সঙ্গে আর কথাই বলবে না!

আমার খুব কান্না পেয়ে গেল। কেবলই মনে হতে থাকল, আজ রাতে অনেক বাবা বাসায় ফেরার আগে দোকানে ঢুঁ মারবেন না। চকলেট আনার আবদার করত যে, সে চলে গেছে অভিমান-আবদারের ঊর্ধ্বে।

মুগ্ধ যখন খুব ছোট ছিল, আকাশে বিমানের শব্দ শুনতে পেলেই 'পেলেন পেলেন' বলে চিৎকার করে ছুটে যেত বারান্দায়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজত বিমান।

আমার কেবলই মনে হচ্ছে, মুগ্ধদের ক্লাস যখন আবার শুরু হবে, প্রতিবার ক্যাম্পাসের ওপর দিয়ে যখন কোনো বিমান ছুটে যাবে, বিমানের গর্জন কি বারবার তাদের বুক ছিন্নভিন্ন করবে না?

৩

আমার দুই মেয়ে। ঋদ্ধি আর নৈঋতা। দুজনই মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুলে পড়ে। ঋদ্ধি সেভেনে, নৈঋতা মাত্র ভর্তি হলো। ঋদ্ধি যখন আরেকটু ছোট ছিল, ওকে স্কুলে দিয়ে আসতাম। ঋদ্ধির পলকা শরীর। ঘাড়ে স্কুলব্যাগ। স্কুলের ব্যাগটা বড্ড ভারী। ঋদ্ধি কখনো খেয়াল করেছে কি না জানি না। স্কুলগেট পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার সময় আমি পেছন থেকে এক হাত দিয়ে ব্যাগটা উঁচিয়ে ধরে রাখতাম। যেন তার কষ্ট কম হয়।

মনে আছে, ঋদ্ধি যখন প্রথম দিন স্কুলে গেল, পুরোটা ক্লাস তার মাকে বসে থাকতে হয়েছিল পাশের ছোট্ট চেয়ারে!

নৈঋতা তার বোনের একেবারে উল্টো। মাকে যেতেই হবে না, প্রথম দিন সে স্কুলে গেল বাবার সঙ্গে। স্কুলের গেট পর্যন্ত শক্ত করে ধরে রাখা আমার আঙুলটা ছেড়ে দিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে একটুও পেছন ফিরে না তাকিয়ে নৈঋতা যেই ক্লাসরুমে ঢুকে গেল, আমি অনুভব করলাম, এখান থেকেই অদৃশ্য এক দূরত্বের তৈরি হওয়া শুরু।

এখন থেকেই তার নিজস্ব জগৎ তৈরি হতে থাকবে একটু একটু করে। তৈরি হবে বন্ধু। তারপর একদিন আসবে, আমার আঙুল ধরার প্রয়োজনই আর পড়বে না। *টুথ ফেইরির* দিনও পেরিয়ে যাবে। বাবার জন্য গল্পের ঝুড়ি নিয়ে বসার দিন পেরিয়ে আসবে বাবাকে না-বলার সিক্রেট, গোপনে লেখা পিংক ডায়েরি।

কিন্তু ওই যে বলে না, মা-বাবার কাছে সন্তানেরা কখনো বড় হয় না। আমার মা তো মানতেই পারে না আমার চুল পেকে গেছে! আমি বড় হয়েছি অভাবের সংসারে। তবু আমাদের সংসারে আর যা-ই হোক, ভালোবাসার অভাব ছিল না।

এখন বুঝি, ডিম-আলুর ডাল রান্না হলে দুটো ডিম অর্ধেকটা করে আমরা চার ভাইবোন দিব্যি খেয়ে নিতাম। তখন বুঝতাম না। এখন নিজে বাবা হয়ে বুঝি, কেন মা পাখিটা নিজে না খেয়ে পোকা ধরে এনে তার ছোট্ট ছানাদেরই খাওয়ায়।

সম্রাট হুমায়ুন যখন ছোট ছিলেন, একবার তাঁর ভীষণ অসুখ হলো। কিছুতেই অসুখ সারে না। জীবন সংকটে। তাঁর বাবা সম্রাট বাবর সারা রাত ইবাদত করে আল্লাহর

কাছে দুহাত তুলে মোনাজাত করলেন, 'হে খোদা, তুমি আমার বাকি সবটুকু আয়ু আমার সন্তানকে দাও।'

পৃথিবীর অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করা যায় না। সম্রাট বাবরের সেই প্রার্থনা কবুল হয়েছিল। হুমায়ুন ধীরে ধীরে সেরে ওঠেন। সম্রাট বাবর রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

মাইলস্টোনের ঘটনার পর থেকে আমার কেবলই মনে হচ্ছে, ওই পরিবারের মায়েরা, বাবারা কীভাবে বাকি জীবন পার করবেন? সন্তান খুকখুক করে কাশলেও মা-বাবার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। সন্তানের জ্বর হলে জলপট্টির মতো সেই উত্তাপ নিজের শরীরে শুষে নিতে চান মা-বাবারা।

যে মা পরম যত্নে সন্তানকে পোশাক পরিয়ে দিতেন, নিজের চোখের সামনে সেই সন্তানকে সাদা কাফনে মোড়ানো হচ্ছে দেখে কীভাবে সহ্য করবেন! যে বাবা নিজের কাঁধে তুলে নিতেন সন্তানকে, সেই কাঁধে সন্তানের লাশের ভার বইলেন কী করে? বুকে নিয়ে ঘুম পাড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতেন সে সন্তানকে, সে বাবা কী করে ছোট্ট কবরে নিজ হাতে সন্তানকে শুইয়ে দিয়ে এলেন চিরনিদ্রায়!

যে মরে যায়, সে-ই 'বেঁচে' যায়। মরণ তো তাদের, যারা বেঁচে থাকে!

৪

মাহেরীন মিস নিজের জীবন বিপন্ন করে আগুনের ভেতর থেকে অন্তত ২০টি শিশুকে বের করে নিয়ে আসেন। তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে উদ্ধারকারী দলের একজন নিষেধ করেছিলেন ভেতরে যেতে। মাহেরীন মিস শোনেননি। আবার ছুটে গেছেন। নিজের মৃত্যুর ঝুঁকি আর নিষ্পাপ শিশুদের জীবনের মধ্যে দ্বিতীয়টিকেই বেছে নিয়েছিলেন।

সংকটাপন্ন অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। স্বামীর হাতে হাত রেখে মাহেরীন মিস বলেন, 'আমাদের আর দেখা হবে না।' বুকভাঙা কান্নায় ভেসে যেতে যেতে স্বামী বলেন, 'তুমি আমার সঙ্গে কেন এমন করলা! আমাদেরও তো দুইটা বাচ্চা আছে। তুমি তাদের কথা ভাবলা না? আমার বাচ্চা দুইটাকে এতিম করে দিলা!' মাহেরীন মিস বলেছিলেন, 'যারা ভেতরে আটকা পড়েছিল, তারাও তো আমার সন্তান!'

এই লেখা আমি লিখছিলাম আর বিষাদ আমাকে গ্রাস করছিল। অনেকবারই ল্যাপটপ বন্ধ করে উঠে গেছি। কিন্তু লেখকের জীবন মানে অভিশপ্ত এক জীবন। তাঁকে লিখে যেতেই হয়। শরীর-মন মানে না। তবু আবার বসতে হয় ল্যাপটপে। অবাধ্য আঙুলগুলোকে শাসন করে খুটখুট টাইপ করে যেতে হয়।

কিন্তু এই অংশটা লিখতে গিয়ে নিজেকে আর আটকে রাখতে পারলাম না। আমি কাঁদছি আর লিখছি। লিখছি আর কাঁদছি।

প্রিয় মাহেরীন মিস, আপনি আমার শিক্ষক ছিলেন না। কিন্তু ভীষণ স্বার্থপর এই পৃথিবীর অনেকের শিক্ষক হয়ে গেলেন। আপনি আমাদের শেখালেন : অন্যের জন্য জীবন দিয়ে যাওয়াই মানে সার্থকভাবে 'বেঁচে' থাকা! আপনি যেন আমাদের সবাইকে ভাবসম্প্রসারণ শেখাচ্ছেন :

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও...

অলংকরণ : **রেহনুমা প্রসূন**

শুভ জন্মদিন

তোমাদের অনেকের জন্মদিন আগস্ট মাসে। এ মাসে যাদের জন্মদিন, তাদের সবাইকে কিশোর আলোর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। আশা করি, তোমাদের জন্মদিন ভালো কাটবে। ভালো থেকো তোমরা।

এ মাসে যাদের জন্মদিন—

১ আগস্ট

নারমিন আহসান
ষষ্ঠ শ্রেণি, কুমিল্লা মডার্ন হাইস্কুল, কুমিল্লা

২ আগস্ট

জান্নাতি তাসমিন রাইতা
অষ্টম শ্রেণি, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

৩ আগস্ট

মো. খাইরুল বাসার
অষ্টম শ্রেণি, মুকুল নিকেতন উচ্চবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

১০ আগস্ট

মো. মাহদী ইসলাম
নবম শ্রেণি, মালঞ্চ আব্দুল গফুর উচ্চবিদ্যালয়, জামালপুর

১০ আগস্ট

মাহজাবিন রহমান
পঞ্চম শ্রেণি, খিলগাঁও গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

১৭ আগস্ট

তাসবিহ বিনতে মাহবুব
পঞ্চম শ্রেণি, বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা

২০ আগস্ট

অহনা বখতিয়ার
দশম শ্রেণি, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

২২ শে অগাস্ট

আল মুশারাত অয়ন
পীরগঞ্জ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, রংপুর

২৬ আগস্ট

ফাওজিয়া জাহান
সপ্তম শ্রেণি, টিকাটুলী কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

২৭ আগস্ট

বিক্রম বড়ুয়া
অষ্টম শ্রেণি, বাকলিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

৩০ আগস্ট

মো. আল শাহরিয়ার ছন্দ
অষ্টম শ্রেণি, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর

এ মাসে আরও জন্মদিন

তানজিম আরশ
নবম শ্রেণি, সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

তোমাদের সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা। শুভ জন্মদিন।

মুদারাবা এক্সিম
স্টুডেন্ট সেভারস
আজকের সঞ্চয় আগামীর আত্মবিশ্বাস

মুদারাবা এক্সিম স্টুডেন্ট সেভারস

'আজকের সঞ্চয়, আগামীর আত্মবিশ্বাস'

আজকের শিক্ষার্থীরাই এ দেশের ভবিষ্যৎ চালিকাশক্তি; আগামী দিনে বাংলাদেশের মুখপাত্র। শিক্ষাজীবন থেকেই তাই শিক্ষার্থীদেরকে সঞ্চয়মুখী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। সঞ্চয়ের এই মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ করে স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ জাতি গড়তে এক্সিম ব্যাংক এবার এনেছে দু'টি অনন্য ব্যাংকিং সেবা:

- মুদারাবা স্টুডেন্ট সেভিংস ডিপোজিট একাউন্ট
- মুদারাবা মাসিক স্টুডেন্ট সেভিংস স্কিম



এক্সিম স্কুল ব্যাংকিং এর সুবিধাসমূহ

- আকর্ষণীয় লভ্যাংশ
- কোন সার্ভিস চার্জ নেই
- সর্বনিম্ন জমা ১০০ টাকা
- একাউন্টের মাধ্যমে টিউশন ফি প্রদানের সুবিধা
- ডেবিট কার্ড ও ফ্রি এটিএম সুবিধা

EXIM BANK
শরী'আহ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক
অব বাংলাদেশ পিএলসি.

যে কোন তথ্যের জন্য ১৬২৪৬

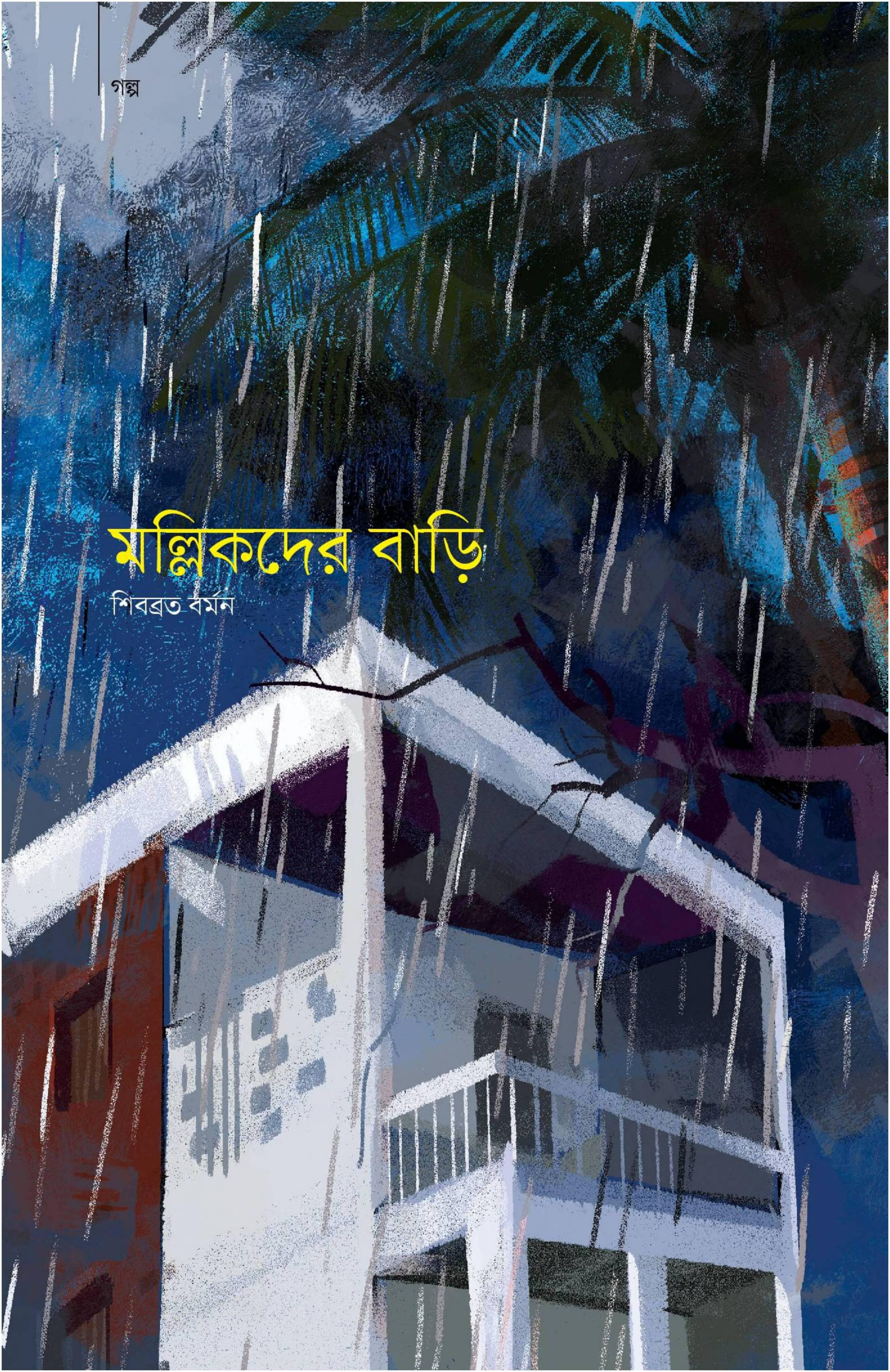
www.eximbankbd.com

Fahrenheit/Exim/2018

গল্প

মল্লিকদের বাড়ি

শিবব্রত বর্মন



আমি ভূতে বিশ্বাস করি। তবে এখন পর্যন্ত আমি ভূত দেখিনি। আমার পরিচিতজনেরাও কেউ দেখেনি।

আমার জীবনে একটা ঘটনা আছে, যেটাকে ভূত দেখা বলা যাবে না কিছুতেই, তবে ভূত না দেখা বলাও কঠিন। এই ঘটনা আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে। জগতের সব বস্তুকে আমি এখন ভিন্ন চোখে দেখি।

ঘটনাটা বলি।

বাসা বদল করা নিয়ে আমরা সেবার একটা গ্যাঁড়াকলে পড়েছিলাম। আমরা চিরকাল ভাড়া বাসায় থেকেছি। বাবা তাঁর সব জমানো টাকা দিয়ে শেষ জীবনে একটা ফ্ল্যাট কিনলেন আদাবরের দিকে। দুই বেডরুমের ছোট ফ্ল্যাট। সাড়ে সাত শ স্কয়ার ফুট। ব্যাংকের মর্টগেজ-সংক্রান্ত কী এক ঝামেলা আছে, বিধায় প্রায় অর্ধেক দামে পাওয়া গেল। ফ্ল্যাট মোটামুটি রেডি। জুলাই মাসে উঠতে পারব। তার মানে আমরা এবার ভাড়া বাসা ছেড়ে দেব।

বাসা ছেড়ে দেওয়া খুব সহজ কাজ। দুমাস হাতে রেখে মে মাসেই শেওড়াপাড়ার ভাড়া বাসার মালিককে জানিয়ে দিলাম, জুলাইতে বাসা ছাড়ছি। বাড়িওয়ালা 'টু-লেট' টাঙিয়ে দিল। কয়েকটা পরিবার বাসা দেখতে এল। দুপুর বা বিকেলের অবেলায় এসে তারা গম্ভীর মুখে আমাদের লুঙ্গি শুকাতে দেওয়া বারান্দা, বদনা উল্টে থাকা বাথরুম আর বাসনকোসন ডাঁই করে রাখা তেল-চিটচিটে রান্নাঘর ঘুরে দেখে গেল।

বাসা অনায়াসে ভাড়া হয়ে গেল। কিন্তু জুনের তৃতীয় সপ্তাহে জানা গেল, আমাদের কেনা ফ্ল্যাট রেডি নয়। আরও তিন মাস সময় লাগবে। কারণ, ভবনে লিফট লাগেনি।

বাবা গলার রগ ফুলিয়ে কোম্পানির সঙ্গে চেঁচামেচি করলেন। আমাকে অবাক করে কিছু অশ্লীল গালিও দিলেন কোম্পানির লোককে। বাবা উপনিষদ পড়া লোক। সংস্কৃত শ্লোক পড়ে আমাকে তার মানে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তাঁর মুখে অশ্লীল গালি শোনার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। এ দেশে কথার বরখেলাপ বড় অপরাধ নয়। কোম্পানির লোকটা নির্লিপ্তভাবে 'সরি' বলে গেল।

এখন কী করা?

যে বাসায় আছি, জুলাইয়ের এক তারিখে সেটা ছাড়তেই হবে। ভাড়া হয়ে গেছে। আমাদের এখন নতুন বাসা ভাড়া নিতে হবে। কয়েক মাসের জন্য।

জুলাই মাসে ওঠার জন্য জুনের তৃতীয় সপ্তাহে বাসা খুঁজতে বের হওয়া এক বিড়ম্বনা। শেওড়াপাড়ায় কোনো বাসাই পেলাম না। শুধু শেওড়াপাড়া নয়, কাজীপাড়া, সেনপাড়া—কোথাও কোনো বাসা খালি নেই। রীতিমতো অসহায় বোধ করতে থাকলাম। চারপাশের বাড়িঘরের দিকে তাকিয়ে আমার কেন জানি এক দূরসম্পর্কের মামার কথা মনে পড়ে যেতে লাগল, যার নাম শাজাহান। তিনি ছিলেন থ্যালাসেমিয়ার রোগী। ভীষণ রক্তস্বল্পতায় ভুগতেন। প্রতি মাসে তাঁর রক্ত বদলাতে হতো। এক ব্যাগ করে রক্ত লাগত। প্রতি মাসে। সেটা জোগান দেওয়া কোনো কোনো মাসে কঠিন হয়ে যেত। তখন শহরময় গিজগিজ করা রক্তে ভরপুর লোকজনের দিকে শাজাহান মামা কী দৃষ্টিতে তাকাতেন, সেটা আমি যেন অনুভব করতে শুরু করলাম। মহল্লার রাস্তা, লেন, বাই-লেন, অলিগলির দুই পাশে সারিবদ্ধ সুউচ্চ ভবনগুলোর দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে আমার মনে হতে লাগল, এত বাড়ি, বাড়ির ওপরে বাড়ি, তার ওপরে বাড়ি, কিন্তু আমাদের থাকার কোনো জায়গা নেই! আমি আর আমার বাবা কি শেষে রাস্তায় থাকব?

রাস্তায় থাকার কথা ভাবতেই আমার মুনতাসীরের কথা মনে পড়তে লাগল। কিন্তু...এই যে এইটাই আমার সমস্যা। এক কথা ভাবতে গিয়ে সম্পর্কহীন আরেকটা কথা মনে পড়ে।। বেশি বেশি সাহিত্যপাঠের কারণে নাকি আমার এ রকম হয়েছে।

বাসা খুঁজে পেতেই হবে। নীলক্ষেতে আমি যে পাইরেট বইয়ের দোকানে কাজ করি, তার মালিক মোসাদ্দেক বললেন, মিরপুরে মেট্রোরেল হয়েছে বলে ভাড়াটের চাপ। মোহম্মদপুরে খোঁজ নাও। কাজেই দোকান থেকে আগাম ছুটি নিয়ে মোহাম্মদপুরের দিকে ছুটলাম।

২৯ জুন মোহাম্মদপুরের জাকির হোসেন রোডের এক গলিতে একটা পুরোনো চারতলা ভবনে বাসা খালি পেয়ে গেলাম।

'ব্যাচেলর ভাড়া দেব না,' দোতলায় দুই পাল্লার দরজার একটা পাল্লা খুলে আমাকে দেখেই বাড়িঅলা বললেন।

'আমি ব্যাচেলর না,' আমি বিনীতভাবে বললাম।

'কে কে থাকবেন?'

'আমি আর আমার বাবা।'

'মা?'

'উনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।'

ভদ্রলোকের চোখে আফসোসের চাহনি দেখে বুঝলাম, উনি ভেবেছেন মা মারা গেছেন। আমি এতে স্বস্তিই বোধ করি। অস্বস্তিকর পারিবারিক ইতিহাস আমাকে আর উল্লেখ করতে হয় না।

'ভাই-বোন?'

'এক বোন ছিল। সে-ও আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।'

দেখলাম এবার এই কথাটা ভদ্রলোক কী অর্থে নেবেন, বুঝতে পারছেন না। আমি সরল ভাষায় বলি, 'বোন অসুখে মারা গেছে।'

'বাবাকে নিয়ে এলেন না কেন?'

'আর্থ্রাইটিসের কারণে ওনার হাঁটাচলার সমস্যা।'

বাড়িঅলা স্যান্ডো গেঞ্জির ওপর একটা হাফহাতা শার্ট চাপিয়ে চাবি হাতে চারতলায় উঠে দরজা খুলে আমাকে বাসা দেখালেন।

পুরোনো আমলের ভবন। এক ফ্লোরে একটি করে ফ্ল্যাট। ফলে বেশ বড় বাসা। ঘরগুলো বড়। তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, দুটি টানা বারান্দা। মেঝেতে পুরু ধুলা।

আমার বাসা দেখার কিছু নেই। দুদিন পর জুলাই মাসের এক তারিখে রাস্তায় থাকতে না হলেই হলো। ভাড়া যা-ই হোক, নিতে হবে। কয়েক মাসের ব্যাপার।

ভাড়া আমার অনুমানের চেয়ে অনেক কম হলো।

রাজি হয়ে গেলাম। এমনকি কিছু টাকা অ্যাডভান্সও করে দিলাম।

ভবন থেকে বেরিয়ে দেখি, ঝিরঝির বৃষ্টি নেমেছে। এমন বৃষ্টি গুরুত্বও দেওয়া যায় না, আবার উপেক্ষাও করা যায় না। হেঁটে গিয়ে গলির মুখে মুদির দোকানের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। এক মধ্যবয়সী লোক এসে একটা লাকি সেভেন সিগারেট কিনে ধরিয়ে বলল, 'এখানে কার কাছে এসেছেন?'

'বাসা ভাড়া নিতে।'

'কোন বাসা?'

'ওই যে চারতলা বাড়িটা।'

'অ। মল্লিকদের বাসা। কয় তলায়?'

'চারতলায়।'

'ভাড়া নিলেন?'

'হ্যাঁ।'

লোকটা একবার আড়চোখে তাকাল আমার দিকে। তারপর প্রায় স্বগতোক্তির মতো বিড়বিড় করে বলল, 'পারবেন থাকতে?'

আমি একটু অবাক হলাম। বললাম, 'কেন?'

'দুর্নাম আছে। ভাড়াটিয়া টেকে না,' বলে লোকটা সিগারেট হাতে হালকা বৃষ্টির মধ্যে নেমে চলে গেল।

আমি অস্বস্তিতে পড়লাম। সন্দেহ নেই, লোকটা অভব্য। অচেনা কারও সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলে না। অন্তত গায়ে পড়ে এ রকম তথ্য দেয় না। হতে পারে লোকটা হিংসুটে প্রতিবেশী। হয়তো মল্লিকদের সঙ্গে এই লোকের কোনো বিরোধ আছে। সেটা কী রকম বিরোধ হতে পারে, এ বিষয়ে আমার কল্পনার ঘোড়া ছুটতে শুরু করার আগেই রাশ টেনে ধরলাম।

দোকানের শেডে দাঁড়িয়ে আমি ঘাড় ঘুরিয়ে পুরোনো ধাঁচের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। মল্লিকদের বাড়ি। বাড়িওয়ালার নাম কি মল্লিক? জিজ্ঞেস করা হয়নি। কলাপসিবল গেটের এক পাশে একটা বরই, আরেক পাশে একটা নারকেলগাছ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গলির শেষ মাথার বাড়িটা। বৃষ্টির কারণে সন্ধ্যার আগেই আলো নিভে আসছে।

একবার মনে হলো, বাড়িটাও যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

অস্বস্তি লাগল।

কল্পনাপ্রবণ হওয়ার কারণেই হয়তো আমি বেশ ভিতু প্রকৃতির। সবকিছুতে দ্বিধাগ্রস্ত থাকি। কোথাও প্যাঁচ-পয়জারের আঁচ পেলে এড়িয়ে চলি। বুঝলাম, সিগারেট খাওয়া অভব্য লোকটার কথা আমার ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। গা ঝাড়া দিলাম। এগুলোকে এখন মোটেও পাত্তা দেওয়া যাবে না। বাসা নিয়ে সমস্যা যদি কিছু থেকে থাকে, পরে দেখা যাবে। তা ছাড়া দু-এক মাসেরই তো ব্যাপার।

রিকশায় ফিরতে ফিরতে দেখলাম, মনের ভেতরের খচখচানি কিছুতেই যাচ্ছে না। বাসার ভাড়া এত কম কেন? আর একটা কথা তো জিজ্ঞাসাই করা হয়নি। বাসা খালি কেন? মেঝেতে যে পরিমাণ ধুলা দেখলাম, বোঝা যায়, বেশ কিছুকাল ধরে বাসা ফাঁকা। কেন?

১ জুলাই আমরা নতুন ভাড়া বাসায় উঠলাম।

বাসাবদলের একটা বিষাদময় দিক আছে। সেটা শুধুই চেনা মহল্লার দেয়াল-নর্দমা, চেনা দোকান থেকে সাবান কেনার অভ্যস্ততা থেকে উৎখাতের কারণে নয়। এক বাসা থেকে আরেক বাসায় স্থানান্তরিত হওয়ার মাঝখানে একটা ভাসমান পর্ব থাকে, যখন খোলা ট্রাকে বাসার যাবতীয় ফার্নিচার তোলা হয়—খাটপালঙ্ক, সোফা সেট, ড্রেসিং টেবিল, আলনা, ট্রাংক, বইয়ের আলমারি, রান্নাঘরের বাসনকোসন। সিলিং ফ্যানের পাখাগুলোকে খুলে কাগজে মোড়া হয়, খাটগুলোও খুলে ফেলা হয়, আলাদা করে ফেলা হয় ওয়ার্ডরোবের ড্রয়ার। সবকিছু এমনভাবে স্তূপ করা হয়—একটার ফাঁকে আরেকটা ঠেসে দিয়ে, কখনো কাত বা উল্টো করে—যাতে খোলা ট্রাকের ওইটুকু পরিসরে সব এঁটে যায়। সেই ট্রাক যখন শহরের প্রধান সড়ক বেয়ে ছুটে যেতে থাকে, ট্রাফিক সিগনালে দাঁড়ায়, অপেক্ষা করে, তখন প্রথমবারের মতো গৃহস্থ মানুষ বিস্ময়ে অনুধাবন করে, তার এত দিনের ছড়িয়ে থাকা প্রশস্ত সংসারটা কেমন এঁটে গেছে একটা চলমান বাহনের সংক্ষিপ্ত পরিসরে। হাতের তালুর চাপে একটা হাওয়াই মিঠাই যেভাবে চুপসে মার্বেল সাইজের হয়ে যায়, সে রকম। আর সেই চুপসানো সংসারটাকে শহরের ব্যস্ত সড়কের মধ্য দিয়ে গড়িয়ে যেতে দেখে গৃহস্থের অসহায় লাগে। বাসাবদলের এইটাই সবচেয়ে বিষাদময় দিক। ট্রাকের পেছনে নাইলনের রশি দিয়ে বাঁধা সংসারটাকে দেখতে পাওয়া। এত দিনকার এত সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, স্মৃতি-অভিমান—সব যেন ঠেসে দলা পাকিয়ে নাইনলের দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

উবার নিয়ে ট্রাকের পেছন-পেছন যেতে যেতে ভাবছিলাম, দুই বাসার মধ্যবর্তী এই ভাসমান পর্বটি সংক্ষিপ্ত হলেও তা কত তীব্রভাবে বাস্তব। আর তখন বার্দো নামে একটা বৌদ্ধবিশ্বাসের কথা মনে পড়ল। আমার বন্ধু মাহবুবের কাছ থেকে শুনেছিলাম কথাটা। বৌদ্ধরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করে। মানুষ মরে গেলে পৃথিবীতেই তার আবার জন্ম হয়। ভিন্ন কোনো রূপে। ভিন্ন পরিচয়ে। কিন্তু মারা যাওয়ামাত্রই তো আর পুনর্জন্ম ঘটে না। দেহহীন আত্মার একটা অপেক্ষা পর্ব থাকে। এক দেহ থেকে বেরিয়ে আরেক দেহে প্রবেশের মাঝখানে আত্মার এই অপেক্ষমাণ ত্রিশঙ্কু দশাটির নাম বার্দো। আত্মা তখন এ জগতেই আছে, আবার এ জগতে নেই।

ট্রাক থেকে যখন আসবাব নামাচ্ছি, তখন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ঘনাদার মতো প্রশস্ত কপালের একটা শুকনো লোক এসে কিছুক্ষণ কৌতূহলী চোখে দাঁড়িয়ে থেকে জানতে চাইল, আমাদের পরিবারে মনিমুল হক নামে কেউ আছে কি না।

'না। কেন বলুন তো?'

লোকটা কোনো জবাব না দিয়ে চলে গেল।

পুরো মহল্লাই কেমন যেন, উদ্ভট স্বভাবের লোকে ভরা।

একতলায় কেউ থাকে না। সেখানে একটা স্ক্রিনপ্রিন্টের ফ্যাক্টরি। ছবির ফ্রেমও তৈরি করে। তাতে স্যান্ডো গেঞ্জি পরা কিশোর বয়সী কয়েকটি শ্রমিক কাজ করছে। দোতলায় বাড়িঅলা থাকেন। ধরে নিলাম তাঁর নাম মল্লিক। তার ওপরে তিনতলায় একটা পরিবার থাকে। তাদের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। আর চারতলায় আমরা উঠছি।

নতুন বাসা আমাদের আগের বাসার চেয়ে অনেক বড়। বাবা টানা প্রশস্ত বারান্দা দেখে বললেন, কাপড় শুকাতে সুবিধা হবে। আর আমার মনে হলো, এখানে একটা দারুণ টব-বাগান করা যাবে। আর বলামাত্র, কী আশ্চর্য, বারান্দা থেকে দেখি, পাশে একটা একতলা প্লট। সেখানে একটা একতলা টিনের বাড়ি। উঠানে একটা মধ্যবয়স্ক লোক টুলে বসে প্যাডেল হুইল চালিয়ে টব বানাচ্ছেন। ওপর থেকে দৃশ্যটা অপূর্ব লাগল। আমি কখনো সামনাসামনি ঘুরন্ত হুইলে পটারির কাজ দেখিনি। নরম কাদামাটির দলায় হাতের তালু আর আঙুল ছুঁইয়ে কুমার কেমন ম্যাজিশিয়ানের মতো নানান অবয়বের পাত্রকে অস্তিত্বশীল করে তুলছেন, তা শুধু নাটক-সিনেমার পর্দাতেই দেখেছি। শুনেছি, উর্বর মস্তিষ্কের কোনো কোনো দার্শনিক বলেন, কাদামাটির দলার ভেতরে পৃথিবীর সব মৃৎপাত্রের অবয়ব নাকি লুকানো থাকে। আগে থেকে। সম্ভাবনা আকারে।

একতলা বাড়ির উঠানে একটা চালতা আর একটা শরিফাগাছ। কালচে সবুজ এক আমগাছ টিনের চালটাকে ছায়া করে রেখেছে। বাড়ির লোকজন দেখছি, মুরগি পালে। ঢাকা শহরে এখনো বাসায় মুরগি পালন কেবল জাকির হোসেন রোডেই সম্ভব।

আমি একা একা গোছগাছ করতে হাঁপিয়ে গেলাম। এক দিনে সব কার্টন খোলা সম্ভব হলো না। বেশির ভাগ

জিনিস অগোছালো রেখে চা চড়িয়ে দিলাম। আর তখন মল্লিক সাহেব এলেন। লুঙ্গি আর কুর্তা পরা। তিনি অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে সকাল থেকে হাসপাতালে ছিলেন, তাই খোঁজখবর নিতে পারেননি। এখন বাসায় ফিরেই খোঁজ নিতে এসেছেন, সব ঠিকঠাক আছে কি না। তাঁকেও চা দেওয়া হলো এবং বারান্দায় বসে একসঙ্গে চা খেতে খেতে বুঝলাম, এ রকম অমায়িক বাড়িঅলা পুরো শহরে দ্বিতীয়টা হয় না। তিনি বসে থাকা অবস্থায় দুবার বললেন, 'কোনো সমস্যা দেখা দিলে বলবেন। জানাবেন।' চলে যাওয়ার সময় চৌকাঠে পা দিয়ে তিনি যখন একই কথা তৃতীয়বার বললেন, তখন আমার মনে হলো, কথাটা শুধু নবীন ভাড়াটের প্রতি যত্নবান বাড়িঅলার ভদ্রতাসূচক বাণী নয়, এর ভেতরে কোথাও একটা উদ্বেগ লুকিয়ে আছে। খুব সূক্ষ্ম।

ইলেকট্রিশিয়ান লোকটা ফ্যান আর লাইট লাগিয়ে চলে গেল। কলমিস্ত্রিও সিংক ও বাথরুমের কলের প্যাঁচ টাইট দিয়ে দিল।

রাত নয়টা নাগাদ ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, ফ্যান ঘুরছে না। কারেন্ট চলে যায়নি, নিশ্চিত। কারণ, ফ্রিজের শব্দ পাচ্ছি। ফ্যানটা কোনো ত্রুটির কারণে বন্ধ হয়ে গেছে, নতুবা কেউ বন্ধ করে দিয়েছে। বাবা? বিছানায় উঠে বসতেই টের পেলাম, লাইট বন্ধ থাকলেও আমি ঘরের সবকিছু দেখতে পাচ্ছি। একটা কমলা রঙের আলোর আভায় ঘর আলোকিত হয়ে আছে। কোথা থেকে এই আলো আসছে, বুঝতে পারলাম না। এক পাশের জানালা খোলা। কিন্তু বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার।



আমি উঠে ফ্যানের সুইচ আবার চালু করলাম। ফ্যান ঘুরতে শুরু করল। বাবার দরকার হতে পারে ভেবে আমি ঘরের দরজা লাগাই না। ভেজানো থাকে। পাল্লা খুলে বাইরে ডাইনিং স্পেসে পা রাখলাম। ডাইনিং স্পেসেও সেই একই রকম কমলা রঙের আলো। যেন একটা অদৃশ্য ডিম লাইট জ্বলছে। সেই সঙ্গে একটা পোড়া গন্ধ নাকে লাগল। খুব হালকা। যেন কোথাও কাগজ পুড়ছে। আমি উদ্বিগ্ন হলাম। ইলেকট্রিক শর্টসার্কিট হচ্ছে কি না কোথাও। অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিরাট একটা খটকা লাগল। ফ্রিজটা জায়গামতো নেই। রান্নাঘরের দরজার পাশে ফ্রিজ রাখা হয়েছিল, আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেইটাই সবচেয়ে যৌক্তিক জায়গা। কিন্তু এখন ফ্রিজটা লিভিং স্পেসের দেয়ালে ঠেস দেওয়া। যেহেতু একটা ফ্রিজ নিজে থেকে জায়গা বদল করবে না এবং যেহেতু বাবার পক্ষে রাতের বেলা সেটা সরিয়ে আরেক জায়গায় টেনে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব, কাজেই ধরে নিলাম, আমার স্মৃতিই ভুল করছে। আমিই ফ্রিজটা ওখানে রেখেছি।

বাবার রুমের দরজাও ভেজানো থাকে। সে ঘরে উঁকি দিয়ে প্রথমবারের মতো চমকে উঠলাম। বাবার বিছানাটা ঠিক জায়গায় নেই। সেটা উত্তর-দক্ষিণে পাতা হয়েছিল। এখন তা পুব-পশ্চিমে হয়ে আছে।

বাবা ঘুমাচ্ছেন। আমি তাঁকে ডাকলাম না।

দরজা ভেজিয়ে ডাইনিং চেয়ারে এসে বসলাম। ডাইনিং টেবিলে একটা পরিপাটি অয়েলক্লথ। তার ওপর ভাত-তরকারি ঢেকে রাখা। পানির জগে অর্ধেক পানি। তার পাশে সাজানো এক সার কাচের গ্লাস, উল্টে রাখা। এগুলো কোথা থেকে এল? গ্লাস-থালা-বাটি কিছুই তো প্যাকেট থেকে বের করা হয়নি। রান্নাঘরে কার্টনে এখনো সেগুলো বেঁধে রাখা।

আমি আর বিছানায় ফিরে গেলাম না। সব লাইট জ্বেলে দিয়ে সারা রাত ডাইনিং টেবিলে বসে থাকলাম।

সকালে নীলক্ষেতে যাওয়ার জন্য বের হয়ে দোতলায় মল্লিক সাহেবের বাসায় নক করলাম। কাজের মেয়েটি জানাল, সাহেব সাতসকালে আবার হাসপাতালে দৌড়েছেন।

পরের রাতে একই ঘটনা। ঘুম ভেঙে দেখি ফ্যান ঘুরছে না। কমলা আলোর আভায় সারা বাড়ি আলোকিত। পোড়া গন্ধটা আজ আরও বেড়েছে।

আজ আর আলো জ্বাললাম না। সারা বাসা ঘুরে দেখতে লাগলাম, চমকে যাওয়ার মতো কী কী অপেক্ষা করছে। আসবাব এবং অন্য জিনিসপত্র যে তাদের অবস্থান আবারও বদল করেছে, সেটা বোঝা গেল। পাশাপাশি আরেকটা নতুন জিনিস চোখে পড়ল: আমাদের নিজেদের আসবাবের পাশাপাশি এমন আরও কিছু আসবাব এখানে আছে, যেগুলো আমাদের নয়। আর এই আসবাবগুলো শুধু রাতের বেলাতেই হাজির হচ্ছে, যখন আলো নেভানো থাকছে আর কমলা আলোয় বাসাটা ভরে যাচ্ছে। বৈদ্যুতিক আলো জ্বাললে এগুলো থাকছে না।

এ মুহূর্তে আমি একটা আস্ত ডিনার ওয়াগন দেখতে পাচ্ছি দক্ষিণ দেয়ালে ঠেস দেওয়া। আমাদের কোনো ডিনার ওয়াগন নেই। ফলে সেটার ভেতরের কোনো বাসনকোসন আমাদের নয়

এ মুহূর্তে আমি একটা আস্ত ডিনার ওয়াগন দেখতে পাচ্ছি দক্ষিণ দেয়ালে ঠেস দেওয়া। আমাদের কোনো ডিনার ওয়াগন নেই। ফলে সেটার ভেতরের কোনো বাসনকোসন আমাদের নয়। আমি বাসনগুলো মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতে থাকলাম। কিছু চায়নিজ টি-পট আমি হাতে তুলে নিলাম ডিনার ওয়াগনের দরজার পাল্লা খুলে। নেড়েচেড়ে দেখলাম সেগুলোর ফুলতোলা ডিজাইন। ভালো করে দেখতে হলে আলো জ্বালতে হবে। কিন্তু আমি জানি, আলো জ্বালানোমাত্র এগুলো গায়েব হয়ে যাবে।

সবচেয়ে বিস্মিত হলাম এ রকম পরিস্থিতিতে আমার নিজের প্রতিক্রিয়া দেখে। আমি প্রবল ভিতু মানুষ। অথচ সামান্য গা-ছমছম শিরশিরে অনুভূতি ছাড়া আমার মধ্যে কোনো তীব্র ভয় বা দম বন্ধ করা আতঙ্ক তৈরি হলো না। যেন এসব আমার নিজের জীবনে ঘটছে না। আমার অভিজ্ঞতার সীমানার বাইরে এগুলো ঘটছে। যেন আমি সিনেমা হলের আসনে বসে কোনো ভয়ের সিনেমা দেখছি। আরও অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, এই বিদঘুটে ব্যাখ্যাহীন ঘটনাগুলো আমার মধ্যে আতঙ্কের চেয়ে কৌতূহলই যেন বেশি তৈরি করছে। কারণ টের পাচ্ছি, প্রতিদিনই নতুন কিছু অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

কেউ যেন আমাকে একটু একটু করে ভাঁজ খুলে খুলে একটা নকশাদার পোশাক দেখাচ্ছে, যেভাবে দোকানদার জামদানি শাড়ি দেখায়।

ফলে তৃতীয় ও চতুর্থ দিন সিঁড়িতে ও সামনের রাস্তায় যখন মল্লিক সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো এবং তিনি আমাকে 'সব ঠিকঠাক তো?' জিজ্ঞেস করলেন, আমি নিজেকে অবাক করে মৃদু স্বরে বললাম, 'হ্যাঁ। সব ঠিক আছে।' আমার মনে হলো, তিনি যেন আরও কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

পঞ্চম রাতে আমি সব আলো জ্বালিয়ে রেখে ঘুমাতে গেলাম। ঘুম ভাঙল সেই একই কমলা আলোর আভায়। কেউ সুইচগুলো সব নিভিয়ে দিয়েছে। আমি জানতাম তা-ই ঘটবে। ঘর থেকে বেরিয়ে আমি ড্রয়িংরুমে এমন একটা সোফায় বসলাম, যেটা আমাদের নয় এবং যেটা আলো না জ্বালানো পর্যন্ত অস্তিত্বশীল থাকবে। আজ দেখি এক কোনায় একটা চুপসানো ফুটবল পড়ে আছে। বসার ঘরে দেয়ালে একটা টেলিভিশন। সেটাও আমাদের নয়। আমাদের টেলিভিশনটা বাবার ঘরে। উনি সেটায় বাংলা সিরিয়াল আর ক্রিকেট দেখেন।

আমি উঠে গিয়ে পশ্চিম দেয়ালের সেই বন্ধ জানালাটার সামনে দাঁড়ালাম, যেটা সেখানে থাকার কথা নয়। তৃতীয় রাত থেকে এটা এখানে আছে। তিন পাল্লার কাঠের জানালা। আমি ছিটকিনি তুলে পাল্লা খুলে দিলাম। বাইরেও চরাচরজুড়ে সেই একই কমলা আলো। এখান থেকে রাস্তার একটা অংশ দেখা যায়।

সকালবেলা নাশতা খেতে খেতে বাবাকে বললাম, 'তুমি আমাকে উপনিষদের একটা শ্লোক বলেছিলে অনেক দিন আগে। সেটা কি আরেকবার বলবে?'

বাবা বললেন, 'কোনটা?'

'সেই যেটায় ন হন্যতে কথাটা আছে।'

'ও আচ্ছা। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরানো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। এটা?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'গীতার শ্লোক।'

'মানে কী?'

'মানে হলো, আত্মা চিরন্তন, শাশ্বত এবং পুরাতন। শরীরের মৃত্যু হলেও আত্মার মৃত্যু হয় না। ন হন্যতে মানে হলো হত হয় না, অর্থাৎ নিহত হয় না।'

'তো নিহত না হলে আত্মার কী হয় তাহলে?'

'পুনর্জন্ম হয়। আত্মা ফিরে ফিরে আসে।'

আমার তখন মাহবুবের কথা মনে পড়ল। সে-ও প্রায় একই কথা বলত। বার্দোর কথা। এক জন্ম থেকে আরেক জন্মে যাওয়ার আগে, এক দেহ থেকে আরেক দেহে প্রবেশের মাঝখানে আত্মার ওয়েটিং রুম। মাহবুব গল্প-উপন্যাস লেখার চেষ্টা করত। এখন ইতালিতে থাকে। ফুটপাতে চামড়ার মানিব্যাগ, চাবির রিং, ফ্রিজের ম্যাগনেট বিক্রি করে।

আলুভাজি দিয়ে রুটি খাওয়া শেষে বাবা হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, 'তুই কি বাসাটা বদলাবি ভাবছিস?'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম তাঁর দিকে।

বাবা বললেন, 'বাসাটায় সমস্যা আছে, টের পাচ্ছি। প্রথমে ভেবেছিলাম, শুধু আমারই হচ্ছে। হ্যালুসিনেশন। বার্ধক্যের ফল। ওষুধের এফেক্ট। সেটাই ভেবেছিলাম।'

আমি বললাম, 'তোমার ফ্ল্যাট কবে রেডি হবে?'

'দেখি, খোঁজ নিই।'

আমি বুঝতে পারছি, চাইলেও বেশি দিন এ বাসায় থাকা যাবে না। প্রতি রাতে পোড়া গন্ধের তীব্রতা বাড়ছে। সেই সঙ্গে নতুন যোগ হয়েছে উত্তাপ। চিটপিটে গরম লাগে। ফ্যান চালিয়েও গরম যায় না। রীতিমতো আঁচ লাগে গরমের।

ফ্ল্যাট রেডি হতে বেশি দেরি হলো না। দ্বিতীয় মাসে আমরা এই বাসা থেকে ভাসানটেকের ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠলাম। আবার সেই সংসার বেঁধে ট্রাকে তোলা। আমি জানি, ট্রাকে উঠছে কেবল আমাদের নিজস্ব আসবাবগুলোই। ওই চুপসানো ফুটবল কিংবা ওই চায়নিজ টি-পট উঠবে না। ওঠার কোনো উপায় নেই। সেগুলো এই বাসাতে থেকে যাবে। কতকাল? আমি জানি না।

আমাদের ভাড়া বাসার জীবন শেষ হলো। নিজস্ব ফ্ল্যাটে উঠলাম। এ এক অন্য রকম অনুভূতি।

নীলক্ষেতে যে দোকানে আমি সেলসম্যানের কাজ করি, সেটা পাইরেটেড বই বিক্রি করে। যেসব বইপত্র জনপ্রিয় হয়, সেগুলোর নকল কপি তৈরি করে বিক্রি করা হয়। একদিন দেখি মৈত্রেয়ী দেবীর একটা উপন্যাস নকল হয়ে এসেছে। নাম *ন হন্যতে*। তখন বাবার বলা সেই সংস্কৃত শ্লোকটা মনে পড়ল। আর সেই সূত্রে মনে পড়ল মল্লিকদের বাড়িটার কথা। আমার মাথা এভাবেই কাজ করে। একটা কথার সূত্র ধরে সম্পর্কহীন আরেকটা কথা আসে। একটা স্মৃতির সূত্র ধরে আসে যোগসূত্রহীন আরেকটা স্মৃতি।

সেদিন বাসায় ফেরার পথে ঘুরপথে জাকির হোসেন রোডে মল্লিকদের সেই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। চারতলাটা এখনো খালি। আমরা চলে যাওয়ার পর আরেকটা পরিবার উঠেছিল। তারাও ছেড়ে দিয়েছে।

এখন আমার কাছে আর কোনো রহস্য নেই। এখন আমি সবই জানি। চারতলা এ বাড়ির চতুর্থ তলায় আগুন লেগেছিল। আমরা ওঠার বেশ কয়েক বছর আগে। রাতের বেলা গ্যাসের চুলা অথবা বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকে আগুন। কেউ মারা যায়নি বা আহত হয়নি। কারণ, বাসায় তখন কেউ ছিল না। কোথাও দাওয়াত খেতে গিয়েছিল। পুরো বাসা পুড়ে গেছে। দরজা-জানালা কিছুই রক্ষা করা যায়নি। শুধু চারতলাটাই পুড়েছে। বাড়ির ছেলেটার ফুটবল, খেলনা সাইকেল, ডিনার ওয়াগন, টিভি-ফ্রিজ, সোফা সেট চিটপিট শব্দ করে পুড়েছে। পরে চারতলাটা রেনোভেট করা হয়। কাঠের পাল্লা আর চৌকাঠের বদলে দেওয়া হয় লোহার গ্রিল। পুড়ে যাওয়া দেয়ালের ইট বদল করা হয়।

মাহবুব বলে, মানুষের মৃত্যু হলেও তার আত্মার মৃত্যু হয় না। তারা থেকে যায় একটা মধ্যবর্তী, ত্রিশঙ্কু অবস্থায়, যেটাকে বার্দো বলে। তারপর সেখান থেকে তারা ফিরে আসে।

মল্লিকদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আমি ইতালিতে মাহবুবকে ফোন দিই। হোয়াটসঅ্যাপে। সে তখন পুলিশের তাড়া খেয়ে তড়িঘড়ি ফুটপাতের দোকান গোটাচ্ছে। আমাকে বলল, 'কী বলবি, জলদি বল।'

আমি বলি, 'পরে বলব।'

যে কথাটা মাহবুবকে বলতে গিয়ে বলা হলো না, তা হলো, একটা বাড়ি যদি পুড়ে গিয়েও নিঃশেষ হয়ে না যায়, যদি সেটা মাঝখানে একটা ত্রিশঙ্কু অবস্থায় থেকে যায়, আমরা কি বলতে পারব, সেটা বার্দো অবস্থায় আছে?

একটা বাড়ির কি আত্মা থাকতে পারে?

অলংকরণ : **তনি সুভংকর**

বিজ্ঞানের Big Fun With রাতুল ভাইয়া



তুমি কি বিজ্ঞানবাক্স ব্যবহার করো? বিজ্ঞানবাক্স কিনতে গিয়ে, এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে কি এমন কোনো মজার ঘটনা ঘটেছে যেটা তুমি বলতে চাও? অথবা তোমার মাথায় কি এমন কোনো আইডিয়া এসেছে যা সবাই জানলে চমকে যাবে?

তাহলে সময় এখন তোমারই! এখন তুমি রাতুল ভাইয়ার সাথে অনলাইনে আড্ডা দিতে পারবে বিজ্ঞানবাক্স নিয়ে। তোমার গল্পটা শুনবে সারা বাংলাদেশ!

এখন থেকে প্রতি মাসে আমরা এমন অন্তত দুটি সেশন করতে চাইছি।
“বিজ্ঞানের Big Fun With রাতুল ভাইয়া”
লাইভ হবে গুগল মিট বা জুমে ।

৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী যে কেউ অংশ নিতে পারবে এখানে।

অংশ নিতে হলে
কিউআর কোড স্ক্যান করে
ফর্মটি পূরণ করো।

বিজ্ঞানবাক্স পাওয়া যাচ্ছে

স্বপ্নবন | meena bazar bringing freshness to your life | রকমারি.com www.rokomari.com

এছাড়াও নিকটস্থ লাইব্রেরিতে এবং

bigganbaksho.com

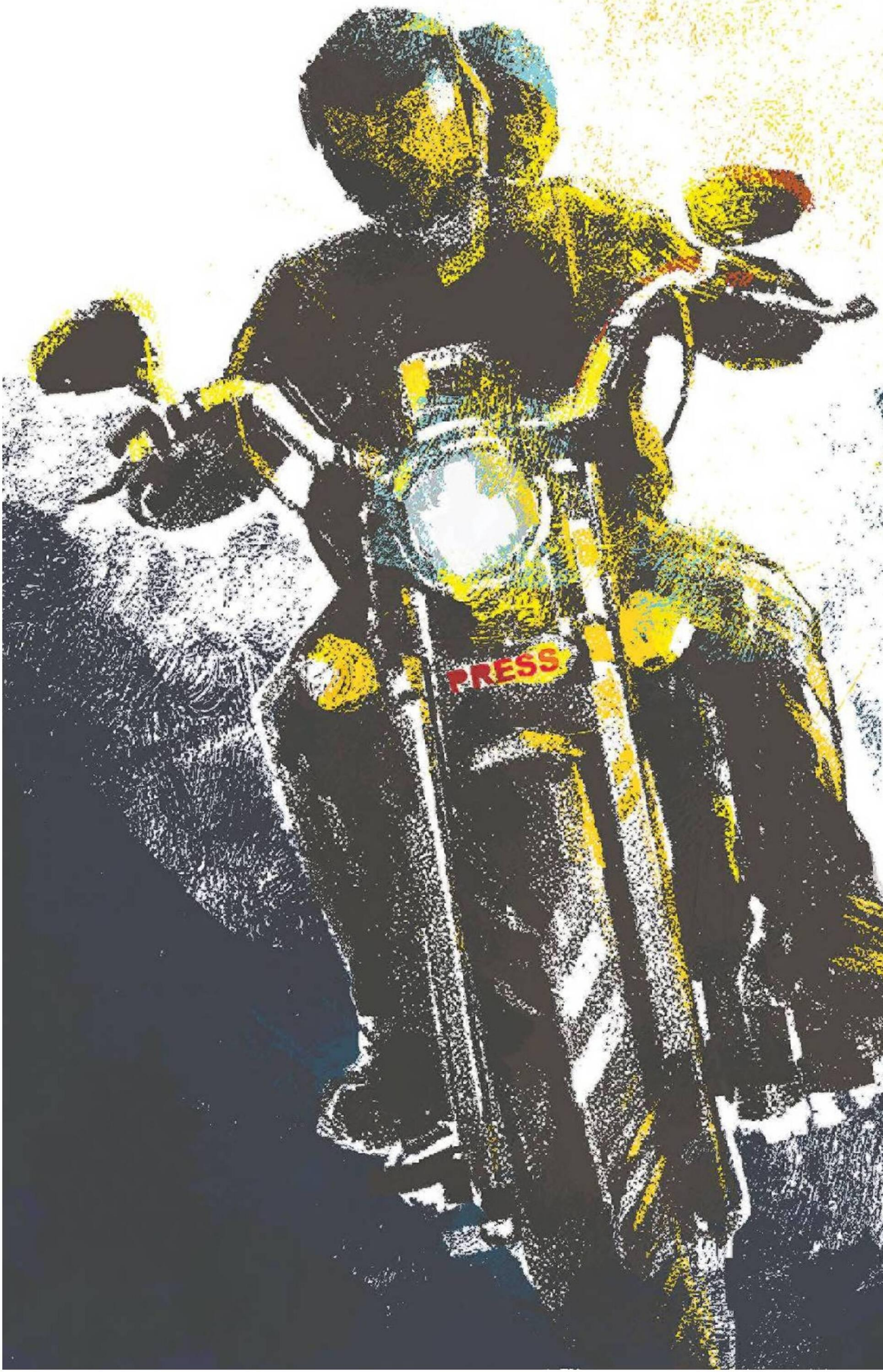
অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্স

অলৌকিক রহস্যসন্ধানী শিপলুর গল্প

পাতালপুরী

নাবিল মুহতাসিম

বিখ্যাত অলৌকিক রহস্যসন্ধানী আর্দশির শাপুর শিপলুর এ গল্পটাও বরাবরের মতো প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক *হালচাল* পত্রিকার নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকের একটা সংখ্যায়। মূল কাহিনির পরে অলৌকিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া ছিল। এখানে কেবল মূল ঘটনাটা তুলে ধরা হলো।



আমি আর্দশির শাপুর শিপলু, বয়স ছাব্বিশ, পেশায় সাংবাদিক, নেশায় অলৌকিক রহস্যসন্ধানী। মাসিক *হালচাল* পত্রিকার পাঠকদের তা এত দিনে জানতে বাকি নেই নিশ্চয়ই। আমি কীভাবে কোনো রহস্যের সন্ধান পাই, সেটাও প্রতিটি প্রতিবেদনের শুরুতে উল্লেখ করতে ভুলি না। বেশির ভাগ সময় আমার অফিসের ঠিকানায় চিঠি বা ফোন আসে, আবার অনেক সময় সশরীরও হাজির হয়ে যান অলৌকিক সমস্যায় ভুগতে থাকা কেউ। আবার নিজেই হুট করে গিয়ে পড়ি রহস্যের ভেতর, এমন ঘটনাও কম নয়।

গিয়েছিলাম মিটফোর্ড হাসপাতালে, একটা রোগী দেখতে। আত্মীয়ের হাতে ফলমূলের থলে ধরিয়ে দিয়ে, তাঁর রোগের বিবরণ শুনে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে যখন বেরিয়ে এলাম, তখনো সন্ধ্যা নামেনি। এমনিতে অন্যদিন পত্রিকা অফিস থেকে বেরই হই এই সময়, কিন্তু আজ কাজের চাপ ছিল না তেমন। সম্পাদক হিফজুর রহমান সাহেবের থেকে অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে সমস্যা হয়নি।

লোকজনের ভিড় হাসপাতাল প্রাঙ্গণে। সেটা এড়িয়ে হাসপাতালের প্রধান ভবন ঘুরে চলে এলাম পেছন দিকটায়। ঢাকা শহর বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত—মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় পড়া লাইন। শেষ বিকেলের আলোয় ঝলমল করছে বুড়িগঙ্গার পানি। কালচে, দুর্গন্ধযুক্ত; তবু মনোহারিণী।

ধাপে ধাপে বানানো পাকা ঘাটে এসে দাঁড়ালাম। সারি সারি ডিঙি ভাসছে নদীর বুকে, সঙ্গে কয়েকটা মালবাহী বড় বোট। অফিস ছুটির সময়, বহু লোক ফিরছে নদীর ওপারে নিজের বাসায়। ওপারের একতলা-দোতলা বাড়িঘর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ব্যস্ত নগরজীবন আর নদীর পানির নাচন দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম খানিকটা। বাদানুবাদের শব্দে চমক ভাঙল। কী ভেবে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম।

ঘাটে ভেড়া একটা ডিঙি ঘটনার কেন্দ্রস্থল। টাকমাথা দাড়িওয়ালা বুড়ো মাঝি উত্তেজিতভাবে কিছু বলছে, তাকে ছাপিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে ডিঙিতে রয়ে যাওয়া একমাত্র যাত্রী, ১২-১৩ বছরের এক সদ্য কিশোর। 'আমি কী করি, সেটা আমার ব্যাপার! আপনার কাজ নৌকা চালানো, আপনি নৌকা চালান!'

'আর কয়বার ঘুরবা বাপজান? সইন্ধা নাইমা যাইতাছে। বাড়িত যাও। তুমার বাড়ি কনে?' বুড়ো হাল ছাড়ার পাত্র নয়।

তর্কটা ভাড়া নিয়ে হচ্ছে না এবং সেটাই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ছেলেটা—বেশ শুকনো চেহারা, একমাথা চুল, শ্যামলা চেহারা, হাফহাতা শার্ট আর হাফপ্যান্ট পরনে— বলছে, 'ভাড়া তো দিচ্ছি। আমি নৌকায় ঘুরলে আপনার সমস্যা কী?'

যেকোনো ঝামেলায় নাক গলানো সাংবাদিকদের কাজ। আমিও তা-ই করলাম। কাছে দাঁড়িয়ে নরম গলায় বললাম, 'কী হইছে চাচা?'

একজন সম্ভাব্য সমর্থক পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে বুড়ো মাঝি বলতে শুরু করল, 'দেহেন বাবাজি...এই পুলাটা দুই ঘণ্টা ধইরা আমার নৌকায় খালি এপার-ওপার করতাছে। নামেও না, কিছু না। বাড়িও যাইব না। বাড়ি থাইকা পালাইছে মনে অয়। অর ভালোর লাইগা কইতাছি বাড়ি যাইতে।'

আমি কিছু বলার আগেই গোঁয়ারের মতো বলল ছেলেটা, 'আমি নামব না।'

'কেন ভাইয়া?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করলাম আমি। বাড়ি পালিয়েছে—এই অভিযোগের বিরুদ্ধে যে সে কিছু বলেনি, তা নজর এড়ায়নি আমার।

সরাসরি আমার দিকে তাকাল ছেলেটা। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, কিন্তু কালি পড়েছে নিচে। বলল, 'প্রথম কারণ, আমার বাড়ি এই পারে না। ওই পারে।'

***

নদীর ওপাড় মানেই কেরানীগঞ্জ। সেখানকার একটা হোটেলে ছেলেটার উল্টো দিকে বসে আছি আমি। ছেলেটা—যে তার নাম বলেছে রুকু—গোগ্রাসে গিলছে মোগলাই পরোটা। আমি চায়ে চুমুক দিচ্ছি।

আমার সব সময়ের সঙ্গী মোটরবাইকটা সঙ্গেই ছিল, হাসপাতালের পার্কিংয়ে। সেটায় চড়ে বুড়িগঙ্গার ওপরে সদ্য নির্মিত বাবুবাজার ব্রিজ পেরিয়ে কেরানীগঞ্জ চলে এসেছি রুকুকে পেছনে বসিয়ে। ছেলেটার খিদে লেগেছে, সেটা শুকিয়ে যাওয়া মুখ দেখলেই বোঝা যায়, তাই ওকে চটজলদি কিছু খাওয়ানোর ব্যবস্থা।

রুকুর সঙ্গে টুকটাক কিছু কথা হয়েছে আমার। নিজের পরিচয় দিয়েছি, আইডি কার্ডও দেখিয়েছি; না হলে সে অপরিচিত কারও মোটরবাইকে চড়বে কেন? বয়সের তুলনায় পরিপক্ক ছেলেটার বুঝতে বিলম্ব হয়নি যে আমি ওকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি।

খাওয়া প্রায় শেষ রুকুর। ঢকঢক করে পানি খেল এক গ্লাস। আমি কিছু বলছি না, জানি সময় হলে নিজেই মুখ খুলবে সে।

হলোও তা-ই। মুখ মুছে রুকু বলল, 'শিপলু ভাইয়া, ঘাটের মাঝির দোষ ছিল না। সে ঠিকই ধরেছে, আমি বাড়ি ফিরতে চাইছি না। এটাকে বাড়ি থেকে পালানো বলা যেতে পারে।'

বেশ গোছানো কথাবার্তা। আমি কোনো মন্তব্য না করে সহানুভূতি মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

'আমরা এদিকে নতুন। আমাদের গ্রামের বাড়ি বরিশাল, বাবার চাকরিসূত্রে ঢাকায় থাকি। একটা সরকারি ব্যাংকে চাকরি করেন বাবা। আমার জন্ম ঢাকার মিরপুরে, ছোটবেলা থেকে সেখানেই মানুষ। কিছুদিন আগে বাবার বদলি হয় কেরানীগঞ্জের শাখায়। সপরিবার এখানে চলে আসি আমরা। নতুন একটা বাসায় উঠি...'

বলতে বলতে বুজে গেল রুকুর কণ্ঠ। চেহারা ফ্যাকাশে। কাঁপা হাতে পানি খেল আরেক গ্লাস।

'তোমার সমস্যাটা নিশ্চয়ই নতুন বাসাসংক্রান্ত?' নরম কণ্ঠে বললাম আমি।

মাথা ওপর-নিচ করল রুকু। 'কিন্তু...আমার কথা বিশ্বাস হবে না আপনার। ভাববেন, বাসায় না ফেরার জন্য বানিয়ে বলছি।'

'তোমাকে তো বলেইছি, রুকু, বাস্তবের বাইরের জগতের সঙ্গে আমার কারবার। তুমি নিশ্চিন্তে বলতে পারো।' চায়ের কাপটা শেষ করে নামিয়ে রাখলাম আমি।

রুকু যা বলল, সেটা ওর জবানিতেই তুলে দিচ্ছি।

***

নতুন এলাকায় এসেছি দিন সাতেক হয়েছে। সত্যি বলতে কি, ভীষণ মন খারাপ ছিল আসার সময়।

শুধু যে মিরপুরের বাসা আর পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে আসতে হয়েছে, তা নয়; সেখানকার স্কুল আর বন্ধুদেরও ছেড়ে এসেছি আমি। বাবা-মা অবশ্য অনেক সান্ত্বনা দিয়েছেন, 'সরকারি চাকরিটাই এমন রে! দেশের এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ানো। তা-ও তো আমরা ঢাকাতেই আছি, হোক শহরের বাইরে। এখানেও ভালো স্কুল আছে। দেখিস, নতুন বন্ধু হয়ে যেতে সময় লাগবে না। আর এখানকার পরিবেশ খোলামেলা, খেলাধুলা করতে পারবি অনেক।'

আপনি তো কেরানীগঞ্জের এদিকটা চেনেনই, শিপলু ভাইয়া, আপনাকে আর কী বলব। বুড়িগঙ্গার তীরটা ঘিঞ্জি, কিন্তু সেটা ছাড়িয়ে এলেই শহরের কোলাহল দূরে হারিয়ে যায়। ঘিঞ্জি কেরানীগঞ্জের শেষ মাথায় আমাদের নতুন ভাড়া বাড়িটা, এরপরই ছোট ছোট বাড়িঘর, বাগান, খেলার মাঠ, একটা-দুটো খেত। প্রচুর জমি পতিত, সেগুলোতে গাছপালা আর বাঁশঝাড়। স্কুল থেকে ফিরে মাঠে চলে যাই খেলতে, নাহয় একা একা ঘুরে বেড়াই এদিক-সেদিক।

ভালো লাগেনি যে জিনিসটা, সেটা আমাদের নতুন বাড়ি।

আমাদের কাছে নতুন হলেও বাড়িটা আসলে বেশ পুরোনো। চুন-সুরকির বাড়ি, নির্ঘাত ব্রিটিশ আমলের। বাবাও তেমনটা বললেন। গাছপালার আড়ালে লুকানো বাড়িটার উঠানে দিনের বেলায়ও রোদ পড়ে না। টালির ছাদ। গায়ের পলেস্তারা এখানে-ওখানে খসে পড়েছে।

মা মৃদু আপত্তি করেছিলেন, এমন পুরোনো বাড়ি কেন ভাড়া করতে গেলেন বাবা! পাশের বাসার একজন এসে ইতিমধ্যেই আকার-ইঙ্গিতে বলেছে, বাসাটায় কী যেন সমস্যা, কেউ বেশি দিন থাকতে পারে না। তবু সবাই চনমনে। আসল কারণটা কিন্তু আমি জানি, ওনারা আমার সামনে না বললেও মিরপুরের ফ্ল্যাটবাড়ির কোলাহলে হাঁপিয়ে গিয়েছিলেন ওনারা আসলে। এখানে একটু খোলামেলা পেয়ে বাবা-মায়ের মুখেও চাপা হাসি, আর আমার ছোট ভাই রিংকু তো ছোটাছুটি করে কূল পাচ্ছিল না, আনন্দে আটখানা। আমার বড় বোন রুনা আপু এসএসসি পাস করে বড়দের দলে যোগ দেওয়ার পর বেশ গম্ভীর হয়ে গেছে, কথাটথা অত বলে না, কিন্তু ওরও যে পছন্দ হয়েছে, সেটা মুচকি হাসিতেই পরিষ্কার।

কিন্তু প্রথম দিনই তলকুঠুরিটা দেখে ফেলার পরে আমার আর ভালো লাগেনি বাড়িটাকে।

মিরপুর থেকে সব গুছিয়ে নিয়ে ট্রাকে করে এখানকার বাসায় আসতে আসতে সন্ধ্যা গড়িয়েছে সেদিন। সপ্তাহখানেক আগের কথা বলছি। নতুন বাসায় জিনিসপত্র গোছগাছ করা হচ্ছে, মা-বাবা আর কুলি-মজুরদের হাঁকডাকে বাড়ি সরগরম, আর আমি এই ফাঁকে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম এদিক-ওদিক। আমার একটা ছোট বুকশেলফ আছে, তিন গোয়েন্দা আর ফেলুদার বইয়ে ভর্তি, সেটা কোথায় রাখব, সেটাই খুঁজছিলাম। পছন্দসই জায়গা মিলছিল না। রান্নাঘরের পাশের দরজাটা ভাঁড়ার ঘর ভেবে এড়িয়ে যাচ্ছিলাম, কী মনে হতে হাত বাড়িয়ে ঠেলা দিলাম পাল্লায়। দেখি, এক সারি সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে হারিয়ে গেছে অন্ধকারে।

তলকুঠুরি! বেজমেন্ট! চনমনিয়ে উঠলাম আমি। মাটির নিচের এই ঘর বাংলাদেশে কমই দেখা যায়। বাইরের দেশের বেশির ভাগ বাসার নিচেই অবশ্য থাকে এই জিনিস, বাড়তি জিনিস রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়—বইয়ে পড়েছি। এখানে কী রেখেছে? এই বাড়ি বানিয়েছে যে ব্রিটিশ, সে কী রাখত?

হাতড়ে দেখলাম, কোনো লাইটের সুইচ দেখা যাচ্ছে না। দ্বিধা করলাম একমুহূর্ত। নিচে কি যাব? যাওয়া উচিত?

এসব কঠিন ভাবনা নিয়ে বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করলাম না অবশ্য। যেসব মালপত্র খোলা হয়েছে, ভাগ্যক্রমে সেগুলোর মধ্যে পাওয়া গেল আমাদের টর্চটা। সেটা নিয়ে আবার তলকুঠুরির দরজায় হাজির হতে সময় লাগল না।

টর্চের আলোয় দেখলাম, সিঁড়ির ধাপ নিচে নামছে তো নামছেই। মেঝে দেখা যাচ্ছে না।

কখন সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়েছি, আর কখন এক এক ধাপ করে নামতে শুরু করেছি, নিজেও জানি না। দরজাটা নিজে থেকে বন্ধ হয়ে গেছে পেছনে, যেন একটা অদৃশ্য হাত বুজিয়ে দিয়েছে পাল্লা, সেটাও যেন খেয়াল করলাম না। ভেতরে অসম্ভব নিস্তব্ধতা, যেন বাইরের জগতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। নিজের পায়ের শব্দ নিজের কানেই বড় বেশি হয়ে বাজছে।

কতগুলো ধাপ নেমেছিলাম, খেয়াল নেই। সংবিৎ ফিরল ঠান্ডায়। হাত-পা যেন জমে যাচ্ছে। চুন-সুরকির নয়, পাথরের দেয়াল এখন আমার চারপাশে। স্যাঁতসেঁতে, ভেজা। নিশ্চয়ই মাটির অনেকটা নিচে আমি এখন।

ফিরে যাওয়া দরকার, মনের ভেতরে বলে উঠল কে যেন। ফেরার জন্য ঘুরতামও হয়তো, কিন্তু সিঁড়ি শেষ হয়ে গেছে সামনে। একটা অন্ধকার ঘরের ফোকর হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমাকে।

ঘরটা ছোট। একটা বাথরুমের চেয়ে সামান্য বড় হবে। ফাঁকা, কিছুই নেই। দেয়ালের পাথরে বেশ কয়েকটা ফোকর ছাড়া দেখার আর কিছু নেই। এই ঘর কেনই-বা বানানো হয়েছে, মাটির এত নিচে কেন, সেটা নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবতে হলো না। মেঝের ধুলোমাটিতে কী যেন একটা চকচক করে উঠেছে। ঝুঁকে দেখি, বোতলের ভাঙা কাচ। এডগার অ্যালান পোর 'আমান্টিলেডোর পিপে' গল্প মনে পড়ে গেল। এটা আসলে ছিল ওয়াইন সেলার, পানীয়র বোতল ঠান্ডা রাখতে ব্যবহার করা হতো।

হুট করে কী যেন হলো, জানি না শিপলু ভাইয়া—একটা অজানা আতঙ্ক প্রাণপণে গ্রাস করতে শুরু করল আমাকে। কোনো শব্দ পাইনি, কোনো ছায়াও দেখিনি... তবু কেন ও রকম পাগল হয়ে গেলাম ভয়ে, জানি না। মনে হলো, পুরো ঘরটা যেন একটা জীবন্ত প্রাণী, সব কটি দেয়ালে যেন সারি সারি চোখ, আমার দিকে তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ চোখে। কুটিল হাসি হাসছে, আমাকে বাগে পাওয়ার হাসি। এই যে, এখনই গ্রাস করবে আমাকে চিরদিনের মতো।

পা যেন গেঁথে গেছে মাটিতে, তবু কোনোমতে ছুটতে শুরু করলাম সিঁড়ি বেয়ে ওপরে।

পথ যেন শেষই হয় না। একসময় হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাইরে, দরজা ঠেলে। হাঁপাতে শুরু করেছি, কপালে ঘাম ফুটেছে। বাবা-মা দেখে ফেললে নির্ঘাত বকা খাব, তাই তলকুঠুরির সিঁড়ির দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিয়ে কেবল টর্চটা পকেটে পুরেছি, দেখি মা কয়েকটা চিনামাটির পাত্র হাতে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছেন। আমাকে দেখে ভুরু কুঁচকে ফেললেন তিনি।

'রুকু! কোথায় গেছিলি? হাঁটতে? ঘেমে তো শেষ হয়ে গেছিস। তা বাইরে যাবি ভালো কথা, আমাদের

বলবি তো? ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল, কোনো সাড়া নেই। রাত হয়ে গেছে।'

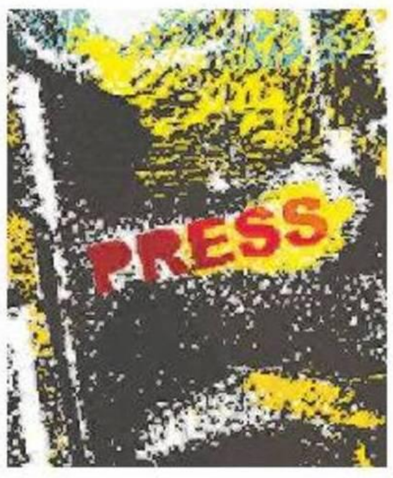
আবার রান্নাঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করেছেন বলে আমার চেহারার বিস্ময়টা দেখতে পেলেন না মা। কী বললেন, ঘণ্টাখানেক পার হয়েছে? মানে কী?

এটাই যদি সবচেয়ে ভয়ের ঘটনা হতো, তাহলে আমি বাড়ি থেকে পালাতাম না, শিপলু ভাইয়া। আমি দ্বিতীয়বারের মতো আতঙ্কে জমে গেছি মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে।

চেহারা আমার মায়ের মতো, কথার ভঙ্গিও, শাড়িটাও। কিন্তু কিছুই পুরোপুরি মিলছে না। আমার মায়ের চেহারাটা যেন নকল করার চেষ্টা করেছে কেউ, কিন্তু পুরোপুরি পারেনি। মেকি একটা পুতুলের মতো মানুষের দিকে তাকিয়ে আছি আমি, যে আমার মা নয়, হতেই পারে না। আর ওই চোখ, ওই জ্বলজ্বলে আগুনের মতো চোখ!

আতঙ্কে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলাম ওই ঘর থেকে। আরেকটু হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়তাম বাবার ওপর। তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে যাব মায়ের মতো দেখতে জিনিসটার ব্যাপারে, কিন্তু বলতে পারলাম না একটা শব্দও। কারণ, বাবার চেহারার দিকে চোখ পড়েছে তখন আমার।

বাবার মতো দেখতে খানিকটা, কিন্তু ওটা বাবা নয়। কাপড়ের দোকানে সাজিয়ে রাখা পুতুলের যেমন একটা মেকি চেহারা হয়, প্লাস্টিকের ছাঁচে ঢেলে বানানো, তেমন দেখাচ্ছে ওনাকে। কেউ যেন মোম ঢেলে বানিয়েছে চেহারাটা। আর সেই গনগনে আগুনের মতো চোখ! রক্ত হিম করে দেওয়া।



'কোথায় গেছিলে, রুকু?' আমার বাবার চেহারার আশি ভাগ নকল করতে পারা জিনিসটা বলল। 'তলকুঠুরিতে? যাও যাও, আবার যাও। খুব সুন্দর জায়গা না?'

দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে বাড়ি থেকে ছুটে বেরোনোর সময় বারান্দার দোলনায় চোখ পড়ল। রুনা আপু আর ছোট ভাই রিংকু বসে আছে। দোল খাচ্ছে না—যেন দুটো পুতুল বসে আছে। চেহারাও সে রকমই, পুতুলের মতো, মেকি। খালি চোখজোড়া বাদে।

ছুটতে ছুটতে হয়তো ঢাকা শহরেই চলে আসতাম, কিন্তু উঠোন পেরিয়ে বেরোনোর আগেই কার সঙ্গে যেন বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম। কোনোমতে সামলে নিলাম। লোকটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি, জিনিসপত্র সাজানোয় সাহায্য করা মজদুরদের একজন। আমাদের সঙ্গে ট্রাকে করে এসেছে।

'কী হইছে বাবু?' লোকটা অবাক হয়ে বলল। 'দৌড়াইতেছ কেন আচানক?'

'এই রুকু? কী হলো?' পেছন থেকে একটা উদ্বেগমাখা চেনা স্বর ভেসে এল।

ঘুরে দেখি, বাবা-মা, রুনা আপু আর রিংকু বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আরেকবার ছোটার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, কিন্তু ততক্ষণে তাদের চেহারার দিকে নজর পড়েছে আমার। কোথায় সেই হাড়হিম করা অশুভ কৃত্রিম আদল, কোথায় সেই জ্বলন্ত চোখ! আমার চিরচেনা পরিবার দাঁড়িয়ে আছে, চিন্তিত।

সেদিন কোনোমতে সামাল দিয়েছিলাম পরিস্থিতি। বাসার ভেতরে বেশ ভয় ভয় করছিল, কিন্তু ভাগ্যিস আর কোনো উল্টোপাল্টা ঘটনা ঘটেনি। রাতটা কেটে গেছিল নির্বিঘ্নে।

পরের সকালটা স্বাভাবিক। আমি কিন্তু প্রচুর মাথা ঘামিয়েছি সেদিন, কী দেখেছি তা নিয়ে। ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্তে এসেছিলাম, পুরো জিনিসটাই চোখের ধাঁধা। তলকুঠুরিতে ওঠানামা করার ক্লান্তিতেই বোধ হয়, ভুলভাল দেখেছি আমি।

পরের দিনটা ভালোই কাটল। বাসার আশপাশে ঘুরে দেখলাম, নতুন স্কুলে ভর্তি হয়ে এলাম বাবার সঙ্গে, জিনিসপত্র গোছানোয় সাহায্য করলাম। রুনা আপুর সঙ্গে সাপলুডু খেললাম। সবকিছু স্বাভাবিক—সেদিন রাতের আগপর্যন্ত।

নতুন ঘরে শুয়েছি। একা ঘরে একাই একটা বিছানায়। রুনা আপুর ঘর আলাদা, আর রিংকু এখনো বাবা-মায়ের সঙ্গে ঘুমায়। একটা বই শেষ করে শুধু মশারি খাটিয়েছি, তখন কানে এল ডাকটা। মা ডাকছেন আবছা গলায়।

পরের দিন নতুন স্কুলে প্রথম ক্লাস। ভাবলাম, সেটা নিয়েই হয়তো কিছু বলবেন। 'আসছি' বলে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

> 'রুকু, আমার প্লিজ আমার কথা শোনো। এখন ওই তলকুঠুরিতে ঢুকব আমরা। আমি অনেক দেখেছি এসব—আমি জেনেশুনে বিপদের মাঝে ঢুকব না।' গলাটা যতটা সম্ভব শান্ত রেখে বললাম আমি

আবার কানে এল ডাকটা। 'রুকু...রুকু...' এবার ডাকছেন বাবা।

এগিয়ে গেলাম শব্দটার দিকে। কয়েক পা এগিয়ে থমকে গেলাম। ততক্ষণে খেয়াল করেছি, ডাকটা আসছে তলকুঠুরির দিক থেকে।

কোনো ভুল নেই। তলকুঠুরির দরজা বন্ধ, সেটার আড়াল থেকে এবার শোনা যাচ্ছে রুনা আপুর গলা, 'রুকু...নেমে আয় নিচে...'

'ভাইয়া...' ডাকছে রিংকুও। আমার পুরো পরিবার তলকুঠুরিতে!

এক পা এক পা করে পিছিয়ে এলাম। কোনোমতে কাঁপা গলায় বললাম, 'তোমরা আসল নও। তোমরা আসল নও—চুপ করো!'

'কী বলছিস, রুকু? ঘুমাসনি এখনো?' বিরক্ত একটা কণ্ঠ ভেসে এল। ঘুরে দেখি, রুনা আপু। ওর ঘর থেকে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাবা-মায়ের ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি, দরজা বন্ধ। ফ্যান চলার শব্দ আসছে। ঘুমিয়ে পড়েছেন ওনারা। তলকুঠুরিতে সবাই মিলে নেমে আমাকে ডাকার প্রশ্নই আসে না।

***

'সেদিন থেকে এমন ঘটনা ঘটছেই প্রতিদিন। আমার কথা কেউই বিশ্বাস করছে না, হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে। বেশি বলারও সাহস পাচ্ছি না, কারণ ওনারা হয়তো ধরে নেবেন আমার মাথায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিন্তু ওই অভিশপ্ত বাড়িতে টিকতে পারছি না, শিপলু ভাইয়া। প্রতিদিন রাতেই অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে ওখানে, অবশ্য দিনের বেলা সব ঠিকঠাক। আরও আশ্চর্য ব্যাপার কি জানেন—রাতে স্বপ্নের মধ্যে তলকুঠুরিটা ডাকছে আমাকে। বলছে, কোনো ভয় নেই। আয়, আমার ভেতরে এসে ঢোক। কী ভয়ংকর, চিন্তা করতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। প্রতিটা রাতেই ওই স্বপ্ন!...আমার পক্ষে ওখানে থাকা সম্ভব নয়। অশুভ কোনো অস্তিত্ব আছে ওই তলকুঠুরিতে, আমি নিশ্চিত। ওটাই সব নষ্টের গোড়া।...কী করব বুঝতে না পেরে ফেরিঘাটে এসে নৌকায় বসে ছিলাম। আমার এক দূরসম্পর্কের খালা পুরান ঢাকায় থাকেন, আর কোনো আত্মীয় নেই। খালু এদিকেই কোথাও চাকরি করেন। ওনার দেখা পাওয়ার আশাতেই বসে ছিলাম নৌকায়। বাকিটা তো আপনি দেখলেনই।'

আমার মোটরসাইকেলের পেছনে বসে বলছে রুকু। মোটরসাইকেল চালাচ্ছি আমি ধীরে, এগোচ্ছি রুকুদের বাসার দিকে। সূর্য দিগন্তে বিলীন, পশ্চিম আকাশে আবিরের ছটা। সন্ধ্যা নামছে।

রুকু প্রথমে যেতেই চাচ্ছিল না ওর বাসার দিকে। আমি বাধ্য হয়ে জোরাজুরি করছিলাম। বুঝতে পারছি অলৌকিক কিছু ঘটছে ওখানে, কিন্তু পুরো ব্যাপারটা তলিয়ে না দেখলে কিছু বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আর তা ছাড়া সবার আগে ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার। ওর বাবা-মার প্রসঙ্গেই শেষমেশ রাজি হয়েছে সে। নিজে তো পালিয়ে এসেছে, কিন্তু ওর পরিবার কী করছে সেই ভয়ংকর বাড়িতে? তাদের ভালোর জন্যই আমার সঙ্গে রওনা হয়েছে রুকু।

একটা বাজার পেরিয়ে আসতেই পাতলা হতে শুরু করল বাড়িঘর। এক-দুটো ফাঁকা মাঠ আর খেত দেখা যাচ্ছে। গাছপালার ঘনত্ব বেড়েছে। রুকু আঙুল তুলে দেখাল কোন দিকে যেতে হবে। চারপাশে অনেকটা ফাঁকা জায়গা, তার মাঝখানে গাছের আড়ালে প্রায় লুকোনো একটা চুন-সুরকির পুরোনো বাড়ি। সেদিকে মোটরসাইকেল ঘোরালাম আমি।

'লাইট জ্বলছে ভেতরে,' বাড়ির লোহার গেটের সামনে ব্রেক কষতে কষতে বললাম আমি। চুপ করে রয়েছি এখন দুজনেই। অস্বাভাবিক রকম নিস্তব্ধ এদিকটা। আশ্চর্য, বেশ অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দ শুনে কেউ বেরোয়নি বাইরে।

'আ-আমাদের কি ভেতরে যাওয়া উচিত?' কাঁপা গলায় বলল রুকু। এটুকু বলতেই যে কী পরিমাণ সাহসের দরকার হয়েছে ওর, সেটা আঁচ করতে পারছি।

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা করতে হবে সাবধানে।' মোটরবাইকটা এক পাশে পার্ক করে রাখতে রাখতে বললাম আমি। 'বিদঘুটে কিছু দেখলেই বেরিয়ে আসব।'

ঠেলা দিতেই খুলে গেল লোহার গেটটা। প্রাচীরঘেরা গাছে-ছাওয়া উঠানের কোনায় কোনায় জমাট অন্ধকার। অবশ্য বাড়িটাকে দেখে খুব অশুভ কিছু মনে হচ্ছে না আমার কাছে। বারান্দার বাতি জ্বলছে, সবকিছু স্বাভাবিক।

রুকু শক্ত করে আমার একটা কবজি ধরে আছে। ওর দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দেওয়ার চেষ্টা করলাম। জানি না কতটুকু আশ্বস্ত করতে পারলাম ওকে।

'বাড়িটা না নেওয়ার ব্যাপারে প্রতিবেশীরা সাবধান করেছিল, বলেছিলে না?' রুকুকে জিজ্ঞেস করলাম আমি। আসলে কথায় ব্যস্ত রাখতে চাইছি ওকে।

'আমি ঠিকমতো শুনিনি, কেবল দু-একটা কথা মনে আছে। প্রথম যে সাহেব এই বাড়িটা করেছিলেন, তিনি এখানেই মারা যান—কিন্তু সেটা সম্ভবত বয়সের কারণে, রিটায়ার করেছিলেন আগেই। পরে স্থানীয় একজনের কাছে বিক্রি হয়ে যায়। তার পর থেকে কেউই আর বেশি দিন থাকতে পারেনি এখানে, কিন্তু কেন থাকতে পারেনি সেটা কেউ জানে না। বেশির ভাগ সময় খালিই পড়ে ছিল বাড়িটা। এলাকার মানুষও ভাসা-ভাসা জানে, বেশি না।' রুকু বলল।

আমরা বারান্দায় উঠে এসেছি। রুকু কোনোমতে ডাকল দুবার, 'বাবা! মা! রুনা আপু!'

কেউ বেরিয়ে এল না বাইরে।

'মনে হয়—' বলতে শুরু করেছিলাম কেবল, কিন্তু তার আগেই আবছা আওয়াজটা কানে এসেছে আমার। কে যেন ডাকছে। বাড়ির অনেক ভেতর থেকে আসছে কণ্ঠটা, প্রায় শোনা যায় কি যায় না।

আমি কিছু বলার আগেই রুকু প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, 'মা! কোথায় তোমরা?'

সব চুপচাপ। তারপর, আবার শোনা গেল মৃদু কণ্ঠ, 'বাবা রুকু...'

'রুকু, ওনারা বাইরে আসছেন না কেন?' একটা সন্দেহ ঢুকতে শুরু করেছে আমার মনের ভেতর।

আমার কথা খেয়ালই করল না রুকু। 'কোথায় তোমরা?' বলে চেঁচিয়ে উঠে দরজা পেরিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে শুরু করল সে।

আমি হাত বাড়ানোর সময়ও পেলাম না। বসার ঘরে ঢুকে পড়েছে রুকু, এদিক-ওদিক চাইছে ডাকতে ডাকতে। বাধ্য হয়ে পিছু নিলাম আমি।

'রুকু...এদিকে এসো তো বাবা চট করে...' এবার শোনা গেল একটা পুরুষকণ্ঠ। রুকুর বাবাই হবেন। অবাক কাণ্ড, এই কণ্ঠটা আসছে নারীকণ্ঠের ঠিক বিপরীত দিক থেকে। এবারে চট করে সেদিকে ঘুরল রুকু। 'বাবা! কোথায় তোমরা? বেরিয়ে এসো না!'

আরেকটা নারীকণ্ঠ এবার আরেক দিক থেকে বলল, 'রুকু....আমার ঘরে আয় তো একটু...অঙ্ক বুঝিয়ে দিই...'

'রুনা আপু! দেখো, কাকে এনেছি সঙ্গে করে। এই বাড়িটা ভালো না আপু...বেজমেন্টটায় কোনো একটা সমস্যা আছে। আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না, শিপলু ভাইয়া পারবে। কই...' বলতে বলতে নতুন কণ্ঠটার দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করল রুকু।

এবারে খপ করে ওর একটা হাত চেপে ধরলাম আমি।

রুকুর চোখে অপার বিস্ময়। 'কী হলো ভাইয়া? হাত ছাড়ুন। সারা দিন বাসায় ছিলাম না, সবাই চিন্তা করছে।'

'চলো। বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের এখনই।' চাপা গলায় বললাম আমি।

'কী বলছেন আপনি, ভাইয়া? আমার পরিবারের সবাই বাড়ি আছেন...চলুন, তাদের সঙ্গে কথা বলি আগে।'

আমাকে কোনো উত্তর দিতে হলো না। কড়াৎ করে কান ফাটানো একটা শব্দ হলো—বাড়িটার সব দরজা-জানালার পাল্লা একসঙ্গে বন্ধ হয়ে গেছে। জিনিসটা বুঝতেই যতক্ষণ। সব কটা বাতি নিভে গিয়ে বাড়িটা

কালিগোলা অন্ধকারে ডুবে গেল।

একটা শিশুকণ্ঠের খিলখিলে হাসি যেন ভেঙে খানখান করে দিল সেই জমাট অন্ধকার। চারপাশের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে হাসিটা, যেন এক হাজার বাচ্চা ঘিরে ধরেছে আমাদের।

'র-রিংকু! ওভাবে হাসছিস কেন—' প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা রুকুর।

'ওটা রিংকু নয়। ওরা কেউই তোমার পরিবারের নয়।' রুকুর পরিবারের বাকিদের কী হয়েছে, সেটা ভাবতে চাইছি না আমি। এখন নিজেদের বাঁচানোর সময়। 'এদিকে এসো, রুকু।'

'দরজাটা কোন দিকে?'

'দরজা দিয়ে বেরোতে পারব না হাজার চেষ্টা করলেও। সময় নষ্ট হবে কেবল।' আমার পকেটে একটা ছোট টর্চ থাকে সব সময়, সেটা বের করে জ্বাললাম আমি। 'ওটা কোন দিকে, রুকু?'

'কো-কোনটা?'

'তলকুঠুরিটা।' নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছি আমি। প্রতিটা মুহূর্ত এখন দামি। বেশি দেরি করলে আমরাও ওদের মতো হয়ে যাব। পুতুলমুখো, আঁধারে লুকিয়ে ডাকতে থাকা কোনো অশরীরী অস্তিত্ব।

'শিপলু ভাইয়া! কী বলছেন আপনি! ওই তলকুঠুরি—ওই বেজমেন্টই তো সবকিছুর মূলে। ওটার খোঁজ করছেন কেন?' রুকুর চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া।

কোনো কিছু বোঝানোর সময় নেই। 'আমার ওপরে বিশ্বাস রাখো, রুকু।' ওর কবজি এক হাতে আর অন্য হাতে টর্চটা ধরে এদিক-ওদিক ক্ষীণ রশ্মি ফেলছি আমি। ধকধক করছে বুকটা। এখনই 'ওদের' কেউ হাজির হতে পারে সামনে।

ওই যে, ডাইনিংয়ের দরজা ওটা নিশ্চয়ই। রুকু কিছু বলার আগেই ওকে নিয়ে এগোলাম সেদিকে। ডাইনিং পেরিয়ে আধখোলা একটা দরজা, রান্নাঘরের, আর সেটা পেরিয়ে আরেকটা সরু বন্ধ দরজা।

তলকুঠুরিটা!

'রুকু, আমার প্লিজ আমার কথা শোনো। এখন ওই তলকুঠুরিতে ঢুকব আমরা। আমি অনেক দেখেছি এসব—আমি জেনেশুনে বিপদের মাঝে ঢুকব না।' গলাটা যতটা সম্ভব শান্ত রেখে বললাম আমি।

ভাগ্যিস, একমুহূর্ত চুপ থেকে মাথা ওপর নিচ করল রুকু। ওর মন চাইছে না কোনোভাবেই, কিন্তু ওর মগজ বলছে আমাকে বিশ্বাস করতে। ওর সবচেয়ে বড় আতঙ্ক ওই তলকুঠুরিতে ওকে নিয়ে যাচ্ছি আমি, সেটাও মেনে নিচ্ছে ও, কারণটা না জেনেই।

ঠেলা দিতেই অনায়াসে খুলে গেল দরজাটা। হু হু করে একঝলক ঠান্ডা হাওয়া বয়ে গেল আমাদের ওপর দিয়ে। সিঁড়িটা ঠিক তেমনই যেমনটা রুকু বলেছিল। ধাপে ধাপে কত নিচে নেমে গেছে কে জানে। শেষ মাথায় অন্ধকার।

নামতে শুরু করলাম আমরা। প্রথমে আমি, পেছন পেছন রুকু। দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হওয়ার শব্দ পেলাম। হোক।

নামার গতি বাড়িয়ে দিয়েছি আমরা। সিঁড়ি যেন শেষই হয় না। দেয়ালটা এখন পাথরের, স্যাঁতসেঁতে, পানি চুইয়ে পড়ছে কোথাও কোথাও। এই জুন মাসেও হাড়হিম করা শীত এখানে।

সিঁড়িটা শেষ হয়েছে অবশেষে। ছোট একটা ঘরে হাজির হয়েছি আমরা। এই সেই সেলার, তলকুঠুরি। দিব্যি স্বাভাবিক লাগছে জায়গাটা, কোনো মানুষের চেহারা নকল করা প্রাণী ঘাপটি মেরে নেই এখানে।

'এবারে আমরা কী করব, শিপলু ভাইয়া?' রুকু চোখ মুছে প্রশ্ন করল।

'আমাদের রাতটা এখানে কাটাতে হবে, রুকু। তোমার কাহিনি শুনে বুঝেছি, অশুভ ঘটনাগুলো এই বাড়িতে শুধু রাতেই ঘটে। সকালে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারব আমরা।'

'কিন্তু এই তলকুঠুরিটাই তো সব নষ্টের মূল! এখানে আমি প্রথমবার নামার পরই তো সব গড়বড় হয়ে গেল। স্বপ্নেও আমাকে ডাকে এটা!' রুকু প্রতিবাদ করল জোর গলায়।

'তুমি বুঝতে পারছ না, রুকু, বাড়িটাই অভিশপ্ত, তলকুঠুরিটা নয়!' বলে উঠলাম আমি। 'প্রথমবার তুমি যখন নেমেছ এখানে, তখন ঠিক সন্ধ্যা। বাড়িটাতে অশুভ কী আছে, জানি না, কিন্তু তোমার বাড়ির বাকি সবাই সেটার শিকার হয়েছে তখনই। তুমি এই বাড়ির একমাত্র নিরাপদ জায়গা, এই তলকুঠুরিতে ছিলে দেখে বেঁচে গেছ। তোমার বাবা-মা, ভাই-বোনের চেহারা ধারণ করা জিনিসগুলো দিনের বেলা মানুষের মতোই থাকে, রাত হলেই ফিরে আসে নিজের চেহারায়। বাড়িটাই ওদেরকে দিয়ে এসব করায়।'

থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রুকু। পুরো ব্যাপারটা এবার ঢুকতে শুরু করেছে ওর মাথায়।

আমার রুমালটা এক কোনায় বিছিয়ে দিলাম আমি। 'বসে পড়ো, রুকু। রাতটা কোনোমতে কাটাতে হবে।'

নিঃশব্দে আমার কথামতো কাজ করল রুকু। আমি আরেকখানে ধুলা ঝেড়েঝুড়ে বসে পড়লাম দেয়ালে হেলান দিয়ে। টর্চটা নিভিয়ে দিলাম ব্যাটারি বাঁচাতে। জমাট নিস্তব্ধতা চারদিকে, যেন এই ঘরের বাইরে বাকি পৃথিবীর কোনো অস্তিত্ব নেই।

কতক্ষণ পেরিয়েছে জানি না। একটু ঝিমুনির মতো এসেছিল মনে হয়। আমার রেডিয়াম লাগানো হাতঘড়িটা চোখের সামনে মেলে ধরলাম। সকাল সাতটা! কীভাবে এত দ্রুত কেটে গেল সময়!

মাটির এত নিচে সেই একই রকম আঁধার। টর্চটা জ্বেলে দেখি, কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমাচ্ছে রুকু। আমি ডাকতেই চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসল।

'চলো, রুকু। সকাল হয়ে গেছে। আর ভয় নেই।' বললাম আমি।

সত্যিই তাই। ওপরে উঠে এলাম যখন, আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। বাড়িটা দিব্যি স্বাভাবিক, ভয় লাগছে না একটুও। কোথাও কেউ নেই, এটাই কেবল খটকা লাগে।

রুকুর চোখ ছলছল করছে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার বাড়ির সবার কী হয়েছে, শিপলু ভাইয়া?'

সেটার উত্তর আমিও জানি না। 'চলো, রুকু। তোমার ওই খালার বাড়ি খুঁজে বের করতে হবে এখন। চিন্তা কোরো না, তোমার বাড়ির সবাইকে ওদের খপ্পর থেকে মুক্ত করব আমি। আজই আবার ফিরব এখানে।'

এগিয়ে চললাম আমি। পেছনে পড়ে রইল অজানা শক্তির আধার বাড়িটা, আর তার একমাত্র নিরাপদ জায়গা সেই পাতালপুরী তলকুঠুরি।

অলংকরণ : **তনি সুভংকর**

গল্প

আমাদের অদ্ভুত ফ্যামিলি

আদনান মুকিত



বললে হয়তো বিশ্বাস করবা না, কিন্তু আমাদের বাসায় আমি ছাড়া কোনো নরমাল মানুষ নাই। একদম ১০০ পার্সেন্ট সত্যি কথা। এই বাসার সবাই অদ্ভুত। মাঝেমধ্যে তো আমাদের বাসার নিচের কুকুরটাকেও নরমাল মনে হয় না। এই কুকুর জিলাপি খায়। বাংলাদেশে এ রকম কোনো কুকুর আর আছে কি না, কে জানে।

আমাদের বাসার মানুষ যে অদ্ভুত, এটা তোমাদের কীভাবে বোঝাই? ধরো আমার আম্মা—সারা দিন থাকে অফিসে। বাসায় এসে কোথায় রেস্ট নেবে, নাহ। ঢুকেই একসঙ্গে একগাদা কথা বলতে শুরু করে, 'কিরে, দরজার সামনে স্যান্ডেল ওলটানো ক্যান, বিপদ হয় জানিস না?' আমাদের সঙ্গে যে সারা দিন তার দেখা নাই, তা কি একবারও আম্মা ভাবে? ভাবে না। বরং দরজা আটকেই সে পুরো ঘরের দিকে ৩৬০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তাকায়। মনে হয় মানুষ না, রোবটের মতো পুরো ঘরটা স্ক্যান করছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পুরো ঘরটা স্ক্যান করে ফেলে আম্মা। তারপর...ডায়ালগ শুরু: 'আয়হায় হায় হায়, কী করে রাখসে ঘরটা। সর্বনাশ! কিরে, ডাইনিংয়ে ফ্যান চলে ক্যান? শুধু শুধু ফ্যান চলতেসে, না জানি কত ঘণ্টা চলসে ফ্যানটা! বন্ধ কর ফ্যান!'

আমি তাড়াতাড়ি ফ্যানের সুইচ অফ করি। কিন্তু আম্মার ডায়ালগ থামে না—

'ঘরটা বালু বালু লাগতেসে! জুতা নিয়ে ঘরে হাঁটসে নিশ্চিত! আয়হায় হায় হায়! সকালে ঘরটা পরিষ্কার করে গেলাম, এরা কিচ্ছু রাখে নাই!'

আম্মা ডাইনিংয়ের চেয়ারে ব্যাগটা রেখে ছোটে ঝাড়ু আনতে। সাধারণত এই সময়েই তার চোখ পড়ে ডাইনিং টেবিলের দিকে।

'ভাত খেয়ে টেবিলটা একটু মুছতে পারিস না? পিঁপড়া ধরে গেসে! ইশ! কী অবস্থা করসে টেবিলটার! তোরা কি টেবিলে ভাত ফেলে খাস? প্লেটে খাইলে এত ভাত পড়ে কী করে?'

আম্মা টেবিল মোছার ন্যাকড়া পানিতে ভিজিয়ে টেবিল মোছা শুরু করে।

'দেখসো, করসেটা কী? নিচেও ভাত ফেলসে! আয়হায় হায় হায়, এরা কবে শিখবে? এদের যন্ত্রণায় আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল! এরা মাটিতে ভাত ফেলে! কী করব আমি এদের নিয়ে?' এই সময়ে আম্মা ঝাড়ু নিয়ে টেবিলের নিচে অযথাই ঝাড়ু দেয়।

'আমার আর ভাল্লাগে না! সারা দিন খাটাখাটনি করে ঘরে এসেও এক ফোঁটা শান্তি নাই। আমার কপালে আছে খালি যন্ত্রণা।'

অনেক সময় মাটিতে বসে টেবিলের নিচে ঝাড়ু দেয় আম্মা। প্রায়ই তাড়াহুড়া করে ওঠার সময় ধাম করে টেবিলের কোনায় মাথাটা বাড়ি খায় তার।

'ওমা! ইশ! কী জোরে বাড়ি খাইসি রে! আল্লাহ, মাথাটা শেষ আমার।'

'আম্মা, ব্যথা পাইসো?' তাড়াতাড়ি বলি আমি।

'যা, সর আমার সামনে থেকে!' চেয়ারে বসে খেঁকিয়ে উঠবে আম্মা। টেবিলে রাখা গ্লাসে পানি ঢেলে ঢকঢক করে পানি খাবে। খটাস করে গ্লাসটা রাখবে টেবিলে। অফিস থেকে এসেই ঝাড়ুটারু দিয়ে দরদর করে ঘামছে আম্মা। ওড়না দিয়ে কপাল মুছে হঠাৎ আমার দিকে কড়া দৃষ্টি দিয়ে বলবে—

'অফিস থেকে এসে মা গরমে বসে আছে, একবারও তোর কিছু মনে হলো না? গরমে ঘেমে আমি গোসল হয়ে গেলাম, তুই দাঁড়িয়ে পেয়ারা খাচ্ছিস?'

আমি মাত্রই পেয়ারায় একটা কামড় বসিয়েছি। পেয়ারা চিবানো বন্ধ করলাম। আম্মা তিন গুণ জোরে চেঁচিয়ে বলবে,

'ফ্যান ছাড় শয়তান!' তাড়াতাড়ি ফ্যানের সুইচ অন করি আমি।

ফ্যানটা ফুলস্পিডে ঘুরতেই ঝাড়ু দিয়ে জড়ো করে রাখা ধুলাগুলো এদিক ছড়িয়ে যাবে। সেটা টের পেয়েই আম্মা রীতিমতো গর্জে উঠবে—

'দেখসো, ফুল স্পিডে ফ্যানটা ছাড়সে। যেন আবার আমাকে কষ্ট করে ঝাড়ু দিতে হয়। শয়তানের শয়তান!'

'তুমিই তো বললা ফ্যান ছাড়তে!' অবাক হয়ে বললাম আমি।

'যা সর আমার সামনে থেকে।'

গজগজ করতে করতে নিজের ঘরে চলে যাব আমি। ঠিক এক ঘণ্টা পর আম্মাই গোসলটোসল করে এসে নরম গলায় বলবে—

'কিরে, খিদে লাগে নাই? নুডলস রান্না করছি। খেয়ে চুপচাপ পড়তে বসবি।'

মানে, কী বলব। আমি মেলাতেই পারি না। মাসের ৩০ দিনের মধ্যে অন্তত ১৫ দিন এ রকম ঘটনা ঘটে।

আমার আব্বা আসে আরেকটু পর। আব্বা আবার আম্মার ঠিক উল্টো। ঘরে ঢুকেই দেয় চিৎকার, 'কই রে, বাবুরা কই?'

'চিৎকার কোরো না। ওরা পড়তে বসেছে।' কড়া গলায় বলে ওঠে আম্মা। 'তোমার আশকারা পেয়ে এরা সিলিংয়ে উঠে যাচ্ছে।'

'ভালো তো।' জুতা খুলতে খুলতে বলে আব্বা। 'সিলিংয়ে ওঠা ভালো। সিলিংয়ের ঝুল জমেছে, ওদের দিয়েই পরিষ্কার করা যাবে।'

'ফালতু কথা আমার সামনে একদম বলবা না। আর খবরদার, হাতমুখ না ধুয়ে টিভির সামনে বসবা না বলে দিলাম।'

'ঠিক আছে। ঠিক আছে।' বলেই আব্বা টিভির সামনে বসে খবর দেখা শুরু করবে। ঠিক পাঁচ মিনিট পর (আমি স্টপওয়াচ ধরে দেখেছি) আম্মা এসে কড়া গলায় বলবে, 'আয়হায় হায় হায়, তোমাকে না বললাম, এসেই টিভি না দেখতে? এটা কী অভ্যাস? আশ্চর্য! আমি কোথায় যাব এই লোককে নিয়ে?'

'আরে, আমি টিভি দেখছি না তো।' বোঝানোর চেষ্টা করে বলবে আব্বা।

'টিভি অন করে মোবাইলে ভিডিও দেখতেসো?'

'এই একটু দেখলাম আরকি, আর দেখব না।' বলেই আব্বা টিভিটা অফ করে দেবে।

'ওমা, টিভি অফ করলা ক্যান? আমি এখন সিরিয়াল দেখব না? অন করে যাও।'

'ধুর, বাসায় এসে একটা দিন শান্তি পাই না।' বিরক্ত হয়ে বলবে আব্বা। তারপর মোবাইলে ভিডিও দেখতে দেখতে বাথরুমের দিকে যেতে গিয়ে ডাইনিংয়ের চেয়ারের সঙ্গে হোঁচট খাবে। ফোনটা টেবিলে রেখে বাথরুমে গিয়ে আব্বা গুনগুন করে কী যেন একটা গান গায়। আমি আজ পর্যন্ত ধরতে পারি নাই গানটা কী। এটা কি বাংলা গান না হিন্দি, সেটাও বুঝি না। আন্দাজ করতে পারি যে এটা একটা গান। গানের মাঝখানে আব্বা চিৎকার করে ভেতর থেকে বলবে, 'এই দেখো, তাড়াহুড়ায় গামছাটা আনতে ভুলে গেছি। এ বাবু, গামছাটা দিয়ে যা তো।'

আর আমার ভাইয়ার কথা কী বলব? বাসার সবচেয়ে অদ্ভুত মানুষ হচ্ছে ভাইয়া। ভার্সিটিতে পড়ে। কিন্তু আমি ওকে আমি কখনো পড়ত দেখি না। ফোন নিয়ে কী সব ভিডিও বানিয়ে ফেসবুক আর ইউটিউবে আপলোড করে। সেই ভিডিও দেখে তিনজন—আমার আব্বা-আম্মা আর ভাইয়া। আমাকে অনেকবার দেখার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আমি এই সব দেখি না। এ জন্য মাঝেমধ্যেই ভাইয়া আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ রাখে। কিন্তু যখন আম্মার সঙ্গে ঝগড়া হয়, তখন মেসেঞ্জারে আমাকে মেসেজ দিয়ে বলে, 'আম্মাকে বলে দে, আমি ভাত খাব না। আমাকে যেন না ডাকে।'

এখন তোমরাই বলো, আমি ছাড়া এ বাসায় কোনো নরমাল মানুষ আছে?

২

কোন এক ভিডিও দেখে আব্বা নতুন নিয়ম করেছে—নয়টার মধ্যে সবাই রাতের খাবার খেয়ে ফেলবে। এটা নাকি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। খাবার খাওয়ার দুই ঘণ্টা পর ঘুমাতে যেতে হবে। এর কোনো নড়চড় হবে না। সমস্যা হলো, আব্বা নিজেই বাসায় আসতে আসতে নয়টা বাজিয়ে দেয়। তারপর আমি পড়তে থাকি। আর বাকি তিনজন টিভি, কম্পিউটার ও মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকে। আমি যে একটা মানুষ এ বাসায় আছি, কারও মাথায়ই থাকে না। এগারোটা-বারোটা বেজে গেলে যখন তাদের ফোনের চার্জ কিংবা টিভির সিরিয়াল শেষ হয়ে যায়, তখন মনে পড়ে, ভাত খাওয়ার কথা। আব্বা বলে, 'সেকি, এত বেজে গেছে? নাহ, ডিসিপ্লিন বলে এ বাসায় কিছু নাই।'

'আয়হায় হায় হায়...এখনো ভাত রান্না বাকি... আজকেও দেরি হয়ে গেল। সকালে আবার আমার অফিস! কী যে হবে!'

আম্মা ছোটে ভাত রান্না করতে। আব্বা ফ্রিজ থেকে শসা, টমেটো, গাজর কেটে সালাদ বানানো শুরু করে। ইউটিউব দেখে এসব নতুন শিখেছে সে। শুক্র-শনিবারে নানা রকম রেসিপি রান্না করে। সেগুলো আমরা কেউ খেতে পারি না। একদিন আমাদের বুয়া খুব আগ্রহে আব্বার রান্না করা চিকেন স্টু বাসায় নিয়ে গিয়েছিল। এর পর থেকে বুয়া আর কাজে আসে না। আমার ধারণা, সে এই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে।

রাতের খাবার খেতে খেতে আমাদের দেরি হয়ে যায়। খাওয়া শেষে আমি ঘরে চলে আসি। হালকা ভলিউমে গান

ছেড়ে অঙ্ক করতে বসি। আমি যেন সারা রাত মোবাইল না ধরি, সে জন্য আম্মা আমার মোবাইল নিয়ে যায়। আব্বার কড়া নির্দেশ, স্ক্রিনটাইম কমাতে হবে। বেশিক্ষণ মোবাইল স্ক্রল করলে নাকি ব্রেন ফ্রিজ হয়ে যায়। আমি একবার জিজ্ঞেস করেছি, 'আব্বা, তুমি এ তথ্যটা কোথায় পেয়েছ?'

'কেন? একটা রিলসে দেখলাম।' আব্বার সরল উত্তর।

আমার কাছ থেকে মোবাইল নিয়ে আব্বা-আম্মা নিজেরা কিন্তু বিকট ভলিউমে ভিডিও দেখবে। তোমরা নিশ্চয়ই অনেক সময় ভাবো, ফেসবুকের ভিডিওগুলোর নিচে অপ্রাসঙ্গিক কমেন্টগুলো কারা করে? এই যে উত্তর। কমেন্ট করে আমার আব্বা আর আম্মার মতো মানুষ। আমার আম্মা মুকেশ আম্বানির ইনস্টাগ্রামের পোস্টে গিয়ে ভুলভাল ইংরেজিতে লিখে এসেছে—'কত মানুষ না খেয়ে আছে আর আপনারা ছেলের বিয়েতে এত টাকা এভাবে খরচ করলেন? এটাই কি মানবতা?'

কিন্তু আজকে হঠাৎ আমার ডাক পড়ল। আমি ঘর থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আব্বা বলল, 'বারান্দায় চল।'

আব্বার পেছন পেছন বারান্দায় গেলাম আমি। আমাদের বারান্দাটা বেশ বড়। বারান্দায় গ্রিলের একটা অংশে ছোট একটা দরজার মতো করা আছে। সামনে স্টিল দিয়ে গাছের টব রাখার একটা স্ট্যান্ড করা আছে। সেখানে টবে বেশ কিছু গাছ। আব্বা দরজাটা খুলে রেখেছে। তার উদ্দেশ্য এখনো বুঝতে পারছি না।

'আব্বা, করো কী!' অবাক হয়ে বললাম আমি।

'টবে মিষ্টিকুমড়ার চাষ করব।' টবের মাটি নাড়াচাড়া করতে করতে বলল আব্বা। 'একটা মিষ্টিকুমড়ার দাম চল্লিশ টাকা। চিন্তা করা যায়?'

আব্বার কথা শুনে মনে হলো, এখন বীজ লাগালে কাল সকালেই গাছ থেকে মিষ্টিকুমড়া হয়ে যাবে।

'এই টবে মিষ্টিকুমড়া হবে?'

'অবশ্যই হবে। জহির তো বারান্দার টবে মিষ্টিকুমড়া চাষ করে এখন স্বাবলম্বী।'

'জহিরটা কে?'

'কৃষিভিত্তিক ভিডিও বানায় ইউটিউবে। ২৫ কে ফলোয়ার। তোরা তো এসব জ্ঞানী লোককে চিনবি না।'

'কাজটা কাল সকালে করলে হয় না? এখন রাত একটা বাজে। আমার মনে হয় এটা মিষ্টিকুমড়া চাষের জন্য আদর্শ সময় না।'

'আরে বোকা মেয়ে, যে কাজ এখন করা যায়, এটা কালকের জন্য ফেলে রাখার দরকার নেই। ধর।'

বড়সড় একটা টব আমার হাতে ধরিয়ে দিল আব্বা।

'নিতেই পারতেসি না!' বিরক্ত হয়ে বললাম আমি।

'কী বললি?' ঘুরে তাকাল আব্বা।

'না, টবটা আরকি, বেশ ভারী!'

বারান্দার এক কোনা থেকে মাটির একটা ব্যাগ টেনে আনল আব্বা। টবে মাটি ফেলতে ফেলতে বলল, 'মাত্রই ভিডিওটা দেখলাম তো, সঙ্গে সঙ্গে করে না ফেললে পরে ভুলে যাব।' হাঁপাচ্ছে আব্বা। 'আর...ধর...সব জিনিসপত্র তো আছেই। বীজ মনে কর...আগেই...কিনে রেখেছিলাম...নারে, কাজটা কঠিন আছে তো!'

'আম্মাকে ডাকি?'

'তোর আম্মা তো কী একটা আজগুবি ভিডিও দেখছে। কোন এক মেয়ে...লাইভে কম দামি জামা...বেশি দামে বিক্রি করছে। সেটা...এক্সপোজ করেছে আরেক মেয়ে... এখন ওই মেয়েটা...মানে যে কম দামি জামা বেশি দামে বিক্রি করে সে...'

'আব্বা, প্লিজ। আমি আর শুনতে চাচ্ছি না। কী করতে হবে বলো।'

'দাঁড়া না, এত অস্থির হচ্ছিস কেন? তোদের এই জেন-আলফাদের ধৈর্য এত কম...ধৈর্য ছিল আমাদের। তিন কিলোমিটার হেঁটে যেতাম স্কুলে। জীবন এত সোজা?'

রাত দেড়টার সময় আব্বা ভিডিও দেখে দেখে মিষ্টিকুমড়ার বীজতলা তৈরি করছে। ভিডিওতে বরিশালের ভাষায় এক লোক স্যারের কাছে পড়া বলার মতো শুরু করে বলছে, 'ভিউয়ার্স, এরপর আপনাদের যা করতে অইবে, তা দেখার জন্য পরিপূর্ণ ভিডিও অবলোকন করুন।' আর আমি ঘুমে ঢুলছি। পৃথিবীর কোনো কিছু অবলোকন করার ইচ্ছা আমার নেই। বারান্দায় বাতাস নেই। গরমে আব্বাও ক্লান্ত হয়ে গেছে। তারও শখ মিটে গেছে বোধ হয়। মাটি ভরা টবে বীজ বুনে সেটাকে স্ট্যান্ডে রাখার জন্য ঠেলছে আব্বা। মাঝপথে গিয়ে টবটা বোধ হয় আটকে গেল। বিরক্ত হয়ে জোরে ধাক্কা দিল আব্বা। আর তখনই কীভাবে যেন টবটা আটতলা থেকে নিচে পড়ে গেল।

আব্বা 'হায় হায়' বলার সঙ্গে সঙ্গে টিনের চালে বিকট শব্দে পড়ল টবটা। আমাদের বিল্ডিংয়ের পেছনেই টিনের শেড। দারোয়ান চাচার ঘর ওটা। টবটা ওখানেই পড়েছে। কিন্তু এত শব্দ হওয়ার তো কথা না। আমি আর আব্বা নিচে উঁকি দিলাম। আশপাশের বাসাগুলোতে আলো জ্বলছে। আম্মাও বারান্দায় ছুটে এসেছে। আমাদের দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'আমার মিষ্টিকুমড়ার...'

'আব্বা থামো তো।' বললাম আমি। 'টব পড়ে গেছে নিচে। টিনের ওপর পড়েছে।'

ঠিক তখন, নিচ থেকে কারা যেন চিৎকার করে বলল, 'মারা গেছে! মানুষ মারা গেছে! সবাই নামেন, মানুষ মারা গেছে!'

'আয়হায় হায় হায়! কী সর্বনাশ!' ফিসফিস করে বলল আম্মা! 'তোমার টব কার না কার মাথায় পড়েছে। মরে গেছে লোকটা! এটা কী করলা তুমি? আল্লাহ, এই লোকটা আমাকে আর কত বিপদে যে ফেলবে...' আম্মা কাঁদতে শুরু করল।

'কিন্তু এখানে লোক এল কোত্থেকে?' চিন্তিত হয়ে বলল আব্বা।

'তোমরা এখান থেকে সরে যাও। এখানে দাঁড়ানো ঠিক হবে না।' পেছন থেকে এসে বলল ভাইয়া।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস।' আম্মা সমর্থন দিল ভাইয়াকে।

'কী যে তোমরা বলো!' বললাম আমি। 'আগে তো নিচে গিয়ে দেখবে কী হয়েছে। ভাইয়া, তুমি চলো তো আমার সঙ্গে।'

'এক চড় দিয়ে তোকে বারান্দা থেকে ফেলে দেব।' আম্মা মুখ বাঁকিয়ে বলল। 'চুপচাপ ঘরে যা। সাহস দেখাতে আসছে। যা, সর এখান থেকে।'

নিচের হইচই আরও বাড়ল। কেউ বোধ হয় টর্চের আলো ফেলছে নিচ থেকে। আব্বা উঁকি দিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'চোর পড়ছে মনে হয়। চুরি করতে উঠছিল, টিনের ওপরে পড়ছে।'

'ধরেন ওকে। পুলিশ ডাকেন। এই, ট্রিপল নাইনে কল দে...।'

'আমি নিচে গেলাম' বলে ফোন আর গিম্বল হাতে ছুটল ভাইয়া। আব্বা-আম্মাও গেল পেছন পেছন। আমি আর থেকে কী করব? আমিও বেরোলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দেখলাম আরও অনেকেই নামছে। সবার মধ্যে একটা উত্তেজনা—চোর ধরা পড়েছে! নিচে নেমে দেখলাম, চোরকে ধরাধরি করে

নামানো হয়েছে। মাথা ফাটেনি, কিন্তু ভালো ব্যথা পেয়েছে লোকটা। পা ভেঙেছে মনে হয়। নড়াচড়া করতে পারছে না। এর মধ্যেই কয়েকজন এসে তাকে কিল-ঘুষি দেওয়ার চেষ্টা করছে। আম্মা সবাইকে থামাল। 'খবরদার, গায়ে হাত দেবেন না কেউ। পুলিশ এসে যা করার করবে।'

এর মধ্যে ভাইয়া ভিডিও করতে শুরু করেছে তার চ্যানেলের জন্য—'হ্যালো গাইজ, তোমাদের জন্য একটা এক্সাইটিং নিউজ নিয়ে এসেছি। আমাদের বাসায়... একেবারে আমাদের নিজের বাসায় একটা চোর ধরা পড়েছে, লাইভ দেখতে পাচ্ছ চোরটাকে...এই সেই চোর...' বলে সে লোকটার মুখের সামনে ক্যামেরা ধরল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ধরা পড়লেন কীভাবে?'

চোরটা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলল, 'পাইপ বাইয়া উঠতাছিলাম। দুই তলা পর্যন্ত উঠছি। আতকা কী জানি একটা আইসা ঘাড়ের ওপরে পড়ল। তাল হারাইয়া নিচে পইড়া গেলাম।'

'টব পড়েছে।' আব্বা গর্বের সঙ্গে বলল। 'আমার বাসার টব। মিষ্টিকুমড়া গাছের টব।'

আশপাশ থেকে লোকজন খুব বাহবা দিতে লাগল। 'আরে ভাই, আপনার টবের কারণে আমরা চুরির হাত থেকে বাঁচলাম। কত বড় উপকার করলেন ভাই...'

আম্মা হঠাৎ আবেগপ্রবণ হয়ে বলল, 'আপনি ঠিক আছেন তো ভাই?'

'হ, বাঁইচা আছি। তবে অপমান লাগতেছে।'

'তা তো একটু লাগবেই।'

'দুই তলা থেকেই পইড়া ধরা খাইছি, এটা শুনলে মানুষ কী কইব? আমি তো সমাজে মুখ দেখাইতে পারমু না। আমারে নিয়া হাসাহাসি হবে। আবার এই ভাইয়ে করছে ভিডিও। আমি তো ভাইরাল হইয়া যামু। চুরি করতে সমস্যা হইব পরে।'

'আপনি এর পরও চুরি ছাড়বেন না?'

'এই কাম ক্যামনে ছাড়ি?' শুনে লোকজন আবার মারতে উঠল লোকটাকে। আমি ভয়ে শেষ। চোর হলেও তাকে তো মারার অধিকার নেই আমাদের। আব্বা-আম্মাই সবাইকে থামাল। এর মধ্যেই শুরু হলো ঝুম বৃষ্টি। চোর দেখতে যারা এসেছিল, তারা সবাই যে যার মতো ছুটল তাদের বিল্ডিংয়ে নিচে। আমিও আমাদের গ্যারেজে ঢুকলাম। সঙ্গে আম্মা আর ভাইয়া। আব্বা কই? সবাই যখন আব্বাকে খুঁজছি, তখন এক আঙ্কেল জানাল, 'তোমার আব্বা তো বাইরে। দেখো গিয়ে কী করছে।'

আমি গিয়ে দেখি, কোত্থেকে একটা ছাতা জোগাড় করে আব্বা ওই চোরটার মাথার ওপর ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আর কেউ কিন্তু নেই, আব্বাই দাঁড়িয়ে আছে। আব্বার অনেক কাজ আমার বিরক্ত লাগে, তবে এটা খুব ভালো লাগল। মুখে যা-ই বলুক, লোকটাকে চোর না, মানুষ হিসেবেই দেখছে আব্বা। আমি গেটের রড ধরে আব্বার দিকে তাকিয়ে ডাকলাম, 'আব্বাআআআ!' আব্বা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'পারলে একটা ছাতা নিয়ে আয়।'

'কেন?'

'ওই যে, আমার মিষ্টিকুমড়ার বীজগুলা...'

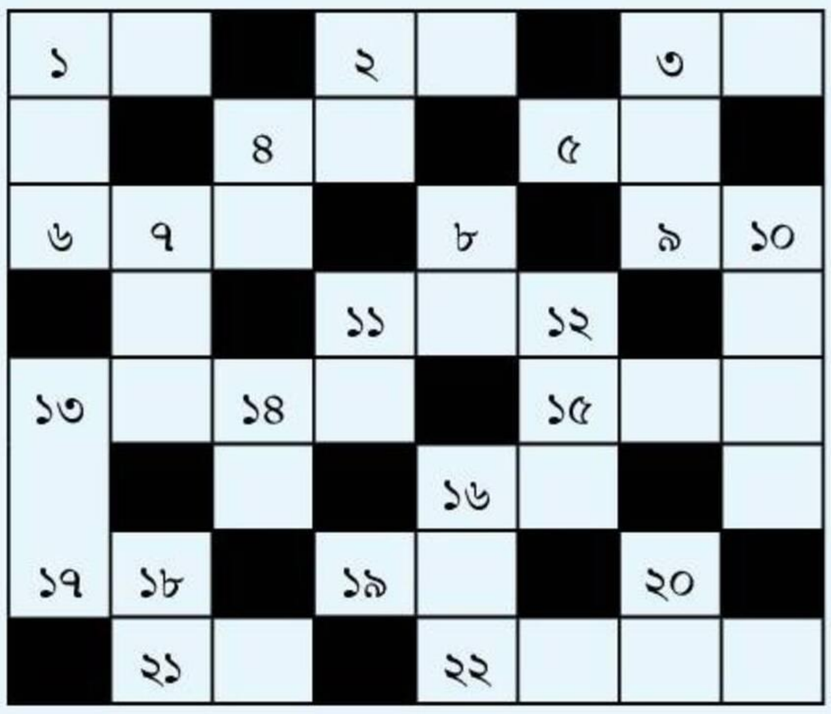
বললাম না, আমি ছাড়া আমাদের বাসায় একটাও নরমাল মানুষ নেই। এখন কি তোমাদের একটু বিশ্বাস হচ্ছে?

অলংকরণ : **রেহনুমা প্রসূন**

শব্দের খেলা

দইয়ান মাহমুদ তন্ময়

শব্দভেদ মেলানোর নিয়ম সহজ। বাঁ থেকে ডানে এবং ওপর থেকে নিচে দেওয়া থাকে সংখ্যা। সংখ্যা অনুযায়ী দেওয়া থাকে সংকেত। সে অনুযায়ী শব্দ খুঁজে ফাঁকা ঘরে বসালেই শব্দভেদ। তোমাদের জন্য



বাঁ থেকে ডানে

১. ভীতি, আতঙ্ক। ২. লেফাফা, চিঠিপত্রের আধার। ৩. পক্ক বা পরিণত হওয়া। ৪. বরিশাল বিভাগের একটি জেলা। ৫. রাস্তা বা সরণি। ৬. সমুদ্র। ৯. নির্যাস, দ্রববস্তু। ১১. বাংলাদেশের জাতীয় পাখি। ১৩. শিল্পী, মিস্ত্রি। ১৫. জমি চাষ করার যন্ত্র। ১৬. বাংলাদেশের সোনালি আঁশ। ১৭. পানি, বারি। ১৯. চকচকে কঠিন ও স্বচ্ছ ভঙ্গুর পদার্থ। ২১. দোষ বা অপরাধ মার্জনা। ২২. কোলাহল বা চেঁচামেচি।

ওপর থেকে নিচে

১. আস্থা, অবলম্বন। ২. মায়ের বোন। ৩. প্রস্তর, শিলা। ৪. উষা, প্রভাত। ৭. একজাতীয় গাছ ও তার কাঠ। ৮. কন্যা, দুহিতা। ১০. চালনা, নাড়াচাড়া। ১১. দ্বার, দুয়ার। ১২. কপাল, ভাগ্য। ১৩. লেখা, আঁকা বা মুদ্রণের উপকরণ। ১৪. ময়দার উৎস। ১৬. রাঁধুনি বা বাবুর্চি। ১৮. লাখ, খেয়াল। ২০. গৃহ, বাড়ি।

গত সংখ্যার সমাধান

ঘ	না	ঙ্ক	■	মা	■	ক	■
■	ম	■	কা	ঠ	বি	ড়া	লি
হু	তা	শ	ন	■	চ	■	পি
কু	■	ব্দ	■	দ	ক্ষ	তা	■
ম	ধু	■	ম	■	ণ	■	ভ
■	লা	ল	শা	ক	■	জ	য়
ভাঁ	■	হ	■	চি	ম	টি	■
জ	রি	মা	না	■	গ	ল	দ

জুলাই মাসের শব্দভেদ বিজয়ী

নিশাত

এইচএসসি পরীক্ষার্থী, হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা

'শব্দভেদ'-এর উত্তর মিলিয়ে পাঠাও editor@kishoralo.com—এই ঠিকানায়। বিজয়ীদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে একজন পাবে প্যাভিলিয়নের পক্ষ থেকে 'শব্দজব্দ' বোর্ডগেম।
উত্তর পাঠানোর শেষ সময় ২০ আগস্ট।

শব্দজব্দ

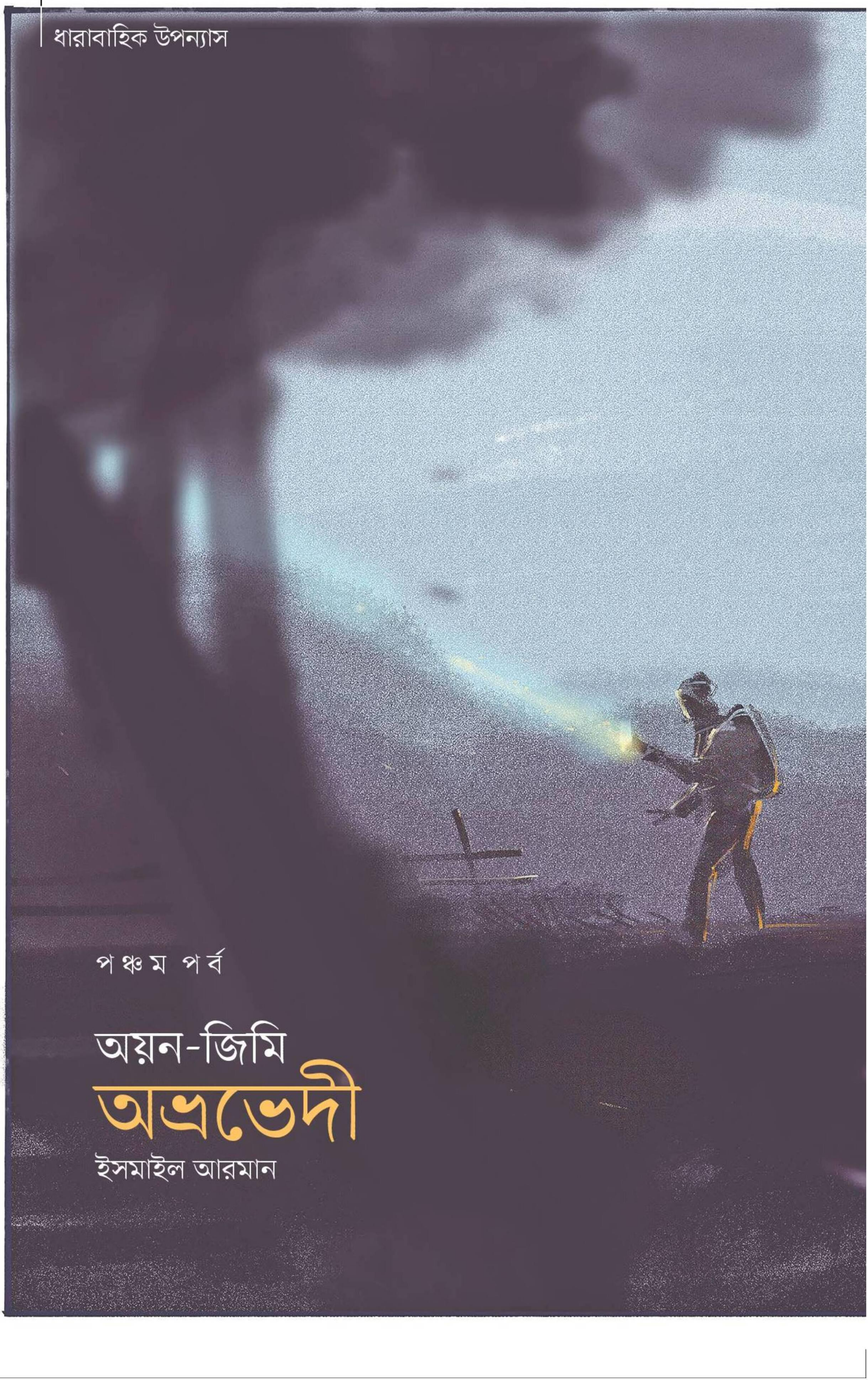
অর্ডার করতে ভিজিট করো—www.shobdojobdo.com

কিশোর আলোর গ্রাহকেরা শব্দজব্দ অর্ডার করলেই পাবে

বিশেষ ডিসকাউন্ট

৬ মাসের গ্রাহকদের জন্য প্রোমো কোড : KIA10
১২ মাসের গ্রাহকদের জন্য প্রোমো কোড : KIA15

ধারাবাহিক উপন্যাস



পঞ্চম পর্ব

অয়ন-জিমি

অভ্রভেদী

ইসমাইল আরমান

গত সংখ্যার পর...

নয়

ফেরার পথে অয়নকে গম্ভীর দেখাল, গভীরভাবে কী যেন চিন্তা করছে। জিমি ওকে গুঁতো দিয়ে বলল, 'কী ভাবছিস এত?'

'কয়েকটা বিষয়ে খটকা লাগছে,' বলল অয়ন। 'সেসবের কোনো ব্যাখ্যা আছে কি না, ভাবছি। আসলে... অভ্রভেদীর পুরো ব্যাপারটাই খটকায় ভরা।'

'অভ্রভেদী!' ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল রিয়া। 'সেটা আবার কী?'

'ক্লাউড পিয়ার্সারের বাংলা করলাম। মেঘ ভেদ করার ব্যাপার তো? বাংলায় এর সুন্দর প্রতিশব্দ হলো, অভ্রভেদী।'

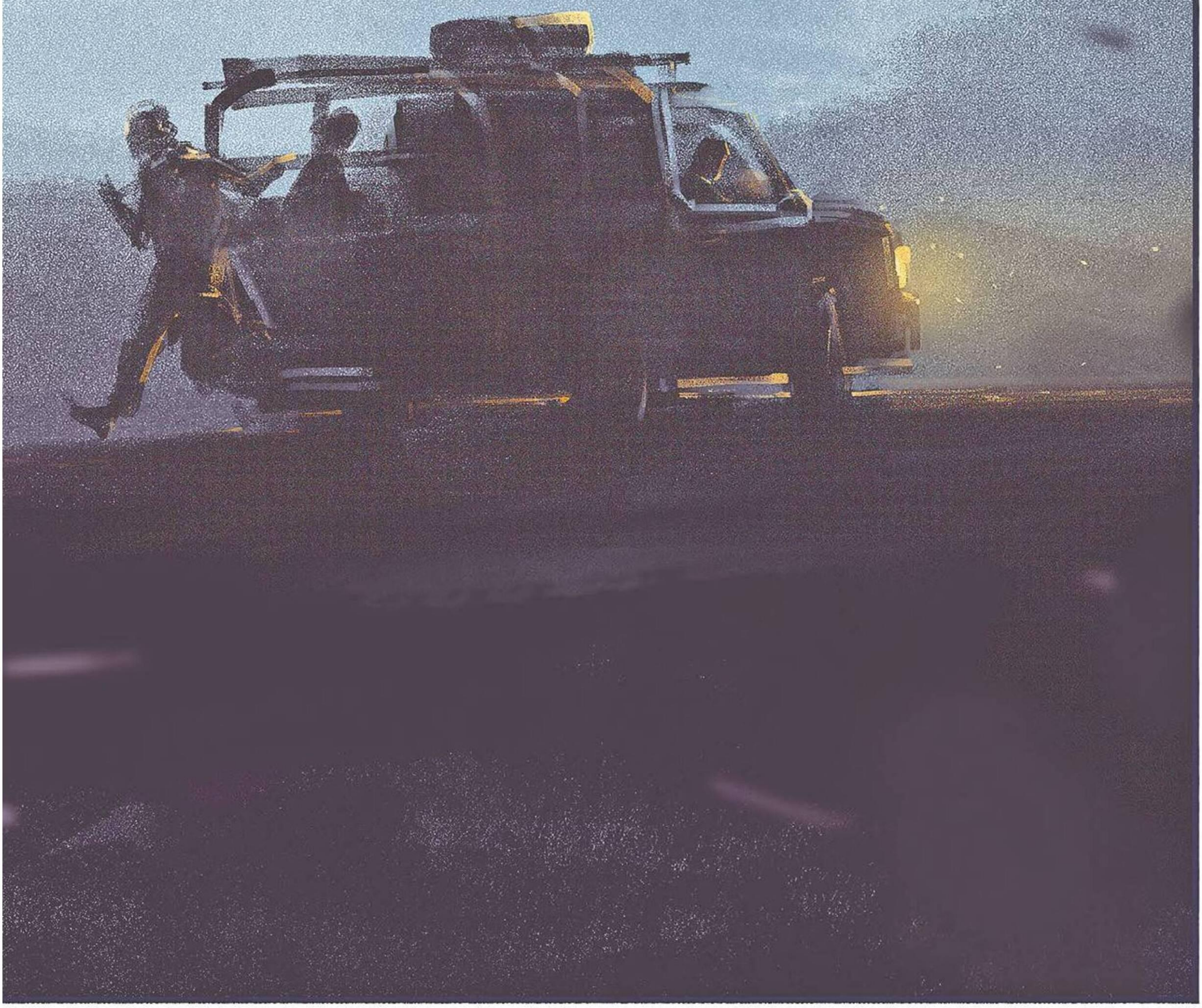
'চমৎকার তো! অন্তত ক্লাউড পিয়ার্সারের চেয়ে অনেক বেশি শ্রুতিমধুর।'

জিপের বাইরে চোখ বোলাল অয়ন, ডোনোভান ম্যানশনের পেরিমিটার ফেন্সের পাশ ঘেঁষে ছুটছে ওরা। পাবলোকে বলল, 'গাড়িটা একটু থামাবেন?'

'কেন?' পাবলোর চোখে বিস্ময়।

'থামান আগে, তারপর বলছি।'

রাস্তার পাশে জিপ থামাল পাবলো।



অয়ন তাকে বলল, 'টর্চলাইট আছে আপনার কাছে?'

মাথা ঝাঁকাল পাবলো। গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট খুলে একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ বের করে দিল। হাতে নিয়ে জিনিসটা পরীক্ষা করে নিল অয়ন। সুইচ টিপে দেখল, বেশ উজ্জ্বল আলো।

'পারফেক্ট!' বিড়বিড় করল ও, তারপর জিপ থেকে নামল।

'কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল পাবলো।

'বেড়ার ওপাশে,' আঙুল তুলে ফেন্সটা দেখাল অয়ন। 'জিমি, রিয়া...তোমরা যাবে আমার সঙ্গে?'

'অবশ্যই!' লাফ দিয়ে জিপ থেকে নামল জিমি ও রিয়া।

'আমি কী করব?' জানতে চাইল পাবলো।

'এখানেই অপেক্ষা করুন,' বলল অয়ন। 'আপনি আমাদের ব্যাকআপ। বিপদে পড়লে সাহায্য লাগতে পারে।'

'বিপদে তো পড়বেই,' থমথমে গলায় বলল পাবলো। 'অন্যের এলাকায় বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশ করছ। এটাকে বলে ট্রেসপাসিং। ধরে গুলি করে দিলেও কারও কিছু বলার থাকবে না।'

'খামোকা ভয় দেখাবেন না,' বলল রিয়া। 'এত সহজে কেউ কাউকে গুলি করে না।'

'কিন্তু ঘোড়ার ডিম, ওপাশে আছেটা কী?' পাবলোর কণ্ঠে বিরক্তি।

'রানওয়েটা দেখব,' বলল অয়ন। 'কোনো প্লেন ল্যান্ড করে থাকলে ওখানে টায়ারের তাজা দাগ থাকতে বাধ্য।'

'মানে! তুমি কি...' বলতে গিয়ে থমকে গেল পাবলো। চোখ বড় হয়ে গেল তার। 'ওহ্ নো! এ কথা বোলো না যে মি. ডোনোভানের ফাইটারটা...'

'এই এলাকার একমাত্র পি-ফিফটি ওয়ান মাসট্যাং,' শান্ত গলায় বলল অয়ন। 'সন্দেহ করাটা কি একদমই অবান্তর?'

'কিন্তু কেন?' পাবলোর কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'আমাদের ভয় দেখিয়ে কী লাভ মি. ডোনোভানের?'

'মোটিভটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে,' বলল অয়ন। 'আগে দেখে আসি, মনিব ও তার কর্মচারী আমাদের সঙ্গে কতটা সত্যি কথা বলেছে।'

'তোমরা পাগল হয়ে গেছ! ডোনোভানের ফাইটারের সঙ্গে ক্লাউড পিয়ার্সারের কোনো মিল নেই। ওটা পুরোনো, জংধরা...'

'ছদ্মবেশ পরানো হয়ে থাকতে পারে,' অয়ন অবিচল। 'আমাদের ওপর হামলা করার পর কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। নকল জং তুলে নেওয়ার জন্য সময়টা যথেষ্ট।'

'আমি বিশ্বাস করি না!' সবেগ মাথা নাড়ল পাবলো। 'এ অসম্ভব।'

'সেটা খুব শিগগিরই জানা যাবে।' দুই বন্ধুর দিকে তাকাল অয়ন। 'এসো।'

অসহায়ের মতো কাঁধ ঝাঁকাল পাবলো। বুঝতে পেরেছে, পাগলাটে এই তিন কিশোর-কিশোরীকে ঠেকাতে পারবে না। বলল, 'যা খুশি করো তোমরা।'

ফেন্সের দিকে এগিয়ে তিন বন্ধু। টর্চের আলো ফেলে বেড়াটা দেখল অয়ন। ৮ ফুট উঁচু ওটা। তার দিয়ে তৈরি খোপগুলোতে হাত-পায়ের আঙুল বাধিয়ে উঠে যাওয়া কোনো সমস্যা নয়, তবে ঝামেলা হবে ওপরে ওঠার পর। খোলা কাঁটাতার রয়েছে ওখানে।

'কাঁটাতারের ওপর জ্যাকেট বিছিয়ে দেব,' বলল অয়ন। 'তা হলে আর খোঁচা লাগবে না।'

মাথা ঝাঁকাল জিমি ও রিয়া। ঝটপট জুতা-মোজা খুলে ফেলল তিনজনে। কেডসগুলো ফিতায় বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে নিল, তারপর এগিয়ে গেল বেড়ার দিকে।

খোপে হাত রাখতে গিয়ে একটু ইতস্তত করল জিমি। 'ইলেকট্রিফায়েড নয়তো?' বিড়বিড় করল ও।

'দূর!' হেসে উঠল রিয়া। 'বেশি বেশি সিনেমা দেখলে এ-ই হয়। লোকের তো আর কাজ নেই, বেড়ায় কারেন্ট দিয়ে রাখবে! ওঠো বলছি! না হলে সরে দাঁড়াও, আমি উঠব। ভয় পেলে যাওয়ার দরকার নেই তোমার।'

আঁতে ঘা লাগল জিমির। খপ করে আঁকড়ে ধরল বেড়ার খোপ। না, সত্যিই কারেন্ট নেই। তরতর করে ফেন্স বেয়ে ওপরে উঠে গেল ও। কাঁটাতারের ওপর গায়ের জ্যাকেট মেলে এপাশ থেকে ওপাশে গেল, তারপর লাফ দিয়ে নামল মাটিতে। ওর পিছু পিছু রিয়া আর অয়নও চলে এল।

টর্চটা একবার জ্বেলে পথ দেখে নিল অয়ন, তারপর ঝোপঝাড় ভেঙে এগোতে শুরু করল ওরা। দূরে কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠল, তারপর সুনসান। শুধু ওদের চলার শব্দ ছাড়া আর কিছু কানে এল না। আজ পূর্ণিমা নয়, তারপরও চাঁদের আলো যথেষ্ট আছে। আশপাশে বড় বড় বেশ কিছু গাছ আছে, আর তার মাঝে ঘাসে ঢাকা উঁচু-নিচু জমিন। এখানে-সেখানে মাথা উঁচু করে আছে ছোট-বড় নানা আকারের ঝোপ।

মিনিট ১৫ পর এয়ারস্ট্রিপের দেখা পেল ওরা। নাক বরাবর সামনে, স্বাভাবিক লেভেল থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে লম্বা সমতল জমিন—রানওয়ে না হয়ে যায়ই না। আরও কয়েক মিনিট পর ঢালাই করা স্ট্রিপের ওপর উঠে এল তিন বন্ধু।

টর্চ জ্বালল অয়ন। বন্ধুদের বলল, 'আয়, একদিক থেকে হাঁটতে শুরু করি।'

কুকুরের ডাক আবার শোনা যাচ্ছে। এবার একটি নয়, দুটি। বিশেষ গুরুত্ব দিল না তিন বন্ধু। রানওয়ের ওপর আলো ফেলে হাঁটতে শুরু করল। চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

মিনিট পাঁচেক পর থামল ওরা। রানওয়ের ওপর একজোড়া চওড়া কালো দাগ। নিচু হয়ে একটা ছুঁয়ে দেখল অয়ন। হাত তুলে দেখল, আঙুলে কালো রঙের গুঁড়া লেগে আছে। পরমুহূর্তেই ওর মনোযোগ ছুটে গেল।

ভয়াবহ ঘেউ ঘেউ গর্জনে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল গোয়েন্দাদের। চোখ তুলে তাকাতেই দেখল, খানিক দূরে ঝোপঝাড় ভেঙে বেরিয়ে এসেছে দুটি চারপেয়ে ছায়ামূর্তি। এক লাফে পাকায় উঠল প্রাণী দুটি, তারপর ছুটে আসতে লাগল ওদের দিকে। টর্চের আলোয় চকচক করে উঠল দুজোড়া জ্বলন্ত চোখ আর ধারালো দাঁতের সারি। মুখ দিয়ে হিংস্র গর্জন বেরোচ্ছে।

'পাহারাদার কুকুর!' চেঁচিয়ে উঠল রিয়া।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল জিমি। অয়নের হাত ধরে টান দিয়ে বলল, 'পালা!'

ছুটতে শুরু করল তিন বন্ধু। পেছন পেছন তাড়া করে আসছে দুই মূর্তিমান আতঙ্ক, ধরতে পারলে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলবে। প্রাণের মায়ায় খিঁচে দৌড়াতে লাগল ওরা, প্রতি পদক্ষেপের পেছনে জীবনীশক্তি নিংড়ে দিচ্ছে।

জিমি ভালো দৌড়বিদ, রিয়াও কম যায় না। চোখের পলকে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল দুজনে। অয়ন পড়ে গেল পেছনে। দৌড়াদৌড়ি কোনোকালেই পছন্দ নয় ওর, ও শুধু মাথা খাটাতে পছন্দ করে। এখন মনে হচ্ছে বুঝি ভুল করেছে জীবনে। এখনই হিংস্র কুকুর দুটি ধরে ফেলবে ওকে।

‘জিমি!’ কোনোমতে ডাকল ও।

থমকে দাঁড়াল জিমি। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বন্ধুকে। রিয়াকে বলল, ‘তুমি এগোও। আমি ওকে নিয়ে আসছি।’

‘আমিও যাই,’ বলল রিয়া।

‘না, একজনই যথেষ্ট।’ সামনের একটা বড় গাছ দেখাল জিমি। ‘ওটায় গিয়ে ওঠো। অয়নকে গাছে তুলতেও সাহায্য লাগবে।’

মাথা ঝাঁকিয়ে ছুট লাগাল রিয়া। অয়নকে কাছে আসার সুযোগ দিল জিমি, এরপর ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল। চোখেমুখে ততক্ষণে অন্ধকার দেখছে অয়ন। টানতে টানতে ওকে গাছের কাছে নিয়ে গেল জিমি। রিয়া ততক্ষণে উঠে পড়েছে একটা ডালে।

‘ধরো ওকে,’ বলল জিমি। উঁচু করে ধরল অয়নের দুই হাত। নিচু হয়ে হাত দুটি ধরে ফেলল রিয়া, টানতে শুরু করল ওপর দিকে।

‘ফর গডস সেক, অয়ন! জলদি ওঠ্ গাছে!’ চেঁচাল জিমি।

এবার যেন সংবিৎ ফিরে পেল অয়ন। গাছের গায়ে পা ঠেকিয়ে ঝটপট উঠে গেল ডালটায়।

ততক্ষণে পৌঁছে গেছে কুকুর দুটি, কয়েক গজ দূর থেকেই ঝাঁপ দিল জিমিকে লক্ষ্য করে। লাফ দিয়ে একটা নিচু ডাল ধরে ফেলল জিমি, দুই পা ভাঁজ করে তুলে ফেলল শূন্যে। নিচে বাতাসে ব্যর্থ আঁচড় বসাল পশু দুটির নখর, শিকারকে মিস করে মাটিতে ধপ করে নামল।

সময় নষ্ট করল না জিমি, কাণ্ডে পা ঠেকিয়ে উঠে পড়ল গাছে। এডাল-সেডাল করে বেশ কিছুটা উঁচুতে পৌঁছে থামল। হাঁপাতে থাকল চওড়া একটা ডালে বসে। রিয়া আর অয়নও চলে এল ডালটাতে। সবার বুক হাপরের মতো ওঠানামা করছে, হাত-পা কাঁপছে। নিচে গাছের গায়ে ব্যর্থ হয়ে থাবা ঘষছে কুকুর দুটি, ওগুলোর গর্জনে কানে তালা লাগার জোগাড়।

‘বড় বাঁচা বেঁচে গেছি!’ হেঁচকির মতো শব্দ বেরোচ্ছে অয়নের মুখ দিয়ে। ‘আরেকটু হলেই...’

‘কত দিন থেকে বলছি, একটু দৌড়ঝাঁপ কর,’ বিরক্ত গলায় বলল জিমি। ‘আমার কথা তো শুনিস না।’

‘এখন থেকে শুনব,’ কথা দিল অয়ন। ‘বাপ রে বাপ, শিক্ষা হয়ে গেছে।’

‘কথা হলো,’ বলল রিয়া, ‘এখান থেকে আমরা নামব কেমন করে?’

‘দেখা যাক,’ বলল অয়ন। ‘কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আসবে কুকুর দুটিকে শান্ত করতে।’

‘কৈফিয়ত দিতে দিতে জান খারাপ হয়ে যাবে...’

জিমির কথা শেষ হলো না। দূরে ইঞ্জিনের ভারী শব্দ শোনা গেল। চোখ ফেরাতেই রানওয়ে ধরে একজোড়া হেডলাইট এগিয়ে আসতে দেখল ওরা। গাছের কাছাকাছি এসে থামল গাড়িটা। লাফ দিয়ে নামল একজন লোক, হাতের টর্চলাইট জ্বালল।

‘ড্যাশ, চেজ! শান্ত হও!’ কড়া গলায় কুকুর দুটিকে আদেশ দিল সে।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার থামাল দুই পাহারাদার, পায়ে পায়ে পিছিয়ে গেল। তবে নিচু স্বরে গরগর করতে থাকল।

এবার অয়নদের দিকে আলো ফেলল লোকটা। ওদের চিনতে পেরেই বলে উঠল, ‘তোমরা!’ গলায় নিখাদ বিস্ময়।

কণ্ঠস্বরেই মানুষটাকে চিনতে পেরেছে, এবার গালভরা একটা হাসি দিয়ে অয়ন বলল, ‘হ্যালো, মি. কুসাক!’

‘তোমরা এখানে কী করছ?’ বিস্মিত গলায় বলল কুসাক। ‘নামো...নিচে নেমে এসো।’

‘কামড়ে দেবে না তো?’ কুকুরগুলোর দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত গলায় বলল জিমি।

‘দেবে না,’ আশ্বস্ত করল কুসাক। ‘নামো।’

মাটিতে পা রেখেই রিয়া বলল, ‘বুক কাঁপিয়ে দিয়েছিল একেবারে।’

‘এখানে এলে কী করে?’ চোখ ছোট করে প্রশ্ন করল বিমানবিশেষজ্ঞ।

‘বেড়া টপকে,’ বলল অয়ন। ‘রানওয়েটা কেমন, তা-ই দেখতে এসেছিলাম।’

‘রানওয়ে দেখতে চাইলে তখনই বললে না কেন?’

‘মনে ছিল না,’ অয়ন নির্বিকার। ‘বেরিয়ে আসার পর মনে পড়ল। ভাবলাম, আপনাদের বারবার বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না। তাই বেড়া টপকে দেখতে এসেছি।’

‘পাবলো ভালডেজ কোথায়?’

কুসাকের চেহারা থমথম করছে। বোঝা যাচ্ছে, একটা কথাও বিশ্বাস করেনি। পালা করে তিন বন্ধুর দিকে তাকাল। তারপর বলল, ‘দেখা হয়েছে তো? এখন ভাগো!’

‘রাস্তায়। উনি তো পাইলট, রোজই রানওয়ে দেখেন, তাই আসতে চাইলেন না।’

কুসাকের চেহারা থমথম করছে। বোঝা যাচ্ছে, একটা কথাও বিশ্বাস করেনি। পালা করে তিন বন্ধুর দিকে তাকাল। তারপর বলল, ‘দেখা হয়েছে তো? এখন ভাগো!’

‘জি?’ মনে হলো কথাটা অয়ন বুঝতে পারেনি।

‘ভাগো!’

‘চলে যেতে বলছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘মি. ডোনোভানের কাছে নিয়ে যাবেন না?’ ভুরু কোঁচকাল অয়ন। ‘হাজার হোক, ওনার জমিতেই তো অনুপ্রবেশ করেছি।’

‘কোনো দরকার নেই,’ কুসাক বলল। ‘যাও এখন।’

‘তাহলে চলুন,’ পা বাড়াল অয়ন। ‘মেইন গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিন আমাদের।’

হাত তুলে ওকে থামাল কুসাক। বলল, ‘মেইন গেট না, বেড়া পর্যন্ত পৌঁছে দেব তোমাদের। যে পথে এসেছ, সে পথেই ফিরে যাবে। চলো!’

প্রতিবাদ করা গেল না, একরকম খেদিয়েই ওদের ফেন্সের কাছে নিয়ে গেল কুসাক। পিছু পিছু কুকুর দুটিও এল। বেড়া টপকে রাস্তায় নামল তিন বন্ধু। জিপ থেকে নেমে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল পাবলো, ওদের দেখে

ছুটে এল।

'পরে কথা বলব,' পাবলোকে বলল অয়ন। 'চলুন ফিরে যাই।'

'কুসাক না?' বেড়ার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত গলায় বলল পাবলো। 'ওখানে কী করছে?'

'বললাম তো পরে বলব,' বলল অয়ন। 'চলুন, যাই।'

চলতে শুরু করল জিপ। ঘাড় ফিরিয়ে অয়ন দেখল, এখনো যায়নি কুসাক। ওরা দৃষ্টিসীমার আড়াল না হওয়া পর্যন্ত বেড়ার পাশে একভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে, ওদের চলে যাওয়াটা নিশ্চিত করতে চায়।

সোজা হয়ে সিটে বসল অয়ন। দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফোঁস করে। কুসাকের আচরণ সন্দিহান করে তুলেছে ওকে। ওদেরকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দিল কেন?

অদ্ভুত। খুবই অদ্ভুত।

দশ

'ইয়া বড় বড় দুটি শিকারি কুকুর।' হাত নেড়ে নেড়ে পাবলোকে গল্প শোনাচ্ছে জিমি। 'আমাদের দিকে ছুটে এল। অয়নের অবস্থা যদি দেখতেন! আরেকটু হলেই প্যান্ট খারাপ করে দিত...'

ওর মাথায় একটা চাঁটি মারল অয়ন। 'অ্যাই! বাজে কথা বলছিস কেন?'

'বাজে কথা না মোটেই,' বলল জিমি। 'যা ঘটেছে তা-ই বলছি।'

'হ্যাঁ,' সায় জানাল রিয়া। 'সত্যিই প্যান্ট খারাপের দশা হয়েছিল তোমার।'

'সূর্য কি পশ্চিমে উঠল নাকি?' বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকাল অয়ন। 'তুমি জিমির সঙ্গে সুর মেলাচ্ছ?'

'কেমন লাগে?' ভুরু নাচাল রিয়া। 'সুযোগ পেলেই যেভাবে অপমান করো আমাদের...আজ তোমার অবস্থা খারাপ করে ছাড়ব।'

'কোনো সমস্যা নেই,' হালকা গলায় বলল অয়ন। 'তোমাদের দুজনের ঝগড়া থামানোর একটা বুদ্ধি তো পাওয়া গেল। মাঝেমধ্যে কুকুর লেলিয়ে দিতে হবে তোমাদের পেছনে।'

হা হা করে হেসে ফেলল পাবলো।

মুখ কালো হয়ে গেল জিমির। 'তুই আমাদের খোঁচা মারছিস, অয়ন? আমরা না থাকলে কী ঘটত, ভেবে দেখেছিস? এতক্ষণে হয় কুত্তার পেটে যেতি, না হলে জলাতঙ্কের ইনজেকশন নিতি।'

'সরি, সরি,' তাড়াতাড়ি বলল অয়ন। 'সত্যি বলছি, আমি কৃতজ্ঞ। কিছু মনে করিস না।'

'তোমাদের ঝগড়াঝাঁটি শেষ হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল পাবলো। 'এখন তা হলে শান্ত হয়ে বসো।'

'এয়ারপোর্টে ফিরছেন?' জানতে চাইল অয়ন।

'আর কোথায়?'

'না...ভাবছিলাম হ্যাগার্টির কথা। সে কি খুব দূরে থাকে?'

'না। এয়ারপোর্ট থেকে খুব বেশি হলে দুই মাইল।'

'তাহলে চলুন, ওর সঙ্গে কথা বলে আসি।'

'সকালে গেলে হয় না?' বলল পাবলো। 'আমার কিছু কাজ ছিল।'

'হুম,' বলে ভাবনায় ডুবে গেল অয়ন। খানিক পর বলল, 'এক কাজ করা যায়। আপনি আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে যান। কাছে যখন, আমরা হেঁটেই ফিরতে পারব।'

'পথ হারাবে না তো?'

'সম্ভাবনা আছে?'

হাসল পাবলো। 'তা নেই। এয়ারপোর্ট থেকে হ্যাগার্টির বাড়িতে যাওয়ার রাস্তা একটাই।'

'তাহলে আর সমস্যা কোথায়?'

'না, সমস্যা নেই। ঠিক আছে, চলো, পৌঁছে দিই।'

কিছুক্ষণ চলার পর ভাঙাচোরা একটা কাঠের বেড়ার পাশে থামল জিপ। আঙুল তুলে সীমানার ভেতরে একটা পুরোনো কাঠের বাড়ি দেখাল পাবলো। বলল, 'বুড়ো ওখানেই থাকে।'

নেমে পড়ল গোয়েন্দারা। অয়ন বলল, 'থ্যাংকস। আপনি তাহলে যান।'

'দেরি কোরো না,' পাবলো বলল।

'করব না।'

চলে গেল জিপটা।

কাঠের বেড়ার মাঝখানে একটা নড়বড়ে নিচু লোহার গেট। সেদিকে এগিয়ে গেল তিন বন্ধু। গেটের কবজায় জং ধরেছে, ঠেলা দিতেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল। গেট পেরিয়ে একটা ছোট লন, তাতে অযত্ন আর অবহেলায় ঘাস-আগাছার জঙ্গল সৃষ্টি হয়েছে। লনের মাঝ চিরে বাড়ির বারান্দা পর্যন্ত একটা সরু পেভমেন্ট চলে গেছে, সেটা ধরে হাঁটতে লাগল ওরা। চলতে চলতে বাড়ির ছাদের ওপর একটা সরু রেডিও অ্যানটেনা দেখতে পেল অয়ন।

বারান্দায় উঠে একটু ইতস্তত করল তিনজন। শেষে দ্বিধা কাটিয়ে দরজায় নক করল জিমি।

কোনো জবাব নেই।

'নেই নাকি?' বিড়বিড় করল ও।

'জানালায় আলো দেখতে পাচ্ছি,' বলল রিয়া। 'বাইরে গেলে নিশ্চয়ই এতগুলো বাতি জ্বেলে রেখে যেত না।'

'আবার টোকা দে,' বলল অয়ন।

ঠক ঠক ঠক। দ্বিতীয়বার নক করল জিমি। এইবার পাওয়া গেল সাড়া।

'কে?' বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করা হলো।

ঝট করে উল্টো ঘুরল তিন বন্ধু, চমকে গেছে। কারণ, প্রশ্নটা বাড়ির ভেতর থেকে নয়, ওদের পেছন থেকে এসেছে।

ঘুরে দাঁড়াতেই বুড়ো হ্যাগার্টিকে দেখতে পেল ওরা, বারান্দার ঠিক নিচে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির পেছনে কাজ করছিল বোধ হয়, শব্দ শুনে ঘুরে দেখতে এসেছে, রুমালে হাত মুছছে সে।

'হাই, মি. হ্যাগার্টি!' মুখে হাসি ফুটিয়ে অভিবাদন জানাল অয়ন। 'গুড ইভনিং।'

'তোমরা কারা?' সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে এল বুড়ো। 'চেনা চেনা লাগছে...কোথায় দেখেছি, বলো তো?'

'কয়েক ঘণ্টা আগে—হোয়াইট ফ্যালকনের ক্লাব হাউসে।'

'মনে পড়েছে! তোমরাই তো ক্লাউড পিয়ার্সারের আজ রাতের শিকার!' খুশি খুশি দেখাল হ্যাগার্টিকে। 'এখানে কী মনে করে?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'আমার সঙ্গে?' শব্দ করে হেসে উঠল হ্যাগার্টি। 'ভারি মজার ব্যাপার তো!'

'মজার ব্যাপার মানে?' জিমি ভুরু কোঁচকাল।

'আমার সঙ্গে কেউ কখনো দেখা করতে আসে না। সবার ধারণা, আমি একটা পাগল। হা হা হা!'

আমারও তা-ই মনে হচ্ছে, মনে মনে ভাবল জিমি।

'কী কাজে এসেছ, বলে ফেলো ঝটপট,' বলল হ্যাগার্টি।

'কাজে এসেছি কে বলল?' জিজ্ঞেস করল রিয়া।

'বুঝি, সবই বুঝি আমি। গত এক বছরে মাত্র দুবার দুজন লোক দেখা করতে এসেছে আমার সঙ্গে—কাজ নিয়ে। বিনা কাজে কেউ আসে না এখানে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অয়ন। বলল, 'এটাকে কাজ বলা যায় কি না জানি না, তবে আমরা ক্লাউড পিয়ার্সারের গল্প শুনতে এসেছি।'

একটু যেন থমকে গেল হ্যাগার্টি। বিড়বিড় করে বলল, 'আজব তো! এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কেউ আমার কাছে ক্লাউড পিয়ার্সারের গল্প শুনতে এল।'

'দ্বিতীয়?' অয়নের চোখে অবিশ্বাস। 'এর আগে মাত্র একবার এই গল্প আপনি মানুষকে শুনিয়েছেন?'

'না, না, ব্যাপারটা অন্য রকম,' মাথা নেড়ে বলল বুড়ো। 'ক্লাউড পিয়ার্সারের গল্প আমি নিজ থেকেই মানুষকে বলে বেড়াই। শুনতে চাইতে হয় না। মাস তিনেক আগে হঠাৎ করেই এক লোক এসে হাজির। সে কী আগ্রহ! খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু জেনে নিল।'

'কে এই লোক?'

'বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলবে?' দরজার দিকে এগোল হ্যাগার্টি। 'এসো, ভেতরে এসো।'

বসার ঘরটা ছোট্ট। কয়েকটা পুরোনো কাউচ ছাড়া আর কিছু নেই। মেঝের কার্পেটটা বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গেছে। মাথার ওপর একটা ফ্যান ঝুলছে —সেটাও আসল রং হারিয়ে কালচে হয়ে আছে; কত কাল রং করা হয় না কে জানে।

'আর কেউ থাকে না এখানে?' ভেতরে ঢুকে প্রশ্ন করল রিয়া।

'না,' নেতিবাচক জবাব দিল হ্যাগার্টি। 'আমি স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ, পিছুটান পছন্দ করি না। তাই বিয়েটিয়ে করিনি।'

'আত্মীয়স্বজন?'

'তাঁদের ঈশ্বর বহু আগেই আপন করে নিয়েছেন।'

'সো স্যাড!' দুঃখ প্রকাশ করল জিমি।

'জন্ম-মৃত্যু ঈশ্বর নিজ হাতে লেখেন। এ নিয়ে দুঃখ করার কী আছে? থাক গে, তোমাদের নামই তো জানলাম না।'

একে একে নিজেদের পরিচয় দিল তিন বন্ধু।

'গুড,' বলল হ্যাগার্টি। 'কী খাবে তোমরা...ঠান্ডা, না গরম?'

'কিছু না,' বলল অয়ন। 'আপনি বসুন, কথা বলতে ভালো লাগছে।'

'যা তোমাদের ইচ্ছা,' ছেলেদের মুখোমুখি একটা কাউচে বসে পড়ল হ্যাগার্টি।

'হ্যাঁ, এবার ওই লোকটার ব্যাপারে বলুন...আপনার কাছে যে ক্লাউড পিয়ার্সারের গল্প শুনতে এসেছিল।'

'তার কথা শুনে লাভটা কী?'

'এমনি। জাস্ট কৌতূহল।'

'অ!' কাঁধ ঝাঁকাল হ্যাগার্টি। 'লোকটা ভারি অদ্ভুত স্বভাবের। প্রথম যখন দ্বীপে এল, আগবাড়িয়ে আলাপ করতে গেলাম, আমাকে পাত্তাই দিল না। অথচ কদিন পরই উল্টো কাণ্ড। যেচে আমার সঙ্গে খাতির জমাল, এখানে এসে ক্লাউড পিয়ার্সারের গল্প শুনতে চাইল।'

'নাম কী লোকটার?'

'কী যেন...দাঁড়াও ভেবে দেখি...হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ব্রিক প্যাটারসন।'

'কোথায় থাকে সে?'

'মেইনল্যান্ড থেকে এসেছিল, ঠিকানা তো জানতে চাইনি!'

'এখনো কি আছে?'

'মনে হয় না। মাসখানেক আগে শেষবার দেখা হয়েছিল। তখন প্রায়ই আসা-যাওয়া করত।'

'কী কাজে, বলতে পারেন?'

'সম্ভবত জমি লিজ নেওয়ার চেষ্টা করছিল। হলিডে রিসোর্ট বানাবে শুনেছিলাম। তবে সুবিধা করতে পারেনি। তাই মনে হয় চলে গেছে।'

'আপনি শিউর?'

'থাকলে নিশ্চয়ই দেখা হতো। দ্বীপটা তো খুব ছোট।'

'হুঁ,' গম্ভীর দেখাল অয়নকে। 'দেখতে কেমন লোকটা?'

'খুব লম্বা-চওড়া নয়, তবে স্বাস্থ্য চমৎকার। বয়স চল্লিশের আশপাশে। মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ।'

গোঙানির মতো শব্দ করল জিমি। 'এই বর্ণনা দিয়ে অন্তত হাজারখানেক লোক পাওয়া যাবে।'

'যাক গে,' বলে সোজা হলো অয়ন। 'ক্লাউড পিয়ার্সারের গল্প বলুন। ক্যাপ্টেন কালভারকে কি আপনি নিজ চোখে দেখেছেন?'

'দেখব না মানে?' খুশি খুশি কণ্ঠে বলল হ্যাগার্টি। 'আমার বাবা ছিলেন এয়ারফোর্সের রেডিও অপারেটর। যুদ্ধের সময় অ্যাভালন আইল্যান্ডে বদলি হয় তাঁর। আমার বয়স তখন ১০ কি ১২। মাঝেমধ্যেই অফিসে নিয়ে যেতেন আমাকে। বিমান আর বৈমানিকদের দেখাতেন। একবার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন কালভারের সঙ্গে। লোক ছিল বটে একটা...'

ঝাড়া আধঘণ্টা বকবক করল বুড়ো। ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে কালভারের কেচ্ছাকাহিনি বলতে লাগল। মনে মনে মুচকি হাসল তিন বন্ধু। কারণ, গল্পগুলোর অর্ধেকও যদি সত্যি হয়, তো কালভারকে নির্দ্বিধায় সুপারম্যান বলা যায়।

দম নেওয়ার জন্য হ্যাগার্টি একটু থামতেই চট করে অয়ন জিজ্ঞেস করল, 'কালভারের কোনো ছবি আছে আপনার কাছে? অথবা ক্লাউড পিয়ার্সারের?'

'অবশ্যই আছে,' বলল হ্যাগার্টি। 'দেখতে চাও?'

'নিশ্চয়ই!'

'এসো আমার সঙ্গে,' বলে ছেলেদের ভেতরের ঘরে নিয়ে গেল সে।

চারপাশে নজর বোলাল ওরা। এই রুমেরও জীর্ণদশা। একটা পুরোনো বিছানা আছে, দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দেওয়া আছে একটা কাঠের আলমারি। বিছানার পাশে একটা টেবিলের ওপর রেডিও সেট দেখা গেল। ছাদের ওপর অ্যানটেনা দেখেছে আগেই; অয়ন বুঝল, এটা দিয়েই টাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সিতে আড়ি পাতে বুড়ো।

আলমারি খুলে একটা পুরোনো অ্যালবাম বের করল হ্যাগার্টি, সেটা নিয়ে বিছানায় বসল, তাকে ঘিরে ধরল গোয়েন্দারা। অ্যালবামটা কোলের ওপর রেখে আস্তে আস্তে পাতা ওলটাতে লাগল বুড়ো। একটা পাতায় পৌঁছে থামল। একটা ছবির ওপর আঙুল রেখে বলল, 'এটাই ক্লাউড পিয়ার্সার আর সামনে দাঁড়ানো লোকটা ক্যাপ্টেন কালভার।'

সাগ্রহে সামনে ঝুঁকল সবাই। ছবিটা সাদা-কালো, কালের প্রবাহে সামান্য ঝাপসা হয়ে গেছে। রানওয়েতে দাঁড়ানো একটা ফাইটার দেখা যাচ্ছে ওতে, তার সামনে ইউনিফর্ম পরা এক হাসিখুশি যুবক।

হ্যাগার্টির অনুমতি নিয়ে আস্তে করে ছবিটা অ্যালবামের পাতা থেকে খুলে নিল অয়ন। পকেট থেকে পাবলোর তোলা ছবিটাও বের করল। দুটি পাশাপাশি ধরল, মেলানোর চেষ্টা করছে। ভুরু কুঁচকে গেল ওর। দুটিই এক রকম বিমান, কিন্তু কেন জানি মনটা খুঁতখুঁত করছে। কী যেন মিলছে না...অথচ অনেক ভেবেও ব্যাপারটা ধরতে পারল না।

অন্য দুই বন্ধু ব্যস্ত অ্যালবামটা নিয়ে। বাকি ফটোগুলো দেখছে। আকাশে উড়ন্ত একটা ফাইটারের ছবি দেখিয়ে জিমি বলল, 'এই তো, ক্লাউড পিয়ার্সারের আরেকটা ছবি।'

'না, না, ওটা ক্লাউড পিয়ার্সার না,' বলে উঠল হ্যাগার্টি।

'কীভাবে বুঝলেন?' জিজ্ঞেস করল রিয়া। 'এক রকমই তো লাগছে।'

'এটাও পি-ফিফটি ওয়ান,' ব্যাখ্যা করল হ্যাগার্টি, 'তবে ডি মডেলের। ক্লাউড পিয়ার্সারের মডেল হচ্ছে বি।'

'দুটির তফাত কী?'

'ডি হচ্ছে পরের দিকের মডেল। ইঞ্জিন আর কামানগুলো ভিন্ন। ডিজাইনেও খানিকটা পরিবর্তন আনা হয়েছিল। ভালো করে দেখলেই বুঝবে, দুই মডেলের ককপিট দুই রকম। বি মডেলের ককপিটটা খাঁচার মতো—বার্ডকেজ ককপিট বলে ওটাকে। আর ডি মডেলেরটা বুদ্‌বুদের মতো...একটু গোল—বাবল ককপিট।'

'আই সি,' সমঝদারের মতো মাথা ঝাঁকাল জিমি।

যেন হাজার ওয়াটের বাতি জ্বলে উঠেছে, মনের ভেতরে কুয়াশা দূর হয়ে গেল। হাতের ছবি দুটির দিকে আবার তাকাল অয়ন। মুখে হাসি ফুটল ওর। পার্থক্যটা ধরতে পেরেছে। ক্লাউড পিয়ার্সারের ছবিটা ফিরিয়ে দিল ও, তারপর বলল, 'আমরা তা হলে উঠি, মি. হ্যাগার্টি। রাত হয়ে গেছে। পরে দেখা হবে।'

'নিশ্চয়ই! যখন খুশি চলে এসো।'

হ্যাগার্টির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ওরা। এয়ারপোর্টের দিকে ফিরতি পথ ধরল।

'আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে,' সঙ্গীদের বলল অয়ন। 'ভয়ংকর ধূর্ত এক শত্রুর বিরুদ্ধে নেমেছি আমরা।'

'শত্রু?' যেন নিশ্চিত হতে চাইল জিমি। 'ভূত না?'

'শুরু থেকেই তো বলছি, ভূত বলে কিছু নেই। সবই মানুষের কারসাজি। আর এখন আমরা সেটা প্রমাণও করে দিতে পারব।'

'কীভাবে?'

পাবলোর তোলা ছবিটা হাতে তুলে নাড়ল অয়ন। 'এটা দিয়ে।'

এগারো

'ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলাটা ছাড়ো তো, অয়ন,' বিরক্ত গলায় বলল রিয়া। 'ওই ছবি তো আমরা দেখেছি। ওটা দিয়ে কীভাবে প্রমাণ হচ্ছে যে অভ্রভেদীর ভূতটা ভুয়া?'

'ভালো করে দেখো,' পাবলোর তোলা ছবিটা বন্ধুদের হাতে দিল অয়ন।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রিয়া। তারপর বিরক্ত হয়ে বলল, 'কই, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

'এই জন্যই বলি, তোমাকে দিয়ে গোয়েন্দাগিরি হবে না,' বলল জিমি। 'গোয়েন্দা হওয়ার জন্য চোখা নজর চাই।'

'তোমার নজর বুঝি খুব চোখা? বলো তাহলে, কী বুঝলে এই ছবি দেখে।'

'ছবির বিমানটায় বাবল ককপিট দেখা যাচ্ছে...ঠিক বলেছি, অয়ন?'

মাথা ঝাঁকাল অয়ন। বলল, 'আরেকটা পার্থক্য আছে। অ্যানটেনাটা ককপিটের ঠিক পেছনে নেই, চলে গেছে প্রায় লেজের কাছে।'

'মানে কী?' দ্বিধান্বিত শোনাল রিয়ার গলা।

সুর করে জিমি বলল, 'মানে হচ্ছে...হে অবুঝ মেয়ে...এটা ডি মডেলের বিমান।'

'খবরদার, আমাকে অবুঝ মেয়ে বলবে না!' ফুঁসে উঠল রিয়া।

'খামাকা ওকে খ্যাপাস না তো,' জিমিকে ধমকাল অয়ন। 'শোনো রিয়া, ওই বাবল ককপিট আর অ্যানটেনার পজিশনটা ডি মডেলের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু র‍্যালি কালভারের অভ্রভেদী ছিল একটা বি মডেলের পি-ফিফটি ওয়ান। সত্যি সত্যি যদি ওটার ভূত উদয় হতো, তাহলে বি মডেলের বিমানই দেখতাম আমরা, তাই না? কিন্তু পাবলোর তোলা ছবিতে দেখা যাচ্ছে ডি মডেল...তার মানে, ওটা ভুয়া।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো রিয়ার কাছে। 'তাই তো! কিন্তু এসব করছেটা কে? কেন করছে?'

'ক্রিস্টিনদের কেউ তাড়াতে চাইছে এখান থেকে,' চিন্তিত গলায় বলল অয়ন। 'কে...সেটাই বের করতে হবে আমাদের।'

'এক্ষুনি গিয়ে ওদের সব খুলে বলতে হবে,' বলল রিয়া।

'মোটেই না,' মানা করল অয়ন। 'ভেতরের কেউ জড়িত থাকতে পারে ষড়যন্ত্রটার সঙ্গে। আমরা যে ভূতের ধাপ্পাটা ধরে ফেলেছি, সেটা তাকে বুঝতে দেওয়া যাবে না।'

'তুই কাউকে সন্দেহ করছিস?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল জিমি।

'মি. ডবকিনের আচরণ তোদের কাছে বিদঘুটে মনে হয়নি?'

'কী আবোল-তাবোল বকছিস?' বিরক্ত কণ্ঠে বলল জিমি। 'নিজের পায়ে কুড়াল মারে কেউ? দ্বীপ ছাড়লে তো তারই ক্ষতি। এয়ারপোর্টের পেছনে কত টাকা আটকে আছে!'

'একজন ক্রেতার কথা বলছিল সে,' মনে পড়ল রিয়ার। 'লোকটা হয়তো তাকে টাকাপয়সার লোভ দেখিয়েছে। আর তার যে টাকার দরকার, সেটা তো নিজ মুখেই বলেছে।'

'কে এই ক্রেতা?' জিমিকে বিভ্রান্ত দেখাল।

'দ্বীপে কে জমি নেওয়ার চেষ্টা করছে?' ভুরু নাচাল অয়ন, মুখে মিটিমিটি হাসি।

পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল জিমি আর রিয়া। পরমুহূর্তেই সমস্বরে চিৎকারের মতো বলল, 'ব্রিক প্যাটারসন!'

'এই তো ঠিক লাইনে চিন্তা করছিস।'

'মাই গড!' বলল রিয়া। 'এই লোকই তো হ্যাগার্টির কাছে ক্লাউড পিয়ার্সারের খুঁটিনাটি জানতে গিয়েছিল। সবকিছুর পেছনে তাহলে সে-ই কলকাঠি নাড়ছে।'

'এমন মরিয়া হয়ে উঠেছে কেন, সেটাই প্রশ্ন,' অয়নের কপালে চিন্তার রেখা। 'পুরো দ্বীপ পড়ে থাকতে এয়ারপোর্টের প্রতি তার আগ্রহ কেন? সবচেয়ে বড় কথা, এর মধ্যে মি. ডোনোভান জড়াচ্ছেন কী করে? তাঁকে দেখে তো মনে হলো, জাগতিক মোহ ত্যাগ করেছেন।'

'মি. ডোনোভানকে সন্দেহ করছ কেন?'

'কেন, দেখোনি, রানওয়েতে টায়ারের দাগ ছিল?' বলল জিমি। 'সত্যিই একটা প্লেন ল্যান্ড করেছিল ওখানে।'

‘তাঁর ফাইটারটাই অভ্রভেদী সাজছে?’ জিজ্ঞেস করল রিয়া।

‘মনে হয় না,’ মাথা নাড়ল অয়ন। ‘যদ্দুর মনে পড়ে, ওটায় বাবল ককপিট দেখিনি। তার মানে, ওটা বি মডেলেরই ছিল।’

‘তার মানে ডি মডেলের আরেকটা আছে...ওটাই ভূত সাজছে। কোথায় ওটা? লুকিয়ে রাখা হয়েছে?’

‘তা তো বটেই। যদি খুঁজে বের করতে পারি, তাহলে রহস্যটার সমাধান হয়ে যাবে।’

‘কাজটা কঠিন,’ বলল জিমি। ‘মি. ডোনোভান যদি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থাকেন, উনি কি আমাদের তল্লাশি চালাতে দেবেন তাঁর এস্টেটের ভেতরে? তার ওপরে আছে কুসাক আর দুটি হারামি কুকুর।’

‘ওদেরকে বুঝতে দেওয়া যাবে না যে তল্লাশি করতে গেছি,’ বলল অয়ন। ‘অন্য কোনো ছুঁতো নিয়ে যেতে হবে।’

‘কী ছুঁতো?’

‘পরে ভেবে দেখব,’ অয়ন বলল। ‘চল, আপাতত ফিরে যাই।’

ব্যারাক হাউসে তিনটা বিছানা দেওয়া হলো অয়ন, জিমি আর রায়ানকে। রিয়া গেল ক্রিস্টিন আর মেরির কামরায়। রাত ১১টার দিকে শুয়ে পড়ল সবাই।

শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েছে জিমি আর রায়ান, কিন্তু অয়নের চোখে ঘুম নেই। স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে আছে, চিন্তার ঝড় বইছে মাথায়, বিছানায় শুয়ে খালি এপাশ-ওপাশ করতে লাগল।

গড়াগড়ি দিতে দিতে একপর্যায়ে চোখ লেগে এসেছিল, হঠাৎ একটা শব্দ শুনে টুঁটে গেল তন্দ্রা। ধড়মড় করে উঠে বসল ও। হাতঘড়িতে দেখল, রাত একটা বাজে। শব্দটাকে চেনার জন্য কান পাতল।

টানা বোঁ বোঁ করে হচ্ছে আওয়াজটা। বাড়ছে, আবার কমছে। ভুরু কুঁচকে গেল অয়নের। জেটের আওয়াজ না? মনে হচ্ছে, মাথার ওপর দিয়ে আসা-যাওয়া করছে বিমানটা।

শব্দ শুনে অন্যরাও উঠে গেছে, শুধু জিমি ঘুমাচ্ছে নাক ডাকিয়ে। ঘুম খুবই গাঢ় ওর। ধাক্কা দিয়ে বন্ধুকে জাগাল অয়ন, তারপর হোয়াইট ফ্যালকনের সদস্যদের সঙ্গে বেরিয়ে এল ব্যারাক থেকে।

রিয়াকে নিয়ে ক্রিস্টিন আর মেরি আরও আগেই জেগেছে। ওদের উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকতে দেখা গেল।

কাছে গিয়ে ক্রিস্টিনকে ডাক দিল ডবকিন, ‘ক্রিস্টিন! কী দেখছ?’

মেয়েটাকে যেন বোবায় ধরেছে, জবাব দিল না কোনো। আগের মতোই আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বাকিরাও তাকাল।

চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট একটা আকৃতি দেখতে পেল ওরা। বাঁক নিয়ে আবার এদিকেই ফিরে আসছে ওটা।

‘পাগলটা কে?’ বিরক্ত কণ্ঠে বলল বার্নি। ‘রাতদুপুরে মানুষের ঘুম নষ্ট করছে? আরে ব্যাটা, ওড়ার এত শখ হলে অন্য কোথাও যা। এখানে কেন?’

রাগে গজগজ করতে লাগল বৈমানিক। কিন্তু খানিক পরই যা দেখল, তাতে মুখের ভাষা হারাল সে-ও।

কাছাকাছি এসে পড়েছে বিমানটা। ওটার চেহারা বোঝা যাচ্ছে এখন।

পুরোনো, ধ্বংসাবশেষের মতো!

‘ইয়াল্লা!’ চেঁচিয়ে উঠল জিমি। ‘ওটা তো ক্লাউড পিয়ার্সার!’

বিকট গর্জন তুলে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল ফাইটারটা, সেই আওয়াজে কানে তালা লাগার জোগাড়। দুহাতে কান চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল সবাই।

‘করছে কী ওটা?’ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বিমানটার দিকে তাকিয়ে বলল পাবলো।

‘আমাদের সাবধান করে দিতে এসেছে,’ বলল ডবকিন।

‘কিন্তু আমরা তো এখন ফ্লাই করছি না!’

‘আমাদের উপস্থিতিই হয়তো পছন্দ হচ্ছে না ওটার।’

ঝট করে ডবকিনের দিকে তাকাল অয়ন। এ লোক মানুষের মনে ভয় ঢোকাতে ওস্তাদ।

মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেছে দুর্ঘটনাটা...কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই। এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না অয়ন। লোকটা পাগল, নাকি পাষাণ? হোয়াইট ফ্যালকনের সব কটা বিমান নষ্ট করে দিয়ে গেল শয়তানটা

‘মনে হচ্ছে আক্রমণাত্মক মুডে আছে,’ বলল রায়ান।

আরেক দফা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল অভ্রভেদী। তারপর হঠাৎ দিক পাল্টাল।

‘হ্যাঙ্গারের দিকে যাচ্ছে!’ চেঁচিয়ে উঠল পাবলো।

‘কেন...’

প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না ক্রিস্টিন, চোখের সামনে ঘটে গেল ঘটনাটা। ওপরে উঠে গেল প্লেন। আর ঠিক এক সেকেন্ড পরই বুম করে একটা বিস্ফোরণ ঘটল। আগুন জ্বলে উঠল হ্যাঙ্গারের ভেতর।

‘সর্বনাশ!’ চেঁচিয়ে উঠল রিয়া। ‘বোমা ফেলেছে!’

‘আমাদের সব বিমান ওখানে,’ বলে দৌড় দিল ক্রিস্টিন।

‘সেসনাটাও,’ বলল রায়ান। সে-ও ছুটল।

‘পাবলো, বেন!’ চিৎকার করে নির্দেশ দিল ডবকিন। ‘ফায়ার ট্রাক! জলদি!’

সবাই ছুটতে শুরু করল হ্যাঙ্গারের দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেছে দুর্ঘটনাটা...কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই। এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না অয়ন। লোকটা পাগল, নাকি পাষাণ? হোয়াইট ফ্যালকনের সব কটা বিমান নষ্ট করে দিয়ে গেল শয়তানটা।

ছুটতে ছুটতে একবার আকাশের দিকে তাকাল ও।

নেই ফাইটারটা!

সর্বনাশ যা করার করে নির্বিঘ্নে কেটে পড়েছে অভ্রভেদী!

চলবে...

অলংকরণ : **আরাফাত করিম**



বৃষ্টিভেজা কৈশোর

আবদুল গাফফার রনি

কাশবনে বৃষ্টি ঝরে, ঘাসবনে সাড়া পড়ে তার। মেঠোপথে দিনদুপুরেই আঁধার নামে, রাখাল ছেলে পথ ভুলে থমকে দাঁড়ায়। বকের সারি উড়ে এসে লুকিয়ে পড়ে চৌধুরীদের বাঁশবনে।

ফররুখ আহমদের বৃষ্টির ছড়ার সঙ্গে আমার ছেলেবেলা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। খুব ছোট তখন। গাঁয়ের ভেজা মেঠোপথ পেরিয়ে স্কুলে যেতে হয়। তখনকার স্কুলের সিলেবাসগুলোও অমনভাবেই সাজানো। 'বৃষ্টির ছড়া' যখন পড়ছি, তখন ঘোর বর্ষাকাল। স্কুলের কাছেই চৌধুরীদের ৩০ বিঘা আয়তনের বিশাল বাঁশবাগান। সেই ঘনকালো বাঁশবাগান পেরিয়ে স্কুলে আসি। বক, শালিক, কাকদের নিত্য আনাগোনা সেখানে। হঠাৎ যদি বৃষ্টি আসে, পাখিরা দল বেঁধে সেখানে ঘন বাঁশপাতার আড়ালে লুকিয়ে ফেলে নিজেদের। আমরাও পথভোলা রাখালের মতো থমকে যাই, বাঁশঝাড়ের নিচে আশ্রয় নিই। তারপর বৃষ্টি যখন ধরে আসে, আবার স্কুল বা বাড়ির পথ ধরি। বাঁশবাগান বৃষ্টির হাত থেকে পুরোপুরি বাঁচাতে পারে না। আবার পুরোপুরি ভেজাও না। বৃষ্টি কমলে বাঁশবাগান ছেড়ে স্কুলের মাঠে পা রাখি।

স্কুলে হয়তো ঘণ্টা পড়ে গেছে ততক্ষণে। মাঠে জমেছে গোড়ালিসমান পানি। তার ওপর চোরকাঁটার দাপট। চোরকাঁটা স্কুলের মাঠকে সুরক্ষা দেয়। সারা বছর দেখতে সবুজ কার্পেটের মতো, ছোট্ট ছোট্ট জমাট ঘাস। কিন্তু বৃষ্টি এলেই ৮-১০ ইঞ্চি শিষ বের হয়। সেই শিষ ভরে ওঠে চোরকাঁটায়। পরনে ফুলপ্যান্ট থাকলে চোরকাঁটার দল গেঁথে যায় প্যান্টের কাপড়ে। অবসর সময়ে কিংবা ছুটির পর বাড়ি ফিরে প্যান্ট থেকে খুঁটে খুঁটে চোরকাঁটা তোলার যে মজা ছিল, একালে মোবাইল গেমের যুগে ছেলেমেয়েরা সেই মজা কোথায় পাবে!

ক্লাস শুরু হয়, তখনই হয়তো আবার জোর বৃষ্টি নামে। স্কুলের টিনের চালের সেই বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ এত বছর পরও যেন স্পষ্ট শুনতে পাই। স্কুলের সামনে দারুণ একটা ফুলবাগান। চারপাশ কোমরসমান উঁচু ইটের পাঁচিল। ঘন ইটের নয়। একটা ইটের পর ফাঁকা, আবার ইট, আবার ফাঁকা। সব মিলিয়ে ইটের তৈরি রেলিং বললেই চলে। ২০ হাত পরপর একটা করে লোহার গ্রিলের গেট। বউন্ডারির বাইরে চোরকাঁটায় ভরা খেলার মাঠ।



স্কুলের ঘণ্টা পড়ার আগে, কিংবা টিফিন পিরিয়ডে আমরা সেই পাঁচিলে পা ঝুলিয়ে বসে গল্প করি, দুষ্টুমি, মারামারি—যত রকমের নিরীহ বাঁদরামি আছে, সব চলে।

বাউন্ডারির ভেতর স্কুলের ঘরগুলোর সামনে সার দিয়ে নানা রকম ফুলের গাছ লাগানো। গোলাপ, টগর, গন্ধরাজ, পেনসিল ক্যাকটাস, কাঠগোলাপ, জুনিপার ঝাউয়ের ঝোপ এবং একটা বাগানবিলাস। কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে বাগানের ঠিক মাঝবরাবর দাঁড়িয়ে আছে একটা কদমগাছ। বর্ষা এলে ফুলে ফুলে ভরে যায়। ফুলের ভারে যেন কদমের ডাল নুয়ে পড়ে। পাঁচিলের ওপর থেকে ফুল পাড়া যায়। ফুল যে পাড়তে নেই, দেখেই সাধ মেটাতে হয়—সেই শৈশবে এই বোধ আমাদের হয়নি। কদম ফুল আর দশটা ফুলের চেয়ে আলাদা। এর প্রতি আমাদের টান দামি খেলনার চেয়েও বেশি। আমি অতটা চালাক-চতুর নই—তাই একটা ফুলও আমার কপালে জোটে না। দেখতে না দেখতে হাতের নাগালের সব ফুল সাবাড় করে ফেলে বন্ধুরা। তারপর আর যখন উপায় নেই নিচ থেকে পাড়ার, কেউ কেউ ক্লাসরুমের দেয়ালে ইটের খাঁজে খাঁজে পা রেখে উঠে পড়ে টিনের চালে। ঝুড়ি ঝুড়ি কদম ফুল পেড়ে আনে। বৃষ্টিধোয়া সেই ফুল যেন স্বর্গ থেকে নিয়ে এসেছে কেউ। মাঝেমধ্যে লাজশরমের

মাথা খেয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে ফুল চাই। কারও দয়া হলে মাঝেমধ্যে দেয়। তখন সে কী আনন্দ!

ফুল তো বেশিক্ষণ খেলার জিনিস নয়। স্কুল ছুটি হওয়ার আগে বৃষ্টিভেজা নরম মাটিতে কদম ফুলের কিশোরে সয়লাব হয়ে যায়। কদম ফুলের গন্ধও বেশ মিষ্টি। ঘোর বৃষ্টি মাথায় যখন ক্লাস করি, বাইরের মুষলধারে ভেজা জগৎটা হাতছানি দেয়, কিন্তু ক্লাস ছেড়ে বেরোনোর উপায় থাকে না, তখন কদম ফুলের এই মিষ্টি ঘ্রাণ মনকে সতেজ করে তোলে।

আমাদের সেই স্কুলমাঠের বাগানটা আজ আর নেই। নেই সেই কোমরসমান উঁচু পাঁচিলও। কিন্তু কদমগাছটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। বয়স বেড়েছে, মোটা হয়েছে, হয়েছে আরও উঁচু। গ্রামে গিয়ে কদমতলায় বসে শৈশবের সেই বৃষ্টির ছন্দ শোনার চেষ্টা করি। এখন তাই বৃষ্টিদিনের সেই স্মৃতিটুকুই সম্বল। আর জসীমউদ্‌দীনের 'পল্লীবর্ষা'র ও লাইনগুলো—

আজিকার রোদ ঘুমায়ে পড়িছে ঘোলাটে মেঘের আড়ে
কেয়া-বন-পথে স্বপন বুনিছে ছল ছল জলধারে।
কাহার ঝিয়ারি কদম্ব-শাখে নিঝ্‌ঝুম নিরালায়,
ছোট ছোট রেণু খুলিয়া দেখিছে অস্ফুট কলিকায়!



বাংলাদেশে বর্ষার সৌন্দর্যই আলাদা। ছবি : প্রথম আলো

২

বর্ষায় মাঠে পানি জমে। ধানখেত, পাটখেত ডুবে যায়। এ সময় নিচু জমিতে 'শাইল কেলে' নামে একধরনের কালো ধান থাকে। জমিতে বৃষ্টির পানি যত জমে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে ওঠে সেই ধান। পাটগাছগুলো আগেই বড় হয়ে গেছে। তাই বৃষ্টিতে ডুবে মরার ভয় পাটের নেই। তবে একটানা বৃষ্টি হলে সবজি ও মরিচের খেতগুলো পুরো নষ্ট যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আষাঢ়' কবিতায় তাই লিখেছিলেন—

'বাদলের ধারা ঝরে ঝর-ঝর,
আউশের খেত জলে ভর-ভর,
কালী-মাখা মেঘে ও পারে আঁধার
ঘনিয়েছে দেখ্ চাহি রে।'

একটা ঝুম বৃষ্টির পরে খালে ঢল নামে। মাঠের পানি বিকট গর্জন করে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ে ছোট্ট ইছামতীর বুকে। সারা বছর শান্ত-ছোট্ট নদীটাও তখন অশান্ত হয়ে ওঠে। দুকূল ছাপিয়ে যায়। পাড় ভাঙে, পাড়ের অনেক গাছপালা উপড়ে গিয়ে নদীর বুকে ডুব দেয়। প্রবল বেগে ইছামতীতে স্রোত বয়। এই ছোট্ট ইছামতী এখান থেকে শ খানেক কিলোমিটার দূরে সাতক্ষীরায় গিয়ে বিশাল নদীতে রূপ নিয়ে সুন্দরবন ভেদ করে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে।

সারা বছর আমরা গোসল করি ইছামতীতে। বর্ষা এলে যেন সাজসাজ রব পড়ে নদীর বুকে। রাজ্যের দাম, শেওলা, কচুরিপানা স্রোতের তালে তালে দোল খেতে খেতে ভেসে যায়। ভেসে যায় শত শত কলাগাছও। নদীর এই আগ্রাসী রূপের কথাও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দু কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদর বেগে জলে পড়ি জল ছলছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে...'

এ সময় নদীতে গোসল করা কিছুটা কঠিন। কারণ, গোসলের ঘাট ডুবে গেছে, এখন পাড় থেকে নদীতে নামলে সাঁতারপানি। সাঁতার না জানলে নদীতে নামা চলে না, কোথাও ঠাঁই নেই। কিন্তু গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের কে রুখবে? পাঁচ-ছয় বছর বয়সেই সাঁতারে ওস্তাদ হয়ে ওঠে। আমি নিজে সাঁতার শিখেছিলাম চার বছর বয়সে। ভরা নদী পাড়ি দেওয়ার চ্যালেঞ্জে নামি। রীতিমতো প্রতিযোগিতা করে। প্রবল স্রোত সামলে ওপারে যাওয়াটা বড্ড কঠিন। দম ধরে রাখা আরও কঠিন। কিন্তু আমরা একটা পদ্ধতি বের করে ফেলি। সোজা পাড়ি না দিয়ে না ১০০ মিটার উজানে চলে যাই। তারপর কোনাকুনি সাঁতার কেটে গিয়ে ওপারে উঠি।

নদীতে হয়তো সাঁতরাচ্ছি, কখন যে ঘন মেঘ জমে ওঠে ঈশান কোণে, টের পাইনি। তারপর হঠাৎই ভরদুপুরে সন্ধ্যার আঁধার নামে। বৃষ্টি নামে নদীতে। বৃষ্টির ফোঁটা চাবুকের মতো মাথায়-পিঠে বাড়ি মারে। সে ভারি ঝামেলার ব্যাপার। পিঠ বাঁচানোর জন্য ডুব দিই। পানির নিচ থেকে শুনি ইছামতীর বুকে বৃষ্টি পতনের শব্দ। এই শব্দ অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে আলাদা। ভালো লাগার অন্য রকম অনুভূতি তৈরি হয় তখন।

বর্ষার শুরুতেই মাঠ থেকে খাল বেয়ে যে বৃষ্টির ঢল নামে, তার উজানে ইছামতীর বুক থেকে ছোট দেশি মাছের দল উঠে আসে নিচু জমিতে। পুঁটি, মলা, ঢ্যালা, টাকি মাছেরা উজানের স্রোত ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোয় মাঠের দিকে। মাঠের পানিতে ওরা ডিম ছাড়বে। কিন্তু মাঠে আর পৌঁছাতে পারে কই! খালের মুখে, মাঠে সরু নালায়, মানুষ ঘুনি-দেউড়ি নামের মাছ ধরা ফাঁদ পেতে রাখে। এসব ফাঁদে সহজেই ঢোকা যায়, কিন্তু বেরোনোর উপায় নেই। তারপরও কিছু মাছ এসব ফাঁকি দিয়ে মাঠে চলে যায়। ওরা ডিম পাড়ে, ছানাপোনার আঁতুড়ঘরও এই মাঠ। শরতের শেষে আবার যখন বৃষ্টির ঢল নামে, আবার যখন মাঠঘাট ডুবে যায়, মাঠের পানি একইভাবে খাল বেয়ে নেমে যায় ইছামতীর পাড়ে। ছোট মাছের পোনারা অনেকটাই সাবালক হয়ে ওঠে তত দিনে। ঢলের স্রোতে গা ভাসিয়ে তারা ইছামতীর ঠিকানায় পাড়ি দিতে চায়। বেশির ভাগই মানুষের হাতে ধরা পড়ে। বাকিরা নদীতে নেমে পড়ে।

বর্ষাকালে যখন মাছ ধরার ধুম পড়ে, সেই ধুমে আমিও অংশ নিই। শিটকি নামের তেকোনা ঠেলা জাল নিয়ে মাঝ ধরি। এ সময় বড় বড় পুঁটি আর ট্যাংরা ধরা পড়ে।

৩

তুমুল বৃষ্টি শুরু হলে আমরা বাবা-মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে পড়ি রাস্তায়। ভিজতে। বৃষ্টিতে ভেজার যে মজা, সেটা আর কিছুর সঙ্গে তুলনা চলে না। তড়বড় করে বৃষ্টি পড়ে। গোড়ালিসমান পানি জমে উঠানে, রাস্তায়। আমরা

বর্ষার ফুল

বর্ষায় ফুলের অভাব নেই। কদম-কেয়া এ সময় ফোটে। পথের দুই পাশে ঝোপঝাড়ে বা বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে কাঠমল্লিকা ফুল ফোটে। গাছ-পাতা বেলির মতোই, গন্ধও বেশ মিষ্টি। তেলাকুচুর সাদা ফুলগুলোও এ সময় ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। বর্ষার সবচেয়ে সুন্দর বুনো ফুল হলো ঝুমকোলতা। পথের পাশে মাটির ওপর কিংবা ফসলের খেতের বেড়ায় ঝুমকোলতা ঝুলে থাকে এ সময়।

বর্ষার সঙ্গে সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক রেইন লিলির। বৃষ্টি না হলে রেইন লিলির দেখা কখনো পাবে না। কাঁঠালিচাঁপা ফুলও এ সময় ফোটে। দেখতে আহামরি নয়। কিন্তু পাকা কাঁঠালের মতো মিষ্টি গন্ধ আছে এর। কামিনী ফুলের গাছগুলো বর্ষায় ফুলে ফুলে সাদা হয়ে ওঠে। কাঠগোলাপ, স্বর্ণচাঁপা ও দোলনচাঁপাও এ সময় ফোটে। তবে গন্ধে বর্ষায় সবাইকে টেক্কা দেয় স্পাইডার লিলি। সাদা মাকড়সার মতো এই ফুলের কড়া মিষ্টি গন্ধ—বিষণ্ন রাগী লোকটার মুখেও হাসি ফুটিয়ে দিতে পারে। আরও কয়েক জাতের লিলি এ সময় ফোটে। শাপলা ও পদ্ম সব সময় ফুটলেও বর্ষার পানিতে টইটম্বুর জলাশয় এদের সৌন্দর্যে বাড়তি মাত্রা যোগ করে।

বর্ষার ফল

বর্ষায় বেশ কিছু বুনো ফল পাকে। বেশ মিষ্টি লাগে। এর স্বাদে গন্ধে-আশশেওড়া সেরা। এর রসালো ফল মুখে স্বাদ জীবনে ভোলার নয়। হামজাম নামে একধরনের বেরিজাতীয় ফলও এ সময় পাকে। জামের মতো কিন্তু মটরদানার মতো ছোট। সবুজ বঁইচি ফল এ সময় পেকে কালো হয়ে ওঠে। কাষ্ঠ, কিন্তু খেতে খারাপ নয়। ফুটকিও এ সময় পাকে। রসে ভরা টক-মিষ্টি এ ফলটা একটা খোলসের মধ্যে বন্দী থাকে। এরা আসলে একধরনের বেরি। ইংরেজি নাম কেপ গুসবেরি। বিদেশে যত দামই থাকুক, আমাদের দেশে এর গাছ স্রেফ আগাছা। বর্ষায় রাখালিয়া ফল পাকে। রাখালের খাবার এই টক-মিষ্টি ফলটা। এই ফলের আরেকটা নাম আছে। ঝুমকোলতার ফল।

বর্ষার আরেকটা মজার ফল হলো ডেউয়া। আমাদের এলাকায় একে বলে মান্দার। কিম্ভূতদর্শন এই ফলের ভেতর কাঁঠালের কোয়ার মতো ছোট ছোট কোয়া থাকে। টক-মিষ্টির মিশেলে এই ফল স্বাদে-গন্ধে অপূর্ব।

ভিজে চলি। বৃষ্টি যখন ধরে আসে, তখন বাড়ি ফিরতে হয়। কিন্তু ছাদে পর্যাপ্ত পানি জমেছে। সরু নালা বেয়ে অত পানি একসঙ্গে বেরোতে পারে না। তাই বৃষ্টি থেমে গেলেও ছাদের সেই নালা থেকে পানি সরু ধারায় আছড়ে পড়ে মাটিতে। আমরা সেই ধারার নিচে দাঁড়াই, বাথরুমের শাওয়ারের মতো বৃষ্টির পানি আমাদের মাথায় পড়ে। সুড়সুড়ি লাগে মাথায়। তারপর নালার ধারা যখন শেষ হয়, তখন ঘরে উঠে আসি। মায়ের বকুনি খেতে হয়। কখনো কখনো জ্বর আসে।

বর্ষাকালে মাঠে খাদ্যসংকট দেখা দেয় শিয়াল-বেজি কিংবা গুইসাপদের। তখন এরা লোকালয়ে চলে আসে। বেজি আর গুইসাপ আসে দিনের বেলায়। শিয়াল আসে রাতে, কখনো কখনো দিনের বেলায়ও লোকচক্ষুর সামনে থেকে মুরগি কিংবা হাঁস নিয়ে পালায়। আমরা লাঠিসোঁটা নিয়ে ওদের ধাওয়া করি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে। পাঠখেত আর গোরস্তানে শিয়ালের বাস। বেজি আর গুইসাপের বাস মাঠজুড়ে—সহজে ওদের পাওয়া যায়!

বর্ষাকালে গ্রামে পথঘাটের দুই পাশ সবুজ হয়ে ওঠে। পথের দুই পাশে ঝোপঝাড়গুলো বৃষ্টির পানি থেকে নাইট্রোজেন শুষে লকলকিয়ে বেড়ে ওঠে। তাই গ্রামের মেঠোপথগুলো বড্ড অচেনা মনে হয় এ সময়। বৃষ্টিস্নাত রাস্তাঘাট বড্ড ভয়ংকর হয়ে ওঠে। একা একা চলতে গেলে গা ছমছম করে।

বৃষ্টির পানিতে মাটিতে যেসব ঝোপঝাড়ের বীজ জমা হয়, সেগুলোও দ্রুত অঙ্কুরিত হতে শুরু করে। বড় বড় গাছের ডালপালা সবুজ পাতায় ছেয়ে যায়। বাগান কিংবা ফসলের খেতের বেড়াগুলো ডগমগে বুনো লতায় ভরে ওঠে।

বর্ষায় ফল পাকে। বুনো ফল, ঘরের ফল দুটোই। এ সময়কার ভ্যাপসা গুমোট আবহাওয়া ফল পাকাতে ওস্তাদ। গাছের পেয়ারাগুলো পাকছে না। জোর একটা বৃষ্টির পরেই দেখা যায় ম্যাজিক। খেজুর পাকে এ সময়, জাম পাকে। গাঁয়ে জাম ও খেজুরের অর্থমূল্য নেই। গাছ যারই হোক, যে কেউ তা পাড়ার অধিকার রাখে। গাছের মালিক দেখলেও কিছু বলেন না। এটা চুরি নয়, প্রথা।

নানাদের কয়েকখানা খেজুরবাগান ছিল। বৃষ্টি হলে গাছি মামা গিয়ে এক কাঁদি ডাঁসা খেজুর এনে ঝুলিয়ে দিতেন রান্নাঘরের দরজায়। তারপর একটা-দুটো করে পাকে, আমরা ছিঁড়ে খাই।

এ সময় কাঁঠাল পাকে। আমার চাচাদের কাঁঠালবাগান ছিল। বড়রা কখন কাঁঠাল পেড়ে আমাদের খাওয়াবেন, সে ভরসায় থাকলে চলে না। আমার প্রায় সমবয়সী দুই ভাই শাহনূর আর ফিন্টু মিলে কাঁঠাল খাওয়ার ফন্দি আঁটি। বেশ বড়সড় একটা কাঁঠাল পেড়ে পুঁতে রাখা হলো বাগানের এক কোণে। ঝোপঝাড়ের আড়ালে। মাটির নিচে রাখলে কাঁঠাল দ্রুত পাকে। তাই এই ফন্দি। কিন্তু অত বড় কাঁঠাল তিন ভাই মিলে খেতে পারব কি না—সে কথা মাথায় আসেনি। আমাদের হিসাব ছিল ২৪ ঘণ্টা। অর্থাৎ পরদিন বিকেলে গিয়ে গর্ত থেকে পাকা কাঁঠাল বের করে খাওয়ার পরিকল্পনা করি। রাতে জোর বৃষ্টি হয়। পরদিন যথাসময়ে সেখানে গিয়ে দেখি গর্তের মুখ খোলা। কাঁঠাল গায়েব! কেউ কি চুরি করল? কাঁঠালের খোসা-বাকল পড়ে আছে। যে খেয়েছে, গুছিয়ে খায়নি। অর্থাৎ মানুষের কাজ নয় এটা। এভাবে কাঁঠাল খাওয়ার বুদ্ধি একমাত্র শিয়ালের



আছে! আমাদের নিজের মতো করে কাঁঠাল খাওয়ার সাধ মিটে যায় সেদিন।

৪

বর্ষার কালো মেঘ দেখে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে...'

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ বছরে বর্ষাকালে পড়েছিলাম কবিতাটা। বৃষ্টির ছড়া থেকে বেরিয়ে তখন আকাশে মেঘ দেখলেই আপন মনে বলে উঠতাম 'ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে'। কিন্তু নিজেই বের হয়ে যেতাম। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, 'ওই ডাকে ধেনু ঘন ঘন ঘন, ধবলীরে আন গোহালে।' এ লাইনটার পেছনে একটা গল্প আছে। গাঁয়ে যাঁরা কখনো বাস করেননি, তাঁরা হয়তো ভাবেন উঠানে বা খোলা কোনো জায়গায় ধবলী নামের একটা গাভি বাঁধা আছে, কবি সেটাকে গোয়ালে নিয়ে আসতে বলছেন। ঘটনা হলো, আমাদেরও একটা গাভি ছিল। সকালে সেটা মাঠে বেঁধে রেখে আসতাম। এমন জায়গায়, যেখানে প্রচুর ঘাস আছে। লম্বা দড়ির মাথায় একটা খুঁটা লাগিয়ে সেটা মাটিতে পোঁতা হয়, মুগুর দিয়ে ঘা মেরে মেরে। দড়ির অন্য প্রান্তে গরু বাঁধা। দড়ি লম্বা, তাই অনেকটা জায়গা ঘুরে ঘুরে ঘাস খেতে পারে। সকালে বেঁধে রেখে আসতাম, সন্ধ্যায় ফিরিয়ে আনা হতো। কিন্তু বর্ষাকালে দুপুরের পরেই যদি মেঘ করে, গরু ভাবে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাড়িতে হয়তো তার বাছুর বাঁধা। তাই ঘন ঘন ডাকতে থাকে। সেই ডাক শুনে অথবা না শুনেই আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখলেই গরু আনতে ছুটে যেতাম মাঠে। ঠিক এমন দৃশ্য গোটা বাংলার ঘরে ঘরে চিত্রিত হতো এবং হয় এখনো। এ দৃশ্যটাই কবি ওই দুই লাইনে আঁকার চেষ্টা করেছেন।

বর্ষায় স্কুলমাঠে ফুটবলের আসর জমে। হাট লাগোয়া মাঠ, তাই দর্শকের অভাব হয় না। বৃষ্টির মাঝখানে একটু ফাঁক পেলেই ফুটবল খেলা জমে ওঠে। আমরা বাড়ি কিংবা দূরের মাঠ থেকেও 'গোল' হওয়ার পর দর্শকদের উল্লাসধ্বনি শুনতে পাই। হাট শেষে গাঁয়ের লোকেরা বাড়ি ফেরে, কেউ কাঁঠাল হাতে, কেউ-বা দড়িতে ইলিশ ঝুলিয়ে। শক্ত-আঠালো কাদায় প্যাচপেচে রাস্তা। জুতা-স্যান্ডেল বগলে নিয়ে হাটুরে লোকেরা সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে কাদার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে।

৫

আষাঢ়-শ্রাবণে অনেক দিনই মাঠে আটকা পড়েছি। গাঁয়ের আমবাগানগুলোতে ছোট্ট কুঁড়েঘর থাকে। রাতে পাহারা দেওয়ার জন্য। আম ফুরালেও কুঁড়েঘর থাকে সারা বছরই। কত বাদলামুখর দিনে মাঠে আটকে পড়ে ওসব কুঁড়েঘরে কাটিয়েছি। বৃষ্টির পর ভেজা গাছ থেকে টুপটুপ করে পনির ফোঁটা পড়ে। একটা নির্দিষ্ট সময় পর নির্দিষ্ট ছন্দে। এই এক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য আজও ঘর থেকে পালাতে রাজি। তারপর ধরো, পদ্ম কিংবা কচুপাতার কথা। সারা দিন বৃষ্টি হবে, কিন্তু পদ্ম কিংবা কচুপাতার গা একটু ভিজবে না। এক ফোঁটা পানি পাতার ঠিক মাঝখানে জমে থাকবে হীরার টুকরার মতো। কিন্তু ধরতে গেলেই ছিটকে মাটিতে পড়ে যাবে। এই দৃশ্য বর্ষাকাল ছাড়া আর কখন দেখবে!

এখন অনেকেই বৃষ্টিবিলাসের জন্য বর্ষাকালে কোনো ইকো রিসোর্টে গিয়ে দিন কাটিয়ে আসে। শহুরে বাবুদের জন্য এই বৃষ্টিবিলাস বেশ সুখের। কিন্তু গাঁয়ের মানুষেরা বৃষ্টিবিলাসে অভ্যস্ত, তাই তারা অত কিছু লক্ষ করে না। বৃষ্টির ছন্দে মাতাল হয় কেবল স্বপ্নবান কিছু কিশোর, যারা বিভূতিভূষণ, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ কিংবা জসীমউদ্‌দীনের মতো রোমান্টিসিজমে আক্রান্ত।

নব্বইয়ের দশকের সেই কিশোরেরা এখন মাঝবয়সী, তাঁদের বেশির ভাগই গ্রামে থাকেন। আমার মতো কিছু অভাগা স্বপ্নপূরণের আশায় শহরে পড়ে আছি, বর্ষা আমাদের জসীমউদ্‌দীনের মতোই নস্টালজিক করে, তাই তাঁর কবিতা থেকে ধার করে বৃষ্টির দিনে আওড়ে যাই—

আজিকে বাহিরে শুধু ক্রন্দন ছল ছল জলধারে,
বেণু-বনে বায়ু নাড়ে এলোকেশ, মন যেন চায় কারে।

বিজ্ঞান উৎসব
বিজ্ঞানে বিকাশ



বিজ্ঞানী হতে চাও?
প্রজেক্ট বানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দাও

বিজ্ঞানচিন্তা bigganchinta.com | বিকাশ

দেশজুড়ে শুরু হচ্ছে বিজ্ঞান উৎসব
শিগগিরই নিবন্ধন শুরু হবে তোমার বিভাগেও!
ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও সিলেটে

উৎসবে থাকছে বিজ্ঞান প্রজেক্ট ও কুইজ প্রতিযোগিতা,
রোবট প্রদর্শনী, ম্যাজিক, প্রশ্নোত্তর পর্বসহ আরও অনেক মজার আয়োজন

জাতীয় পর্বে বিজ্ঞান প্রজেক্ট বিজয়ীদের জন্য থাকছে ল্যাপটপ এবং কুইজ বিজয়ীদের জন্য ট্যাবসহ আকর্ষণীয় পুরস্কার



বিজ্ঞান প্রজেক্ট প্রদর্শনী — ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারবে

বিজ্ঞান কুইজ — নিম্ন মাধ্যমিক (ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি)
মাধ্যমিক (নবম-দশম শ্রেণি)

এখন চলছে ঢাকা অঞ্চলের নিবন্ধন
ঢাকা অঞ্চলের নিবন্ধনের শেষ তারিখ : ২০ আগস্ট ২০২৫, বুধবার
নিবন্ধনের ঠিকানা : প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
মুঠোফোন: ০১৭০৮-১৬৮৭৯০
নিবন্ধন চলবে প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত

চোখ রাখো : বিজ্ঞানচিন্তার ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজ,
বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব ফেসবুক পেজ এবং প্রথম আলোয়

অন্যরকম প্রজন্ম উৎসব

অন্যরকম জুলাই মাস

গত বছরের জুলাই মাসটার কথা নিশ্চয়ই তোমরা ভোলো নি, তাই না? ভীষণ অন্যরকম ছিল সময়টা। দেশের মানুষ একতাবদ্ধ হয়েছিল অন্যায় আর অপশাসনের বিরুদ্ধে। এর জন্যে অবশ্য মূল্যও দিতে হয়েছে অনেক। অনেক প্রাণ গিয়েছে, অনেক রক্ত ঝরেছে। দেশের মধ্যেও ঘটেছে অনেক রদবদল। অস্থিরতা বিশৃঙ্খলা গ্রাস করেছে আমাদের।

তারপরেও তো ঘুরে দাঁড়াতে হয়। যত কিছুই ঘটুক, এই দেশটার ওপর তোমাদের চেয়ে বেশি দাবী আর কারো নেই। তোমরা ছাড়া আর কেউ দেশটাকে ভালোভাবে গড়তে পারবে না। আমরা সবসময় চেয়েছি তোমাদের আত্মবিশ্বাসী আর কৌতূহলী করে তুলতে। পরিস্থিতি যেমনই হোক তোমরা যেন নতুন নতুন চিন্তা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারো,সেজন্যে আমরা সবসময় নতুন নতুন আয়োজনে সাজাই আমাদের অন্যরকম প্রজন্ম গ্রুপটাকে। জুলাই মাসেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

গত জুলাই মাসে অন্যরকম প্রজন্ম গ্রুপে চলেছিল "সায়েন্স টপার" ক্যাম্পেইন। এই ক্যাম্পেইনে আমরা যা করতে বলেছিলাম-

- বিজ্ঞানবাক্স থেকে বা তোমার পছন্দমতো যেকোনো সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট করো।
- বর্ণনা সহ ভিডিও পোস্ট করো অন্যরকম প্রজন্ম গ্রুপে।
- শুধুমাত্র এক্সপেরিমেন্টটা করে দেখানোর পাশাপাশি কী শিখলে আর এই শিক্ষা কীভাবে কাজে লাগানো যাবে তাও বলতে পারো।



অনেক চমৎকার সব ভিডিও পেয়েছিলাম আমরা। শীঘ্রই আমরা বিজয়ী চারজনের নাম ঘোষণা করব। তাদের নাম ও ছবি দেখতে পারবে আগামী মাসের কিশোর আলোতে। এর মধ্যে অন্যরকম প্রজন্ম গ্রুপে শুরু হবে নতুন কোনো আয়োজন। তোমাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা আর সৃজনশীলতাকে বৃদ্ধি করার জন্যে এই আয়োজনগুলি চলতেই থাকবে। সাথে থেকো আমাদের।

এবার দেখে নাও সায়েন্স টপার ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণকারীদের নাম ও ছবি।


অনুপম


অবনী ও ওয়াসফি


অরণি এবং অতশী


অরণি


অর্ঘ্য


আয়াত


ঋষভ


ওয়াফি


তমান


তানভীর


ত্বহা


দৃশ্য


মুনতাসির


রাইফ


রাফান


রাফি


রামিন


রৌদ্র


শিশির


সাদমান


সাদিক


সাবিদ


সাহিল


সানভিয়া


হাসিব


হিশাম


হৃদি


মারিয়াম


আরশ

বিজ্ঞানবাক্স পাওয়া যাচ্ছে

স্বপ্নবন | meena bazar bringing freshness to your life | রকমারি.com www.rokomari.com

এছাড়াও নিকটস্থ লাইব্রেরিতে এবং

bigganbaksho.com

অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্স

তুমি কতটা পরিশ্রমী

আহমাদ মুদ্দাসসের

তোমাদের প্রায় সবার অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা শেষ। রেজাল্টও হয়ে গেছে। কিন্তু সবাই সমান রেজাল্ট করোনি। তোমার ক্লাসের সবাই পরীক্ষার জন্য একই সময় ধরে প্রস্তুতি নিয়েছে। এমনকি সবাইকে পরীক্ষার জন্য একই সময় দেওয়া হয়েছে। তবু পরীক্ষায় কেউ পেয়েছে 'এ' গ্রেড। তোমার কোনো বন্ধু পেয়েছে 'বি' গ্রেড। এখন রেজাল্ট দেখে তুমি কাকে পরিশ্রমী বলবে? আমার তো মনে হয় বেশির ভাগ মানুষই 'এ' গ্রেড পাওয়া ছাত্রকে কঠোর পরিশ্রমী বলবে। আমরা স্কুলে ভাবসম্প্রসারণ করেছি, পরিশ্রম সাফল্যের চাবিকাঠি। সব সময় পরিশ্রম করলেই যে সফল হওয়া যায়, তা কিন্তু নয়। অন্যভাবে বললে, পরিশ্রমের উদ্দেশ্য শুধু সফল হওয়া নয়। তবে মনে রাখবে, জীবনে সফল হতে হলে পরিশ্রমের বিকল্প নেই। পরিশ্রম একটা অভ্যাস। নিজের জীবনে এ অভ্যাসটা তোমার আছে কি না, এটাই আমরা দেখব। নিচের ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ঝটপট জেনে নাও তুমি কতটা পরিশ্রমী!

১. তুমি দোতলায় উঠবে। সিঁড়ি আছে, লিফটও আছে। লিফটে তিনজন উঠেছে, একজন যাবে চারতলায়, একজন ছয়তলায়, আরেকজন এগারো তলায়। তুমি কী করবে?

ক. লিফট ব্যবহার করব। লিফট থাকতে কষ্ট করে সিঁড়ি দিয়ে উঠব কেন?

খ. হাতে সময় থাকলে বা শরীরচর্চার প্রয়োজন মনে হলে সিঁড়ি ব্যবহার করব।

গ. সব সময় সিঁড়ি দিয়েই উঠব, যদি না কোনো জরুরি কাজ থাকে বা ভারী কিছু বহন করতে হয়।

২. তুমি বাসায় আছ। দোকান থেকে একটা কিছু আনা দরকার। তুমি কী করবে?

ক. চট করে নিজেই বেরিয়ে দোকান থেকে জিনিসটা নিয়ে আসব।

খ. বাবা বা মাকে ফোন করে বলব জিনিসটা নিয়ে আসতে। আমি এখন অন্য কাজ করছি।

গ. যদি খুব জরুরি না হয়, তাহলে পরে কেউ গেলে আনতে বলব।

৩. স্কুল বা কোচিং থেকে বাসায় ফেরার সময় তুমি কোন পদ্ধতি পছন্দ করো?

ক. হেঁটে ফিরতে পছন্দ করি। এতে শরীরচর্চা হয় এবং বাইরের পরিবেশ উপভোগ করা যায়।

খ. নির্ভর করে দূরত্বের ওপর। কাছাকাছি হলে হেঁটে আসি, দূর হলে যানবাহন ব্যবহার করি। আমার নীতি আছে। হাতে সময় থাকলে আমি ৩০ টাকা রিকশাভাড়ার দূরত্বে সব সময় হেঁটে চলাচল করি। এর বেশি দূর হলে রিকশায় যাই।

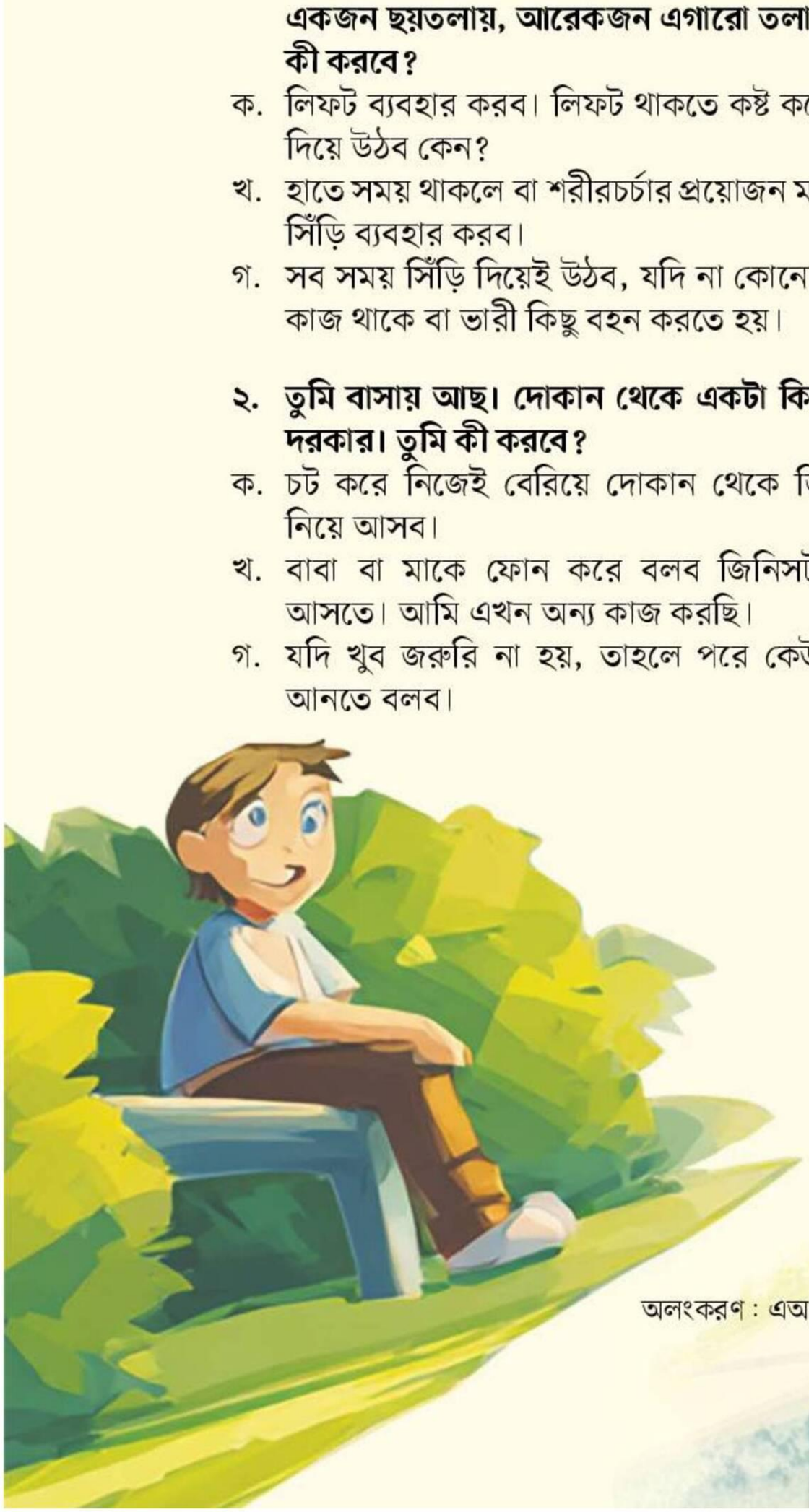
গ. বাস বা রিকশায় ফিরতে পছন্দ করি। কারণ, হেঁটে ফিরলে ক্লান্তি লাগে।

৪. অবসর সময়ে তুমি কোন ধরনের খেলা খেলতে পছন্দ করো?

ক. বাইরে গিয়ে ক্রিকেট, ফুটবল, দৌড়ানো বা সাইক্লিংয়ের মতো খেলা পছন্দ করি, যেখানে বেশ ঘাম ঝরে।

খ. মাঝেমধ্যে ঘরে বসে খেলা, আবার মাঝেমধ্যে বাইরে গিয়ে খেলা, দুটিই আমার পছন্দ।

গ. ঘরে বসে ভিডিও গেম, বোর্ড গেম বা মোবাইল গেম খেলতে ভালো লাগে।





অলংকরণ : এআই আর্ট

৫. তুমি আর তোমার বন্ধু কোথাও যাচ্ছ। বন্ধুর কাছে দুটি ভারী ব্যাগ আছে। তুমি কী করবে?

ক. কোনো কিছু না ভেবেই বন্ধুর একটা ব্যাগ আমি নিয়ে নেব, যাতে ওর কষ্ট কম হয়।

খ. ওকে জিজ্ঞাসা করব, ওর সাহায্য লাগবে কি না। লাগলে সাহায্য করব।

গ. ওকে বলব, 'আহ্, এত ভারী জিনিস কেন নিলে?' কিন্তু আমি নিজে ধরব না।

৬. তোমার স্কুলের কোনো একটি কাজ বা অ্যাসাইনমেন্ট, যেখানে অনেক বেশি সময় ও মনোযোগ দিতে হবে। এমন কাজ হাতে এলে তুমি কী করো?

ক. কাজটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত লেগে থাকি, যত রাতই হোক না কেন।

খ. কাজটি শুরু করি, কিন্তু ক্লান্তি লাগলে বা কঠিন মনে হলে পরে করার জন্য রেখে দিই। বিছানায় একটু গড়িয়ে নিই, একটু রিলস দেখি, একটু খাই, একটু গল্প করি।

গ. কাজটি শুরু করি। যদি দেখি অনেক বেশি কঠিন বা অনেক সময় লাগবে, তাহলে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়ার আগের রাতের জন্য রেখে দিই।

৭. কোনো কাজে ব্যর্থ হলে তোমার প্রতিক্রিয়া কেমন হয়?

ক. কাজে নামলে ভুল হতেই পারে। ভুল করলে একদম দমে যাই না, নতুন করে আবার শুরু করি। চেষ্টা করতে থাকি যতক্ষণ না সফল হই।

খ. কাজে ভুল হলে আমার হতাশ লাগে। কিছুদিন পর আবার চেষ্টা করব বলে রেখে দিই।

গ. হতাশ হয়ে কাজটি ছেড়ে দিই। সহজ কোনো উপায় খুঁজি।

৮. সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার ক্ষেত্রে তোমার অভ্যাস কেমন?

ক. ঘুম থেকে আমি নির্দিষ্ট সময়ে উঠি। সময় হলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ি এবং স্কুলের জন্য তৈরি হই।

খ. অ্যালার্ম বাজার পর বা আব্বু-আম্মু ডাকার পর আমি গড়িমসি করি। অ্যালার্মকে কয়েকবার 'স্নুজ' করি, মাকে এই উঠছি বলে একটু ঝিমিয়ে নিই। তারপর ধীরে ধীরে উঠি। আসলে ঘুম থেকে ওঠার এত তাড়া নেই।

গ. আমার ঘুম যখন ভাঙে, যখন ভালো লাগে, তখন উঠি।

৯. ছুটির দিনগুলোতে তুমি কোথায় ঘুরতে পছন্দ করবে?

ক. পাহাড় বেয়ে ঝরনা দেখতে যাব। হাইকিং করতে আমার খুব ভালো লাগে। দূরে কোথাও হেঁটে যেতে আমার আপত্তি নেই।

খ. ঝামেলা করে কঠিন রাস্তায় চলাচলের তুলনায় পার্কে ঘুরতে যেতে আমি পছন্দ করি।

গ. হাইকিং বা পার্ক আমার পছন্দ নয়। রেস্টুরেন্টে বা কফিশপে নিজের মতো সময় কাটাতে পছন্দ করি।

১০. তোমার রুম গোছানো বা নিজের কাজগুলো সময়মতো শেষ করার ক্ষেত্রে তুমি কোনটি বেছে নাও?

ক. প্রতিদিনের কাজ নিয়মিত করি এবং রুম সব সময় পরিপাটি রাখি।

খ. যখন মনমেজাজ ভালো থাকে, তখন কাজ করি বা রুম গোছাই।

গ. কাজগুলো জমিয়ে রাখি। শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়া করে শেষ করি। আমার রুম এলোমেলো থাকে। কারণ, আমি আমার মতো করে থাকতে পছন্দ করি।

নম্বর মিলিয়ে নাও :

১. ক. ১০ খ. ৫ গ. ০
২. ক. ১০ খ. ৫ গ. ০
৩. ক. ১০ খ. ৫ গ. ০
৪. ক. ১০ খ. ৫ গ. ০
৫. ক. ১০ খ. ৫ গ. ০
৬. ক. ১০ খ. ৫ গ. ০
৭. ক. ১০ খ. ৫ গ. ০
৮. ক. ১০ খ. ৫ গ. ০
৯. ক. ১০ খ. ৫ গ. ০
১০. ক. ১০ খ. ৫ গ. ০

তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে :

০-৪৫ : একটু বেশিই আরামপ্রিয়

তুমি সম্ভবত আরামপ্রিয় জীবন পছন্দ করো। পরিশ্রম করতে চাও না। কাজগুলো যতটা সম্ভব সহজভাবে শেষ করতে চাও। তবে মনে রেখো, জীবনে কিছু অর্জন করতে হলে আরাম ছেড়ে পরিশ্রমী হতে হয়। মাঝেমধ্যে ছোট কিছু কাজ নিজের হাতে করে দেখতে পারো। নিজে পরিশ্রম করে কিছু করলে দেখবে তোমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে।

৪৬-৭৫ : তুমি পরিমিত পরিশ্রমী

তুমি দেখি সব দিক মিলিয়ে চলো। কখন পরিশ্রম করতে হবে আর কখন বিশ্রাম করা জরুরি নয়, তা তুমি ভালোই বোঝো। তবে মাঝেমধ্যে তুমি অলসতা করো। নিজের কাজ সময়মতো শেষ করতে পারা কিন্তু একটা সাফল্য। কিন্তু একটু চাপ নিয়ে, একটু পরিশ্রম করে না করলে কাজে সব সময় সাফল্য আসে না। পরিশ্রমের অভ্যাসটা একটু বাড়ালে তোমাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

৭৬-১০০ : তুমি সুপার পরিশ্রমী!

তোমার মধ্যে প্রচুর পরিশ্রম করার ক্ষমতা আছে। তুমি চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসো। যেকোনো কাজ শেষ না করা পর্যন্ত লেগে থাকো তুমি। তোমার এই দৃঢ়তা এবং পরিশ্রমী মনোভাব খুবই প্রশংসার যোগ্য। তুমি নিজের লক্ষ্য পূরণে খুব আগ্রহী। সব ধরনের ত্যাগ করতে তুমি প্রস্তুত। তবে অতিরিক্ত পরিশ্রম যেন তোমাকে ক্লান্ত না করে ফেলে, সেদিকেও খেয়াল রেখো। মাঝেমধ্যে একটু বিশ্রাম নিয়ো। এতে তোমার উদ্যম আরও বেড়ে যাবে।

*এ কুইজ বৈজ্ঞানিক কিছু নয়। মজার ছলে নিজের ব্যাপারে ধারণা তৈরির জন্য এটি বানানো হয়েছে।

রকমারি.com

তোমার মতো কিশোররা যেসব বই পড়ে বদলে যাচ্ছে!

নিজেকে বদলে দিতে বই-ই হতে পারে সবচেয়ে কাছের বন্ধু। আজকে আমরা জানবো এমন কিছু টিনেজার সম্পর্কে- যারা বিশ্বজুড়ে নিজেদের কাজ দিয়ে সবাইকে অবাক করেছে। কিন্তু জানো কি, তাদের এই পথচলার পেছনে অনুপ্রেরণা ছিল কিছু বই।

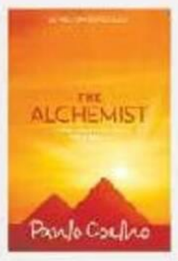
১. গীতাঞ্জলি রাও

দেশ: যুক্তরাষ্ট্র
যে কাজের জন্য পরিচিত: মাত্র ১৫ বছর বয়সে গীতাঞ্জলি **'Kid of the Year'** খেতাব পেয়েছে। সে পানি বিশুদ্ধকরণ ডিভাইস থেকে শুরু করে সাইবার বুলিং রোধে অ্যাপ তৈরি করেছে।
প্রিয় বই: "Wonder" by R. J. Palacio
কেন পছন্দ: বইটি তাকে সহানুভূতিশীল হতে শিখিয়েছে, আর মানুষকে ভেতর থেকে দেখার গুরুত্ব বুঝিয়েছে।



২. মালালা ইউসুফজাই

দেশ: পাকিস্তান
যে কাজের জন্য পরিচিত: নারীশিক্ষার জন্য লড়াই করে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ নোবেল বিজয়ী হন।
প্রিয় বই: "The Alchemist" by Paulo Coelho
কেন পছন্দ: তাঁর ভাষায়, "এই বই আমাকে শিখিয়েছে কীভাবে নিজের স্বপ্নকে অনুসরণ করতে হয়, আর নিজের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হতে।"



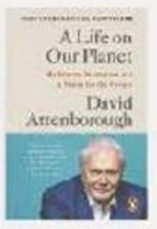
৩. সামায়রা মেহতা

দেশ: যুক্তরাষ্ট্র
যে কাজের জন্য পরিচিত: ১১ বছর বয়সে **'CoderBunnyz'** নামে বোর্ড গেম বানিয়ে কিডস কোডিংকে জনপ্রিয় করে তোলে।
প্রিয় বই: "Good Night Stories for Rebel Girls"
কেন পছন্দ: বইটিতে সাহসী নারীদের গল্প পড়ে সে নিজেকে সাহসী মনে করতে শুরু করে।



৪. মাইলস পিটার নেলসন (Miles Peter Nelson)

দেশ: দক্ষিণ আফ্রিকা
যে কাজের জন্য পরিচিত: সমুদ্র দূষণ নিয়ে কাজ করে, প্লাস্টিক বর্জ্য কমাতে স্কুল পর্যায়ে ক্যাম্পেইন করে।
প্রিয় বই: "A Life on Our Planet" by David Attenborough
কেন পছন্দ: বইটি তাকে পৃথিবীর প্রকৃতির জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছে।



৫. গ্রেটা থানবার্গ

দেশ: সুইডেন
যে কাজের জন্য পরিচিত: জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিশ্বজুড়ে আন্দোলন
প্রিয় বই: "Silent Spring" by Rachel Carson
কেন পছন্দ: বইটি তাকে পরিবেশগত সচেতনতা ও পরিবর্তনের শক্তি শিখিয়েছে।



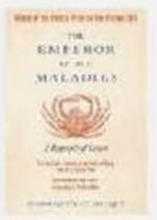
৬. মার্লি ডায়াস

দেশ: যুক্তরাষ্ট্র
যে কাজের জন্য পরিচিত: **#1000BlackGirlBooks** ক্যাম্পেইনের উদ্যোক্তা
প্রিয় বই: "Brown Girl Dreaming" by Jacqueline Woodson
কেন পছন্দ: নিজের পরিচয় নিয়ে গর্ববোধ করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে এ বইটি।



৭. জ্যাক আন্দ্রেকা

দেশ: যুক্তরাষ্ট্র
যে কাজের জন্য পরিচিত: ১৫ বছর বয়সে ক্যানসার শনাক্তের সাশ্রয়ী প্রযুক্তি আবিষ্কার
প্রিয় বই: "The Emperor of All Maladies" by Siddhartha Mukherjee
কেন পছন্দ: চিকিৎসা বিজ্ঞানে কৌতূহল মেটাতে এই বইটি তাঁকে সাহায্য করেছে।



৮. আনা দুবনি

দেশ: যুক্তরাষ্ট্র
যে কাজের জন্য পরিচিত: সমুদ্র দূষণ শনাক্তকরণ রোবট বানিয়ে
প্রিয় বই: "The Hunger Games" by Suzanne Collins
কেন পছন্দ: অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস পেয়েছে এই বইটি পড়ে।



৯. জো হুইটন

দেশ: : যুক্তরাজ্য
যে কাজের জন্য পরিচিত: মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা তৈরি
প্রিয় বই: "It's Kind of a Funny Story" by Ned Vizzini
কেন পছন্দ: মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব বুঝিয়েছে এ বইটি।



এখন প্রশ্ন হলো- তুমি কী পড়ছো? তোমার মত কিশোররাও যদি এমন বই পড়ে অনুপ্রাণিত হতে পারে, তবে তুমি পারবে না কেন?

..রকমারি সাজেস্ট করছে..

কিশোরদের জন্য অনুপ্রেরণামূলক জীবনী-

বিজ্ঞানের কল্পলোকে নিয়ে যাবে এই সায়েন্স ফিকশনগুলো-

যারা গণিত ভালবাসো, তাদের জন্য বইয়ের তালিকা-

QR কোড স্ক্যান করো, নিজের জীবন বদলে দেওয়া বইটা খুঁজে বের করো

সাফল্যের পথটা শুরু হয় শেখা থেকে, আর শেখার সবচেয়ে সহজ ও বিশ্বস্ত বন্ধু হলো বই। রকমারিতে আছে হাজারো বই- যা তোমার জানার ক্ষুধা মেটাবে ঘরে বসেই।

দেখে নাও গতমাসের বেস্ট সেলার শিশু-কিশোর বইয়ের তালিকা-

বুক আইডি	বই- লেখক	মুদ্রিত মূল্য
৪৪৯৪৫২	Chotoder English Therapy/ Saiful Islam	৫৯৯
৪৬৯৩৮	তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১/১- রকিব হাসান	১৬২
৪৭৮৬৬৪	কিশোর আলো (জুলাই - ২০২৫)/ কিশোর আলো	৫০
১৩৩৬	শূন্য/ হুমায়ূন আহমেদ	১৮০
১১৯৩৪৯	ইসলামী গল্প সিরিজ-১/ মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ	১২০
৪৭৯৮৬৫	নোমান ১ আবারো/ অন্তিক মাহমুদ	২৯৯
৩৪৪১৫৮	Kids Spoken English/ Nazrul Islam Sir	৪০০
৪৭৫৯৪৫	কিশোর আলো (জুন - ২০২৫)/ কিশোর আলো	৫০
৩৪৬৬৮৯	চাঁদের পাহাড়/ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০
৩৯০৮১১	Kids Vocabulary/ Nazrul Islam Sir	৩২০
১৩১৯	ছোটদের সেরা গল্প/ হুমায়ূন আহমেদ	২৫০
৪৪৬২২২	ভুল/ অন্তিক মাহমুদ	৮০০
১১৯৩৫০	ইসলামী গল্প সিরিজ-২/ মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ	১২০
২১৫৮৪৭	চাঁদের পাহাড়/ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০
১৩৭৭৯	তিন গোয়েন্দা ভলিউম ১/২- রকিব হাসান	১৪১
৩৪৬৩৪৬	মিসমিদের কবচ/ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫০
৩৬৭৩৪৮	আবার যখের ধন/ হেমেন্দ্রকুমার রায়	২৫০
২০৩০০৭	চাঁদের পাহাড়/ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫০
১১০২৩৯	জুনিয়র: বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড/ মোস্তফা কামাল বিপব	৪৪০
২৪৪৬৫৬	ছোটদের আদব সিরিজ/ হোসাইন-এ-তানভীর	৮৫০
৪১০৬২৭	হিমালয়ের ভয়ঙ্কর/ হেমেন্দ্রকুমার রায়	১৫০
৪১০৬২৯	সূর্যনগরীর গুপ্তধন/ হেমেন্দ্রকুমার রায়	১৮০
২২১৯১৬	English Shikhbo Bangla Diye (Book 1-3)/ Saifur Rahman Khan	৩৬০
৪৭৫১৩৯	ষোলো : ৯ম সংখ্যা/ ষোলো টীম	৫০
১৭৭০৫৩	স্টুডেন্ট হ্যাকস/ আয়মান সাদিক	৩৪০
১৩০৬	বোতল ভূত/ হুমায়ূন আহমেদ	১৫০
১৯০৭৯১	নীতিকথার গল্প/ সায়মন জিসান	২০০
১৯৫৭৫৭	চল/ অন্তিক মাহমুদ	৩২০
১১৯৩৫১	ইসলামী গল্প সিরিজ-৩/ মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ	১২০
১১৯৩৫২	ইসলামী গল্প সিরিজ-৪/ মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ	১২০
৪৭৬৮৭	তিন গোয়েন্দা ভলিউম ২/১- রকিব হাসান	১৩৭
৩৫২৬৬৩	যকের ধন/ হেমেন্দ্রকুমার রায়	২৫০
২৮২৬৫৩	প্যারাহীন/ অন্তিক মাহমুদ	৩৪০
৩৫৮৬৬৭	ছোটদের নবী রাসূলের গল্প/ মাওলানা মুনীরুল ইসলাম	১২০
১৩৭৬৭১	ছোটদের আল কুরআনের গল্প/ ইকবাল কবীর মোহন	৩৮০
৩৪৯৮৩১	সময়ের মূল্য/ প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম	১২০
১৫৫৯০০	রিচার্জ ইয়োর ডাউন ব্যাটারি/ ঝংকার মাহবুব	৩০০
৩৭৬০৩২	ছোটদের নবি-রাসূল সিরিজ খন্ড : ৬/ হোসাইন-এ-তানভীর	৮৫০
৩৯৮৫৮	সাইমুম সিরিজ ১ : অপারেশন তেলআবিব ১/ আবুল আসাদ	৭০
৫৭৮৭৫	তিন গোয়েন্দা ভলিউম ২/২- রকিব হাসান	১০৯
১৫৪১৪১	জলাভূমির আতঙ্ক/ আলী ইমাম	৭০
১১৯৩৫৩	ইসলামী গল্প সিরিজ-৫/ মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ	১২০
১৫৮৬১৬	অঙ্ক ভাইয়া/ চমক হাসান	৪০০
৫৭৮৪৭	তিন গোয়েন্দা ভলিউম ৩/১- রকিব হাসান	১৫৮
২৪৪৬৫৫	ছোটদের আখলাক সিরিজ/ হোসাইন-এ-তানভীর	৮৫০
২১২২২৯	গণিতের জেমস বন্ড/ মোস্তাসিন পাহলভী	৪০০
৯৫৩	দ্বিতীয় মানব/ হুমায়ূন আহমেদ	২০০
৩৮৭৯০৭	ভূতের স্কুল/ সাব্বির আহমেদ সুবীর	১০০
৪৫৯৮৫৯	প্যারাহীন ৪/ অন্তিক মাহমুদ	৩৪০
৫৭৭১২	তিন গোয়েন্দা ভলিউম ৩/২- রকিব হাসান	১৯৬
১৫৪৭৭৩	হ য ব র ল/ সুকুমার রায়	১০০
৩৯৬৯১৮	মহানবি (স) এর অলৌকিক ঘটনাবলী/ ড. মুহাম্মদ আরিফুর রহমান	১১০
২০৬৪৭৫	বাল্যশিক্ষা/ রামসুন্দর বসাক	৪০
১৫২৩০২	শিশু আকীদা সিরিজ ১ থেকে ১০ খন্ড/ মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ	৩৫০
১৭৭৪৩৪	গণিতের স্বপ্নযাত্রা-১: আর্ট অব প্রবলেম সলভিং/ আহমেদ জাওয়াদ চৌধুরী	৫০০
৩৯৭৯০	সাইমুম সিরিজ ২ : অপারেশন তেলআবিব ২/ আবুল আসাদ	৭০

রকমারিতে থাকা শিশুকিশোর ক্যাটাগরির বইগুলো দেখতে

স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার বই সংগ্রহ করতে স্ক্যান কর

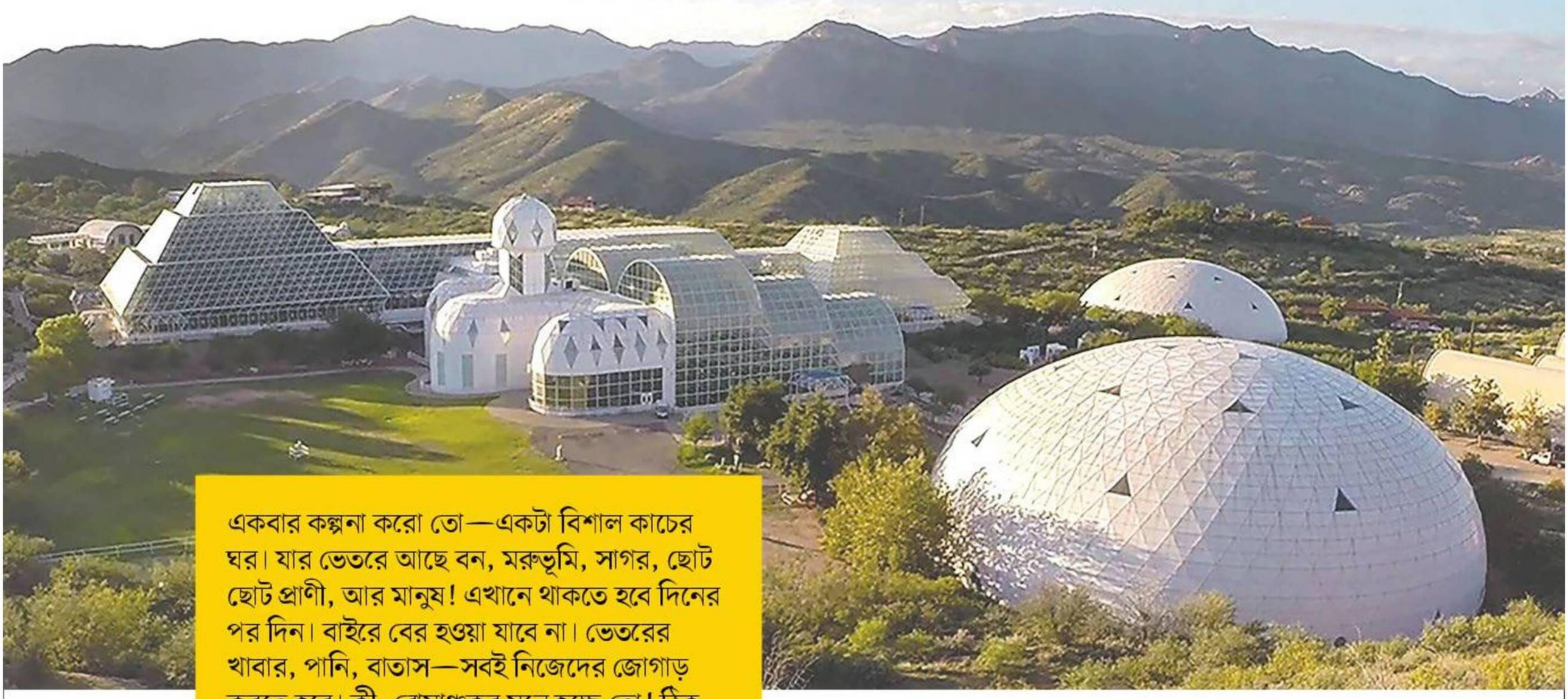
[KIAROK25] প্রোমোকোড ব্যবহার করে বই অর্ডারে বুঝে নাও ৫% এক্সট্রা ছাড়!

রকমারি.com

- পণ্য হাতে পেয়ে মূল্য পরিশোধ করুন
- যেকোন সমস্যায় হ্যাসি রিটার্ন সুবিধা
- যা কিছু দরকারি সাথে আছে রকমারি

পৃথিবীর মতো আরেকটা পৃথিবী!

সুজন সুপান্থ



একবার কল্পনা করো তো—একটা বিশাল কাচের ঘর। যার ভেতরে আছে বন, মরুভূমি, সাগর, ছোট ছোট প্রাণী, আর মানুষ! এখানে থাকতে হবে দিনের পর দিন। বাইরে বের হওয়া যাবে না। ভেতরের খাবার, পানি, বাতাস—সবই নিজেদের জোগাড় করতে হবে। কী, রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে তো! ঠিক এমনই এক রোমাঞ্চকর পরীক্ষা হয়েছিল অনেক বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা মরুভূমিতে। এই পরীক্ষার নাম বায়োস্ফিয়ার ২।

বিশাল এই কাচের ঘরটা বানানো হয়েছিল পৃথিবীর আদলে। পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংস্করণ। ভেতরে যেন সবকিছু পৃথিবীর মতোই কাজ করে। এই ঘরের নাম ছিল বায়োস্ফিয়ার ২। কারণ, আমাদের আসল পৃথিবীকে বলা হয় বায়োস্ফিয়ার ১। বিজ্ঞানীরা আসলে এই ঘর বানিয়ে বুঝতে চেয়েছিলেন—পৃথিবীর বাইরে, যেমন মঙ্গল বা চাঁদে মানুষ কি এমন ঘর বানিয়ে থাকতে পারবে?

যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা মরুভূমিতে পৃথিবীর আদলে বায়োস্ফিয়ার ২
ছবি : অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

কৃত্রিম পৃথিবী

১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকে আটজন বিজ্ঞানী পৃথিবীর আদলে কাচঘেরা বায়োস্ফিয়ার ২ নির্মাণ করেন। তাঁদের সেই অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কার ভবিষ্যতের মহাকাশ নয় বরং পৃথিবী রক্ষার পাঠ দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনার মরুভূমিতে তিন একর জায়গাজুড়ে পৃথিবীর আদলে বায়োস্ফিয়ার ২-এ আছে বিস্তৃত কাচের পিরামিড, গম্বুজ এবং টাওয়ারের বিশাল জটিল গঠনটি ঘিরে আছে এক উষ্ণমণ্ডলীয় বন, যার আছে ২৫ ফুট উঁচু এক জলপ্রপাত। এ ছাড়া আছে সাভানা, কুয়াশাচ্ছন্ন মরুভূমি, ম্যানগ্রোভ ভরা জলাভূমি ও একটি কৃত্রিম মহাসাগর—যেটি একটি অলিম্পিক সাঁতারের পুলের চেয়েও বড় এবং তাতে জীবন্ত প্রবালপ্রাচীরও আছে। উদ্দেশ্য ছিল মহাকাশে মানুষ বসতি গড়বে—তার আগে পরীক্ষা চালানো।

এই নির্জন প্রান্তর ছিল এক ভবিষ্যৎধর্মী গবেষণার আদর্শ পটভূমি। আটজন মানুষ কাচঘেরা এই বিশাল স্থাপনায় স্বেচ্ছায় নিজেদের দুই বছরের জন্য বাইরের পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। তাঁরা নিজেরাই ফসল ফলিয়ে খেতেন, নিজেদের বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করতেন এবং অক্সিজেন উৎপাদক গাছের পরিচর্যা করতেন।

তবে মানুষের জীবন টিকিয়ে রাখার দিক থেকে এই পরীক্ষা তেমন সফল হয়নি। ২০২০ সালের তথ্যচিত্র *স্পেসশিপ আর্থ*-এ এক ভাষ্যকার বলেছিলেন, 'সেখানে যা যা খারাপ হতে পারত, তার সবই হয়েছিল।' তিনি বলেন, ভেতরে অক্সিজেন কমে গিয়েছিল, মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়ে গিয়েছিল। অসংখ্য প্রাণী মারা গিয়েছিল, যার মধ্যে ছিল গাছের পরাগায়নে সহায়ক কীটপতঙ্গও। যদিও ভেতরের বাসিন্দারা নিজেদের চাষ করা খাবার খেয়ে বেঁচে ছিলেন। কিন্তু তাঁরা এতটাই ওজন হারিয়েছিলেন যে পরে তা ক্যালরি সীমাবদ্ধতা নিয়ে গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। একপর্যায়ে তাঁদের বাইরে থেকে অক্সিজেন দিতে হয়। এরপরই এ প্রকল্পকে 'ব্যর্থ' বলে নানাভাবে কটাক্ষ করা হয়।

তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনেক বিশেষজ্ঞ এ প্রকল্পের গুরুত্ব নতুনভাবে বিবেচনা করছেন—বিশেষ করে পরিবেশবিজ্ঞান, বায়ুমণ্ডলীয় রসায়ন এবং পৃথিবীর অপরিবর্তনীয় মূল্য সম্পর্কে উপলব্ধি।

ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির বিজ্ঞান ইতিহাসবিদ লিসা র‍্যান্ড বলেন, এই শিক্ষা এখন

আরও প্রাসঙ্গিক। কারণ, একদিকে ধনকুবেররা ব্যক্তিগত মহাকাশ কর্মসূচি নিয়ে এগোচ্ছেন, অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনসহ মানুষের সৃষ্টি নানা সংকটে পড়ছে পৃথিবী।

এই প্রকল্প এখনো চলছে। বর্তমানে এটি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাস্তুতন্ত্র কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়, তা বোঝার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। পৃথিবী ছেড়ে পালানোর প্রকল্প না হয়ে বায়োস্ফিয়ার ২ আজ বায়োস্ফিয়ার ১ বোঝার এক শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। লিসা র‍্যান্ড বলেন, 'এটি ব্যর্থতা ছিল না। আমি মনে করি এটি সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল।'

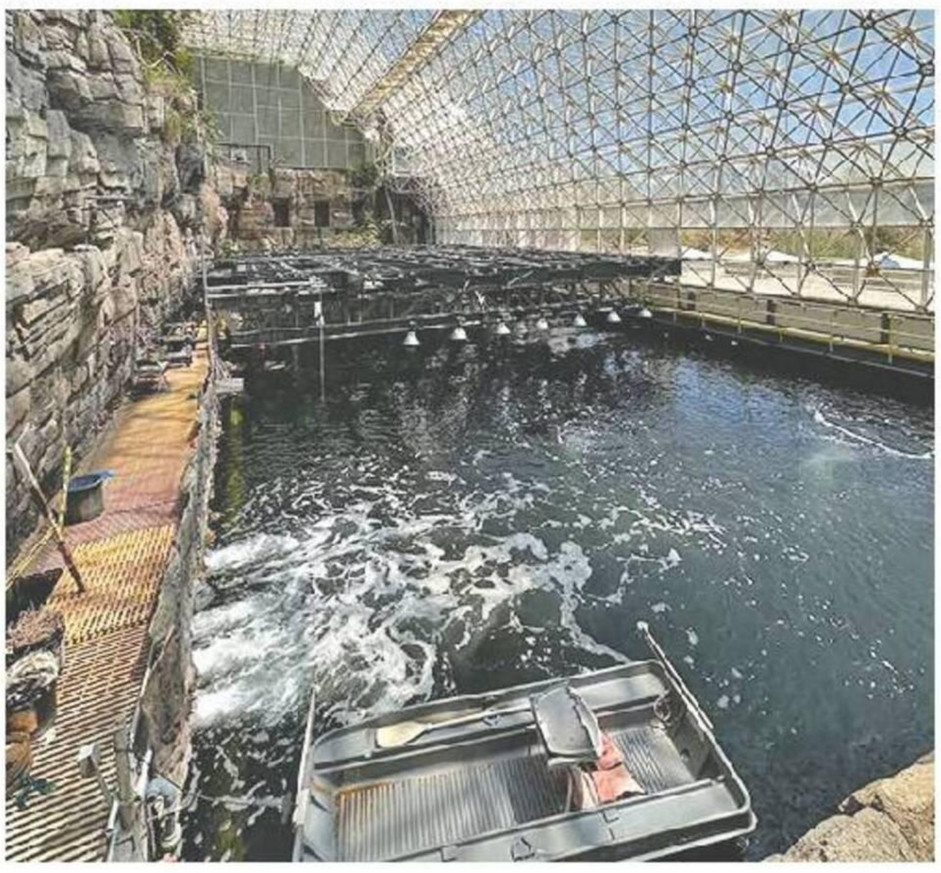
জীবনের জন্য পৃথিবী

বায়োস্ফিয়ার ২ প্রকল্প শুরু হয়েছিল পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে—বলছেন বায়োস্ফেরিয়ান মার্ক নেলসন। তিনি ও তাঁর সহযোগীরা নিউ মেক্সিকোর এক ইকোভিলেজে থাকতেন। সেখানে তাঁরা জৈব চাষ, পারফরম্যান্স আর্ট ও কাঠের কাজ করতেন। এই দলের প্রধান জন অ্যালেন চেয়েছিলেন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্র তৈরি করতে, যা দিয়ে পৃথিবীর জটিলতা বোঝা যাবে।

এ প্রকল্পের জন্য তহবিল দিয়েছিলেন ধনকুবের এড বাস, যিনি প্রায় ১৫০ মিলিয়ন ডলার দেন। আজকের হিসাবে যা প্রায় ৪৪০ মিলিয়ন ডলার। ১৯৮৪ সালে এই স্থাপনা নির্মাণের কাজ শুরু হয়।

বায়োস্ফিয়ার ২-এর বর্তমান উপপরিচালক জন অ্যাডামস বলেন, যদিও এর কোনো বাস্তুতন্ত্রই বাস্তব জগতের মতো নিখুঁত ছিল না। তবু প্রতিটি বাস্তুতন্ত্র একই ধরনের গাছপালা, পোকামাকড়, মাছ ও পাখি থাকার ব্যবস্থাসহ নকশা করা হয়েছিল। ফসল চাষের জন্য কৃষিজমি ছিল। পাইপিং ও পাম্পের একটি ভূগর্ভস্থ ব্যবস্থা তাপমাত্রা থেকে আর্দ্রতা পর্যন্ত সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করত। বৃষ্টির পানি আহরণ, পানীয় জল তৈরির ব্যবস্থা ও বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থাও ছিল।

বায়োস্ফেরিয়ান মার্ক নেলসন বলেন, 'বায়োস্ফিয়ার ২ এক শতাব্দী ধরে কাজ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯১ সালে যখন এখানে ঢোকা হয় তখন মনে হয়েছিল, এটি এত বিশাল পরীক্ষা যে আমাদের আটজনের কেউই নিশ্চিত ছিল না যে আমরা সেখানে দুই বছর এক বা অন্যভাবে টিকে থাকতে পারব।'



আছে শ্বাসমূলীয় (ম্যানগ্রোভ) জলাভূমি
ছবি : বায়োস্ফিয়ার ২-এর ইনস্টাগ্রাম থেকে নেওয়া



বায়োস্ফিয়ার ২-এর ভেতর ঢোকার প্রস্তুতি নিচ্ছেন আট বিজ্ঞানী
ছবি : এক্স থেকে নেওয়া

ভেতরে যা হয়েছিল

বায়োস্ফিয়ার ২-এর ভেতরে প্রথম ও প্রধান সমস্যা ছিল অক্সিজেনের ঘাটতি। ১৬ মাস পর বাতাসে অক্সিজেনের মাত্র ১৪ শতাংশে নেমে আসে। যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩ হাজার ৩৫০ মিটার উচ্চতায় অক্সিজেনের মাত্রার সমান। উচ্চতাজনিত অসুস্থতায় ভেতরের সবাই ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। পরে দেখা যায়, অক্সিজেনের এই ঘাটতির কারণ ছিল নতুন উর্বর মাটি, যা ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের অতি বর্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মাটির ভেতরে থাকা অদৃশ্য জীবাণুর দল (ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাস) অনেক বেশি নিশ্বাস নিচ্ছে! এর মানে তারা অক্সিজেন খাচ্ছে আর অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়ছে। ছোট ও অপর্যাপ্ত পরিমাণ গাছপালা সে ভারসাম্য রাখতে পারেনি।

জন অ্যাডামস বলেন, বায়োস্ফিয়ার ২-এর ভেতরে থাকা আটজন দ্রুত বেড়ে ওঠা গাছ লাগিয়ে, শুকনা ঘাস সংরক্ষণ করে অক্সিজেনের এই ঘাটতি কাটানোর চেষ্টা করেন। এমনকি তাঁরা ঘরের মেঝেতে শৈবাল চাষ করেন, কিন্তু এতে অক্সিজেন বাড়েনি।

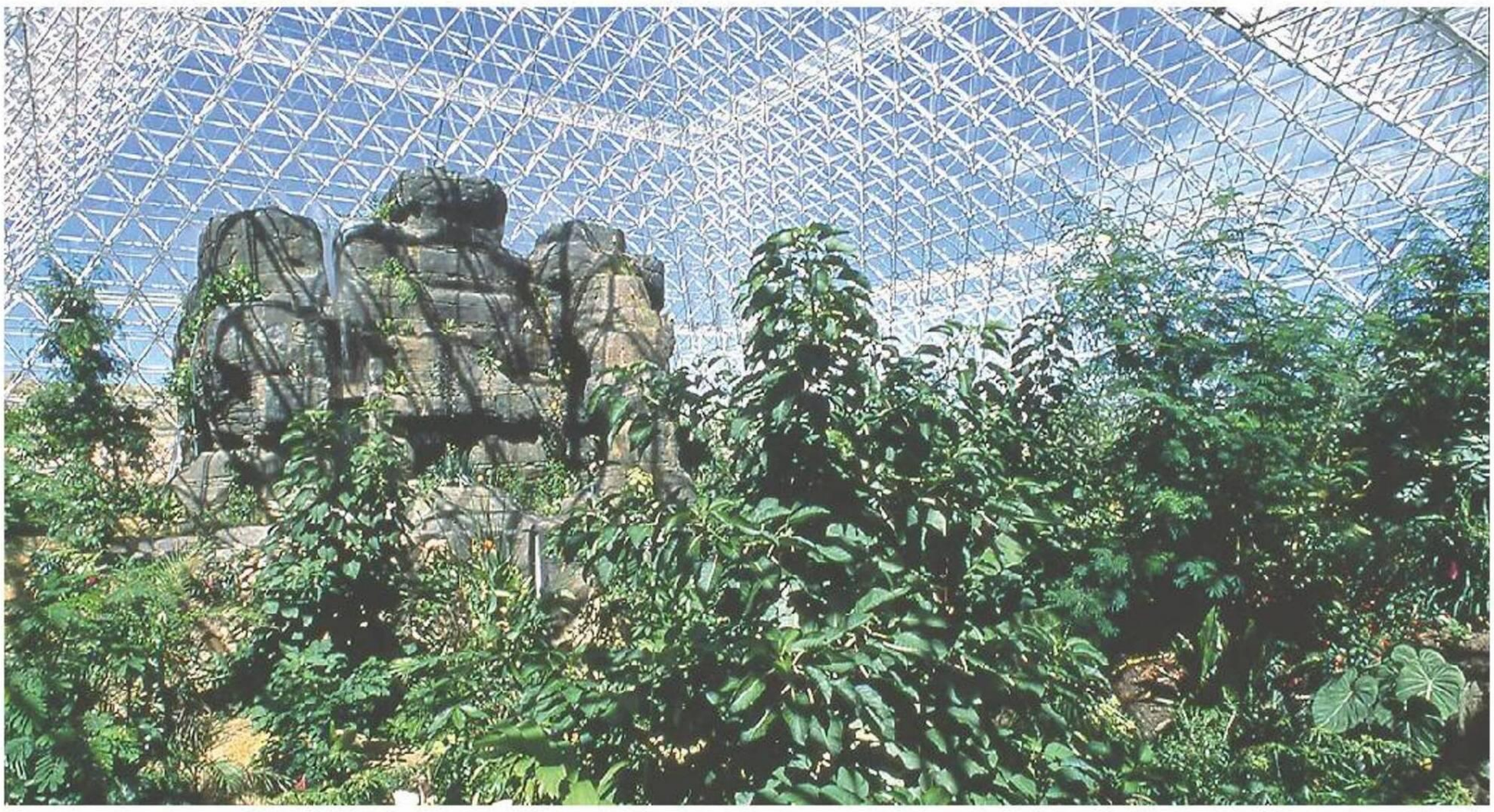
শৈবাল মানে জলজ ছোট উদ্ভিদ, যেগুলোও অক্সিজেন দেয়। ভাবো একবার, খাওয়ার জন্য ধান-গম নয়, তাঁরা শুধু জীবন বাঁচাতে অক্সিজেনের জন্য শৈবাল চাষ করেছিলেন!

পতঙ্গরা গেল কোথায়

বায়োস্ফিয়ার ২-এর ভেতরে আরেকটি অদ্ভুত বিপদ ঘটেছিল। ফুল ফুটছে, কিন্তু মৌমাছি বা প্রজাপতি আসছে না। যারা ফুল থেকে ফুলে উড়ে পরাগ ছড়িয়ে দেয়। এ কারণে অনেক গাছে ফলই ধরছিল না।

মার্ক নেলসন বলেন, একদিন তাঁরা বুঝতে পারলেন, 'লংহর্ন ক্রেজি অ্যান্ট' নামের একদল লম্বা শুঁড়ওয়ালা পিঁপড়া এই ছোট পতঙ্গগুলোকে ধরে খেয়ে ফেলছে। আর কাচের ঘরের দেয়ালে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি আসছে না, যেটা পোকামাকড়কে ফুল খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

নেলসন বলেন, এটা বুঝতে পেরে তাঁরা হাত দিয়ে ফুলে পরাগ ছড়িয়ে দিলেন। এতে কয়েকটি প্রজাতির পরাগায়ন হয়েছিল। পরাগরেণু ফুলে ব্রাশ করেছিলেন, যাতে বীজ তৈরি হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ছিল, পিঁপড়ার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা এবং বাইরের বিশ্ব থেকে নতুন পরাগরেণু প্রবর্তন করা।



পৃথিবীর বিকল্প নেই

দুই বছর পর যখন বিজ্ঞানীরা বায়োস্ফিয়ার ২ থেকে বাইরে এলেন, অনেকেই বললেন—এই তো ব্যর্থ! কিন্তু আসলে বিজ্ঞানীরা সেখানে শিখেছেন অনেক কিছু। তাঁরা শিখেছেন—পৃথিবীকে বানানো এত জটিল যে সেটাকে পুরোপুরি নকল করা অসম্ভব।

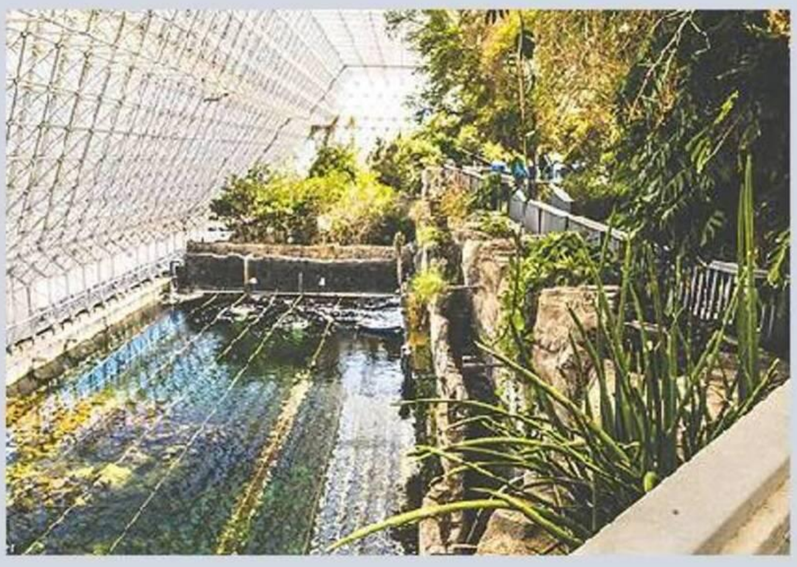
এ প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি হলো, পৃথিবীর কোনো বিকল্প নেই। বায়োস্ফিয়ার ২-এর অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, মানুষ একা নয়, সে একটি পুরো বাস্তুতন্ত্রের অংশ এবং সেই ব্যবস্থা আবার অবিশ্বাস্য রকম জটিল ও ব্যয়বহুল।

বায়োস্ফেরিয়ান ডেভিড টিলম্যান বলেন, যদি বায়োস্ফিয়ার ২-এর মতো কোনো মহাকাশ উপনিবেশ হয়, তবে প্রতি মাসে একজনের খরচ হবে ৮২ হাজার ৫০০ ডলার। তবু এর কোনো নিশ্চয়তা নেই।

এই অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে বায়োস্ফেরিয়ান মার্ক নেলসন সহকর্মীদের সঙ্গে *লাইফ আন্ডার গ্লাস* নামের একটি বই লিখেছেন। ওই বইয়ে তিনি বলেছেন, 'তুমি যখন বুঝতে পারো তোমার জীবন ওই গাছটির ওপর নির্ভর করে—যে গাছটা অক্সিজেন দিচ্ছে, তখন পৃথিবীকে দেখার চোখই বদলে যায়।'

বায়োস্ফিয়ার ২ পরীক্ষা বিজ্ঞানীদের আরও অনেক কিছু শিখিয়েছে। যেমন গাছপালা আর মাটির ঠিকমতো যত্ন না নিলে বাতাসে অক্সিজেন কমে যেতে পারে; ছোট ছোট পোকামাকড়, যেমন মৌমাছি বা পিঁপড়া প্রকৃতির জন্য খুব দরকারি; গাছ, পানি, আলো, মাটি—সবকিছু মিলে তৈরি করে মানুষের জীবনের ভারসাম্য।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, 'বায়োস্ফিয়ার ২ আসলে আমাদের শিখিয়েছে পৃথিবীই আমাদের একমাত্র বাসা। তাই এটিকে সবাই মিলে ভালোবাসতে হবে, পরিষ্কার রাখতে হবে আর যত্ন নিতে হবে।'



বায়োস্ফিয়ার ২-এর এই কাচঘেরা ঘরে ছিল একটা কৃত্রিম মহাসাগরও। সেখানে করা হতো প্রবালের চাষ।
ছবি : বায়োস্ফিয়ার ২-এর ইনস্টাগ্রাম থেকে নেওয়া

ঘরের ভেতর সমুদ্রপাঠ

বায়োস্ফিয়ার ২-এর এই কাচঘেরা ঘরে ছিল একটা কৃত্রিম মহাসাগর। সেখানে করা হতো প্রবালের চাষ। সেখানে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, যখন বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়ে, তখন সাগরের পানি অম্লীয় হয়ে যায়। এতে প্রবাল বেড়ে উঠতে পারে না। এটা ছিল বড় এক চমক। কারণ, পৃথিবীর সাগরেও আজ এটাই ঘটছে।

সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী ও ভূবিজ্ঞানী ডায়ান থম্পসন বলেছেন, বিজ্ঞানীরা বন্দী অবস্থায় প্রবালের বিকাশের জন্য কী ধরনের আলো প্রয়োজন, সে সম্পর্কেও অনেক কিছু শিখেছেন।

তাহলে প্রকল্পের কী হলো

১৯৯৩ সালে বায়োস্ফিয়ার ২ থেকে বেরিয়ে আসেন বিজ্ঞানীরা। এর মধ্য দিয়ে পরীক্ষাটি শেষ হয়। এ সময় প্রকল্পটি সমালোচনার মুখে পড়ে। কারণ, এটি সরকারি বা প্রথাগত অ্যাকাডেমিক কাঠামো অনুসরণ করেনি। সরকারের পরিবর্তে এতে একজন ধনী ব্যক্তি অর্থায়ন করেছিলেন। অনেকেই ভাবতেন, এটি কোনো বিজ্ঞান নয়, বরং 'নাটক'। বায়োস্ফিয়ার ২-এর ভেতর একজন অংশগ্রহণকারী আহত হলে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং পরে অক্সিজেন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়—এই সবকিছুকে 'প্রতারণা' বলা হয়েছিল।

বায়োস্ফিয়ার ২-এর বর্তমান উপপরিচালক জন অ্যাডামস বলেন, গণমাধ্যমের নেতিবাচক ধারণা এবং মূল পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে বায়োস্ফিয়ার ২ কীভাবে পরিচালনা করা যায়, তা নিয়ে মতবিরোধ—প্রকল্পটির তত্ত্বাবধানকারীদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছিল। ১৯৯৬

সালে ধনকুবের এড বাস কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বায়োস্ফিয়ার ২-এর ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করেন। পরে এটি অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার দেন।

বায়োস্ফিয়ার ২ এখন টাইম মেশিন

বর্তমানে বায়োস্ফিয়ার ২ ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিস্থিতি অনুকরণ করে দেখার অন্যতম প্ল্যাটফর্ম। বনাঞ্চল কীভাবে তাপমাত্রা ও খরার সঙ্গে খাপ খায়, প্রবাল কীভাবে লবণাক্ত সমুদ্রে টিকে থাকে—এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা হচ্ছে এখানেই। বায়োস্ফিয়ার ২ এখন আর মহাকাশে যাওয়ার চাবিকাঠি নয়, বরং পৃথিবীর জটিল জীবনব্যবস্থাকে বোঝার এক পরীক্ষাগার।

ইউনিভার্সিটি অব মেইনের বাস্তুবিদ ব্রায়ান ম্যাকগিল বলেন, জীববৈচিত্র্য কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে গবেষণা করা বাস্তুবিদরা সাধারণত তাপপ্রবাহ বা খরার মতো পরিবর্তনের পরে কী ঘটে তা এখানে বিশ্লেষণ করেন। উদাহরণস্বরূপ, জলবায়ু পরিবর্তন ভবিষ্যতে পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রকে কীভাবে পরিবর্তন করবে তার ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য তাদের ভবিষ্যতের পরিস্থিতি আবার তৈরি করতে হবে এবং জীবন্ত প্রাণীরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়, তা দেখতে হবে। এটা এখন একটি টাইম মেশিনের মতো। বায়োস্ফিয়ার ২-এর রেইনফরেস্ট হলো বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বাস্তব জগতের প্রতিরূপগুলো কীভাবে কাজ করতে পারে তার পরীক্ষা মঞ্চ। একটি গবেষণায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেখা গেছে, বনগুলো আশ্চর্যজনকভাবে তাপের প্রতি সহনশীল; বরং উষ্ণায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত খরা তাদের ক্ষতি করে।

সম্প্রতি জার্মানির ফ্রেইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তুবিদ ক্রিশ্চিয়ান ওয়ার্নার ও তাঁর সহকর্মীরা বনটিকে ৭০ দিনের খরার মুখোমুখি করেছেন। তাঁরা শিখেছেন, কীভাবে কিছু গাছ গভীর, আর্দ্র মাটির স্তরে প্রবেশ করে বেঁচে থাকে এবং খরা-চাপযুক্ত গাছগুলো মনোটারপেন নামের আরও যৌগ নির্গত করে, যা বায়ুবাহিত কণা তৈরি করে এবং সম্ভাব্যভাবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বৃষ্টির মেঘ সৃষ্টিতে কাজ করতে পারে।

আমরা সবাই বায়োস্ফেরিয়ান

মার্ক নেলসন বলেছেন, 'আমরা সবাই বায়োস্ফেরিয়ান। পৃথিবীর যত্ন নেওয়াই আমাদের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান ও নৈতিকতা।' তিনি বলেন, সবাই মিলে পরিবেশের যত্ন নিলে পৃথিবী আরও সুন্দর থাকবে।

তথ্যসূত্র : বায়োস্ফিয়ার ২ ডট অর্গ, বিবিসি, দ্য গার্ডিয়ান, দ্য ইকোলজিস্ট

• আয়োজন

বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াডের রেজিস্ট্রেশন চলছে

মিশাল ইসলাম



দক্ষিণ কোরিয়ায় আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে অংশ নেওয়া বাংলাদেশ দল

স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের রোবোটিকসে প্রায়োগিক দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য ১৯৯৯ সাল থেকে আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াড (আইআরও) আয়োজিত হয়ে আসছে। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক এই অলিম্পিয়াডের বাংলাদেশ পর্ব আয়োজনের লাইসেন্স অর্জন করে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ২৬তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দল দক্ষিণ কোরিয়ায় ২টি স্বর্ণপদক, ৪টি রৌপ্য ও ৪টি ব্রোঞ্জপদক অর্জন করেছে।

আইআরওর নতুন নিয়ম অনুযায়ী, এ বছর থেকে বাংলাদেশ পর্ব 'আইআরও বাংলাদেশ ওপেন' নামে আয়োজিত হবে। আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে একটি নির্দিষ্ট থিমের ওপর ভিত্তি করে রোবট তৈরি করতে হয়। ২০২৫ সালের মূল থিম হলো 'স্পেস রোবট', অর্থাৎ এমন রোবট বানাতে হবে, যা মহাকাশের কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

১ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াডের ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। শিক্ষার্থীরা তিনটি গ্রুপে অংশ নিতে পারবে :

১. জুনিয়র লো : প্রথম-চতুর্থ শ্রেণি
২. জুনিয়র হাই : পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণি
৩. সিনিয়র : সপ্তম-দ্বাদশ শ্রেণি

এ বছর আইআরও বাংলাদেশ ওপেন অনুষ্ঠিত হবে ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর। আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে তিনটি ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে—ক্রিয়েটিভ ক্যাটাগরি, ক্রিয়েটিভ মুভি ও ফিজিক্যাল কম্পিউটিং। এই ক্যাটাগরিগুলোতে ভেন্যুতে স্পেস রোবট দিয়ে সমাধান করা যায়, এমন কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা বা সাব-থিম দেওয়া হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে রোবট তৈরি করতে হবে।

বাংলাদেশ পর্বের এই তিনটি ক্যাটাগরির বিজয়ীদের নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক দল নির্বাচনী ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। এই ক্যাম্পে শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্স যাচাই-বাছাই শেষে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিতরা ২৭তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে ডিসেম্বর মাসে অস্ট্রেলিয়ার গোল্ডকোস্টে অংশ নেবে।

যারা রোবোটিকসে নতুন, তাদের উৎসাহ দিতে বাংলাদেশ পর্বে 'রোবোটিকস কুইজ' নামে একটি বিশেষ ক্যাটাগরি আছে। এটি আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলেও এই কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা বাড়াতে পারবে।

আরও জানতে ভিজিট করুন : www.bdro.org। এই আয়োজনে ম্যাগাজিন পার্টনার কিশোর আলো।

লেখক : প্রধান রোবোটিকস কোচ, বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড

যেভাবে গড়ে উঠেছে মাইনক্রাফট জেনারেশন

আসহাবিল ইয়ামিন



বিশ্বজুড়ে তুমুল জনপ্রিয় গেম মাইনক্রাফট (Minecraft)। ছোট-বড় সবার কাছেই গেমটির জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। আপাতদৃষ্টে সাধারণ ব্লকের এই গেম কেন এত জনপ্রিয়? কীভাবে তৈরি হলো 'মাইনক্রাফট জেনারেশন'?

মাইনক্রাফটের দুনিয়া একেবারেই আলাদা। মাইনক্রাফট মূলত একটি থ্রি-ডি স্যান্ডবক্স গেম। এই গেমে খেলোয়াড়েরা ব্লক ব্যবহার করে যেকোনো কিছু তৈরি করতে পারে। স্যান্ডবক্স গেমে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা শেষ নেই। খেলোয়াড়েরা চার কোনাবিশিষ্ট ব্লক ভেঙে জিনিসপত্র সংগ্রহ করে। তারপর ব্লকগুলো নতুন করে সাজিয়ে বাড়িঘর, রাজপ্রাসাদ, দুর্গ, শহর, এমনকি যন্ত্রও তৈরি করতে পারে।

মাইনক্রাফটের দুটি প্রধান মোড আছে। একটা হলো সারভাইভাল মোড (Survival Mode)। এখানে খেলোয়াড়দের নতুন পৃথিবী ঘুরে ঘুরে কাজ করতে হয়, জোগাড় করতে হয় সম্পদ, জিনিসপত্র তৈরি করতে হয়, দানবদের মতো প্রাণীদের (মব) সঙ্গে লড়াই করতে হয় ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। এখানে বিভিন্ন ব্লক ভাঙতে পরিশ্রম করা লাগে। প্রয়োজন হয় নির্দিষ্ট সরঞ্জামের। নিজেদের বাঁচাতে সংগ্রহ করতে হয় খাবার। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তৈরি করতে হয় বেঁচে থাকার জন্য।

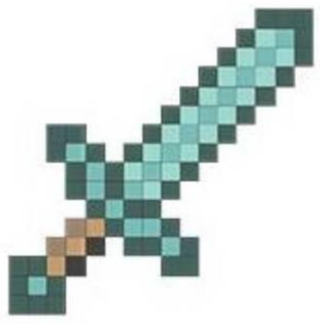
মাইনক্রাফটের সারভাইভাল মোডের কঠিন একটি সাব-ক্যাটাগরি হলো 'হার্ডকোর মোড'। যারা নিজেদের টিকে থাকার ক্ষমতাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পরীক্ষা করতে চায়, এই মোড তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। হার্ডকোর মোডে শুধু একটি জীবন



থাকে। যদি একবারও মারা যাও, তাহলে তৈরি করা পুরো বিশ্বটি চিরতরে মুছে যায়। আর সেই বিশ্বে ফিরে যাওয়া যায় না। হার্ডকোর মোড সাধারণ সারভাইভাল মোডের চেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা দেয় খেলোয়াড়দের।

দ্বিতীয়টি হলো ক্রিয়েটিভ মোড (Creative Mode)। এই মোডে খেলোয়াড়দের কাছে থাকে অসীম ব্লক আর ওড়ার ক্ষমতা। ফলে তারা নিজেদের কল্পনাকে কাজে লাগিয়ে ইচ্ছেমতো যেকোনো কিছু তৈরি করতে পারে। মাইনক্রাফটে নানা রকম ভার্চুয়াল প্রাণীও আছে। যার মধ্যে কিছু প্রাণীকে শিকার করে খেতে বা পোষ মানাতে পারে খেলোয়াড়েরা। এদের মধ্যে 'মুশরুম' নামের একটি লাল-সাদা গরুর মতো প্রাণী আছে, যা এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়।

২০২৩ সালের 'মাইনক্রাফট লাইভ ২০২৩' ইভেন্টে মোজাং স্টুডিওর প্রধান হেলেন চিয়াং জানান, সুইডেনের ভিডিও গেম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'মোজাং স্টুডিও'র তৈরি মাইনক্রাফট ৩০ কোটির বেশিবার বিক্রি হয়েছে। এর মাধ্যমে মাইনক্রাফট বিশ্বে প্রথমবারের মতো ৩০ কোটির বেশি বিক্রি হওয়া ভিডিও গেমের রেকর্ড গড়েছে। ২০১১ সালে বাজারে আসার এক যুগ পরও গেমটি গেমারদের কাছে নিজেদের জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে।



মাইনক্রাফটের পৃথিবীটা কল্পনার চেয়ে অনেক বড়। মাইনক্রাফটের পৃথিবী প্রায় ছয় কোটি ব্লক চওড়া এবং ছয় কোটি ব্লক লম্বা। এর মোট আয়তন প্রায় ৩ দশমিক ৬ ট্রিলিয়ন বর্গব্লক। যদি মাইনক্রাফটের প্রতিটি ব্লককে এক মিটার লম্বা ও এক মিটার চওড়া ধরা হয়, তাহলে এই পৃথিবী প্রায় ৬০ হাজার কিলোমিটার চওড়া ও লম্বা। মাইনক্রাফটে সর্বোচ্চ ৩২০ ব্লক উঁচু পর্যন্ত কিছু তৈরি করা যায়। আর মাইনক্রাফটের দুনিয়াটার যদিও শেষ আছে, তবু এটা এতটাই বিশাল যে বেশির ভাগ খেলোয়াড়ের কাছে এটাকে প্রায় অসীম বলেই মনে হবে। কেননা এর শেষ খুঁজে পাওয়া বা সবটা ঘুরে দেখা প্রায় অসম্ভব।



মাইনক্রাফটের পৃথিবীটা বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করা। এসব এলাকাকে বলা হয় 'বায়োম' (Biome)। এক বায়োম থেকে আরেক বায়োমে ঢুকলেই সেখানকার পরিবেশ ও প্রকৃতি পুরোপুরি বদলে যায়। গেমটির কিছু পরিচিত বায়োম হলো মরুভূমি, সমতল ভূমি, পাহাড়ি এলাকা, বন, নদী আর সাগর।

বায়োমগুলোর মধ্যেও আবার ছোট ছোট ভাগ অর্থাৎ উপ-অঞ্চল বা সাব-বায়োম আছে। যেমন সাগরের মধ্যেই উষ্ণ পানির সাগর, বরফে ঢাকা সাগর বা গভীর সাগর দেখা যায়। বনের ভেতরেও আছে ফুল, ম্যানগ্রোভ থেকে শুরু করে দানব গাছের বন। সব মিলিয়ে মাইনক্রাফটের জাভা সংস্করণে মোট ৬৪টি বায়োম আছে।

নানা ধরনের জীবজন্তু বাস করে বায়োমগুলোয়। যেমন লামা শুধু পাহাড়ি এলাকায় দেখা যায়। আর মেরু ভালুক পাওয়া যায় বরফে ঢাকা সাগরে। অন্যদিকে গরু আর মুরগি প্রায় সব বায়োমেই দেখতে পাওয়া যায়।

মাইনক্রাফট গেমে সবচেয়ে মজার কাজগুলোর মধ্যে একটি হলো 'মাইনিং'। মানে মাটি খুঁড়ে সম্পদ জোগাড় করা। মাইনক্রাফটের মাটির নিচে থাকা খনিগুলোয় তামা, লোহা, সোনা আর হীরার মতো মূল্যবান জিনিস পাওয়া যায়। এগুলো বের করে আনার জন্য মাটির গভীরে খোঁড়াখুঁড়ি করতে হয়। এই কাজ যেমন মজার, তেমনি বেশ রোমাঞ্চকরও। কারণ, খনির প্রতিটি ধাপে মৃত্যুর ঝুঁকি লুকিয়ে থাকে।

খনির গভীরে লুকিয়ে আছে আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভা। মাইনিং করার সময় অসাবধানতাবশত একবার যদি লাভায়

পা পড়ে যায়, তাহলে আর রক্ষা নেই; সঙ্গে সঙ্গে পুরো শরীরে আগুন ধরে যায়।

তবে এই বিপজ্জনক লাভারও একটি দারুণ ব্যবহার আছে। লাভার ওপর পানি ছিটিয়ে দিলে তা শক্ত, কালো পাথরে পরিণত হয়। যার নাম 'অবসিডিয়ান' (Obsidian)। কুড়াল ব্যবহার করে এই শক্তিশালী অবসিডিয়ান ব্লকগুলো ভাঙা যায়। যখন ১০টি বা এর বেশি অবসিডিয়ান ব্লক সংগ্রহ করে তা দিয়ে একটি বাক্স তৈরি করা হয়, তখন একটি বেগুনি রঙের পোর্টাল খুলে যায়। এই পোর্টাল ব্যবহার করেই মাইনক্রাফটের রহস্যময় 'নেদার' দুনিয়ায় প্রবেশ করা যায়। এভাবে একেকটি ব্লক সংগ্রহ করে যাওয়া যায় একেক পোর্টালে।

তবে মাইনক্রাফট গেমে দুটো বস আছে। 'বস' হলো এমন কিছু দানবীয় প্রাণী বা মব (Mob) যারা অত্যন্ত শক্তিশালী ও আক্রমণাত্মক। এরা খেলোয়াড়ের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এই বসদের পরাজিত করা মাইনক্রাফট গেমের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। মাইনক্রাফটে মূলত দুটি প্রধান বস রয়েছে। এন্ডার ড্রাগন (Ender Dragon) ও উইদার (Wither)। যদিও ওয়ার্ডেন (Warden) ও এল্ডার গার্ডিয়ানের (Elder Guardian) মতো আরও কিছু শক্তিশালী মব আছে। মবদের মধ্যে মাইনক্রাফটে ক্রিপার (Creeper) হলো অন্যতম পরিচিত ও কুখ্যাত। মাইনক্রাফটের আইকনিক চরিত্র হয়ে উঠেছে এই ক্রিপার।

উইকিপিডিয়া তো আমরা সবাই চিনি। সেখানে সব তথ্য পাওয়া যায়। মাইনক্রাফটের বিশাল দুনিয়ার সব খবর ও তথ্যের জন্য তেমনি রয়েছে মাইনক্রাফট উইকি (minecraft.wiki)। যেটাকে বলা হয় মাইনক্রাফট গেম-সম্পর্কিত সব তথ্যের এক বিশাল অনলাইন বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়া। মাইনক্রাফটের ব্লক, আইটেম, ক্রাফটিং টেবিল, ক্রাফটিং রেসিপি, মব আর নিয়মকানুনও অগণিত। কোনো নতুন খেলোয়াড় বা অভিজ্ঞ গেমার যে-ই হোক না কেন, যেকোনো তথ্যের জন্য মাইনক্রাফট উইকিই তার প্রথম যাওয়ার জায়গা।

ইউটিউবের অন্যতম জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর জিমি ডোনাল্ডসন, যাঁকে সবাই চেনে 'মিস্টার বিস্ট' নামে। ইউটিউব যাত্রার শুরুর দিকে মাইনক্রাফট নিয়ে ভিডিও তৈরি করতেন তিনি। তাঁর ভিডিওগুলোয় খেলোয়াড়দের বিভিন্ন মজার ও ব্যয়বহুল মাইনক্রাফট চ্যালেঞ্জ দিতেন, যা দর্শকদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

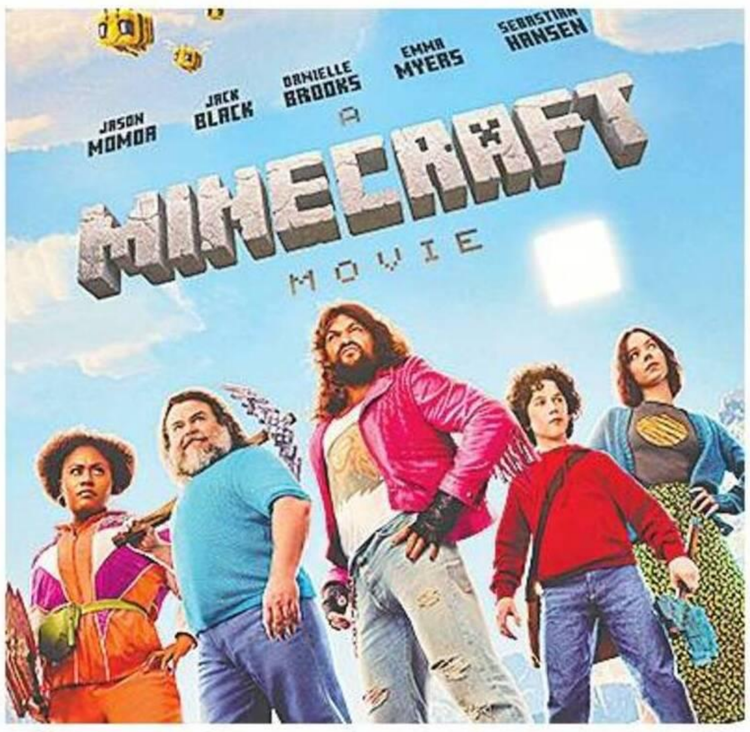
মাইনক্রাফটের বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তার পেছনে ইউটিউবের বেশ কিছুটা ভূমিকা রয়েছে। মিস্টার বিস্ট, পিউডিপাইদের মতো অসংখ্য কনটেন্ট ক্রিয়েটর মাইনক্রাফট গেমের ভিডিও তৈরি ও লাইভ স্ট্রিমিং করতেন। এই কনটেন্ট নির্মাতারা গেমের বিভিন্ন দিক, যেমন জটিল নির্মাণ কৌশল, সারভাইভাল অ্যাডভেঞ্চার, নতুন আপডেট ও মজার চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে কাজ করতেন। এর ফলে মাইনক্রাফট কেবল একটি খেলা না থেকে একটি বিশাল ডিজিটাল কমিউনিটিতে পরিণত হয়েছে। তৈরি হয়েছে মাইনক্রাফট জেনারেশন।

এতক্ষণ মাইনক্রাফটের গেমের দুনিয়া নিয়ে কথা বলছিলাম। যেখানে সবকিছুই ব্লক দিয়ে তৈরি। গেমের খেলোয়াড়দের কথা ভেবে ওয়ার্নার ব্রোস এবার তৈরি করেছে *দ্য মাইনক্রাফট মুভি* (*The Minecraft Movie*)। মুভিতেও গেমের মতোই একটি ব্লকের দুনিয়া তৈরি করা হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে দুর্দান্ত ক্লাইম্যাক্স।

লাইভ-অ্যাকশনে ভরপুর সত্যিকারের অভিনেতারা মাইনক্রাফটের সেই ব্লকের পরিবেশে অভিনয় করেছেন। মুভিটার পরিচালক জারেড হেস। যিনি *নেপোলিয়ন ডায়নামাইট* ও *নাচো লিব্রে*র মতো দারুণ কমেডি মুভি বানিয়েছেন। অভিনয় করেছেন *অ্যাকোয়াম্যান*খ্যাত জেসন মোমোয়া, কমেডিয়ান জ্যাক ব্ল্যাকসহ একঝাঁক তারকা। তবে মজার বিষয় হলো, অভিনেতা জ্যাক ব্ল্যাক শুটিং চলাকালে তাঁর ছেলের সঙ্গে প্রায় ১০০ ঘণ্টা মাইনক্রাফট খেলেন।

দ্য মাইনক্রাফট মুভি শুধু গেমারদের জন্য নয়। যারা মাইনক্রাফট তেমন বোঝে না বা জানতে চায় এর বিশাল দুনিয়া সম্পর্কে, তারাও এই মুভির অ্যাডভেঞ্চারে মুগ্ধ হবে। তবে মাইনক্রাফট জেনারেশনের বেশির ভাগ কমিউনিটি বলেছে, তারা মাইনক্রাফট পছন্দ করে তবে *দ্য মাইনক্রাফট মুভি* তাদের ভালো লাগেনি। যারা নতুন কিছু দেখতে পছন্দ করো, তাদের কাছে বেশ ভালো লাগতে পারে।



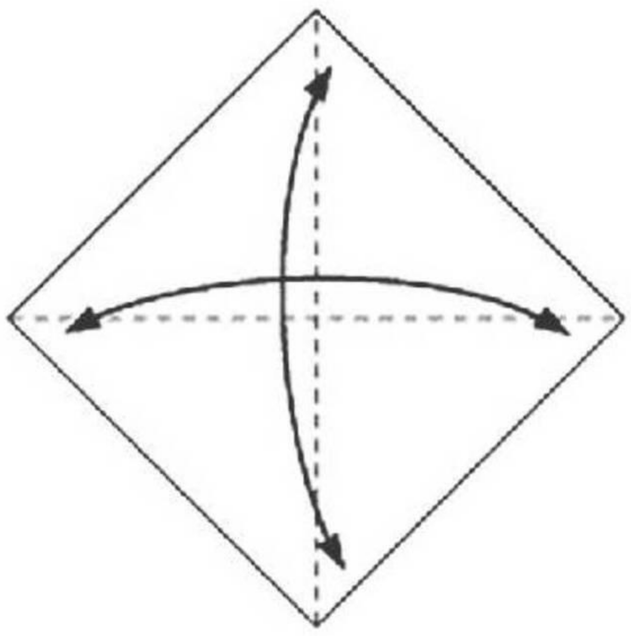


এক নজরে

মুভির নাম : *দ্য মাইনক্রাফট মুভি*
পরিচালক : জারেড হেস
লেখক : ক্রিস বোম্যান, জারেড হেস ও রামি রসোম
ধরন : অ্যাডভেঞ্চার, ফ্যান্টাসি, কমেডি, লাইভ-অ্যাকশন
প্রকাশকাল : এপ্রিল, ২০২৫
ব্যাপ্তি : ১ ঘণ্টা ৪১ মিনিট
আইএমডিবি রেটিং : ৫.৬/১০

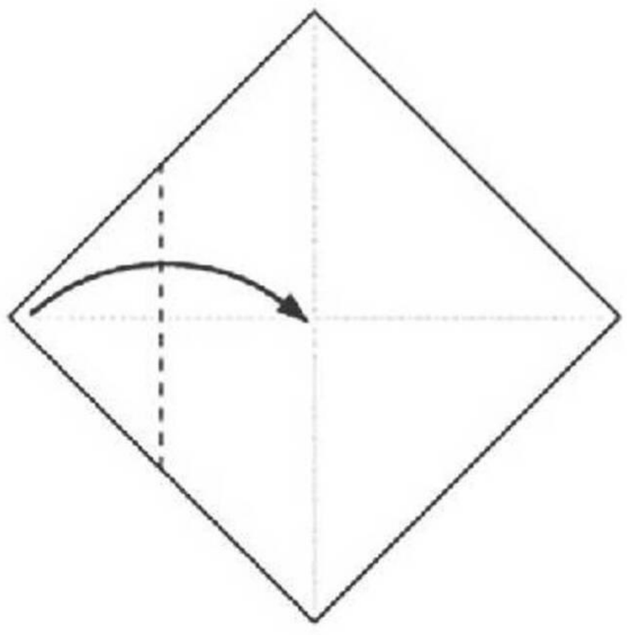
সূত্র : *দ্য নিউইয়র্ক টাইমস*, মাইনক্রাফট ডট নেট, মাইনক্রাফট উইকি, উইকিপিডিয়া

ডোরাকাটা বাঘ মামা



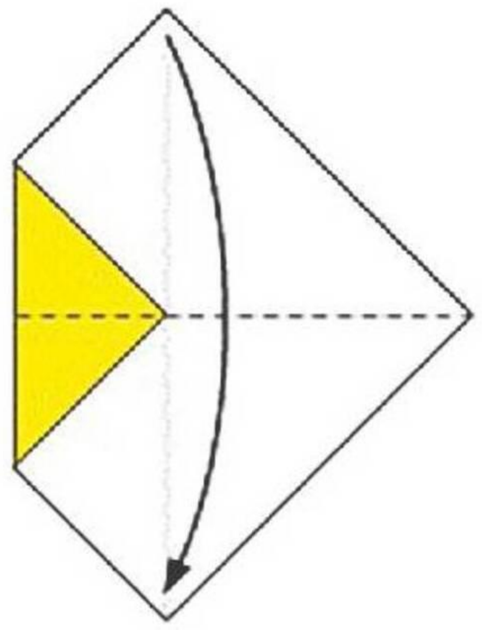
১

প্রথমে এক পিঠে হলুদ রং করা একটি বর্গাকার কাগজ নাও। চিত্রের মতো ডটলাইন বরাবর ভাঁজ করে ভাঁজ ফিরিয়ে নাও।



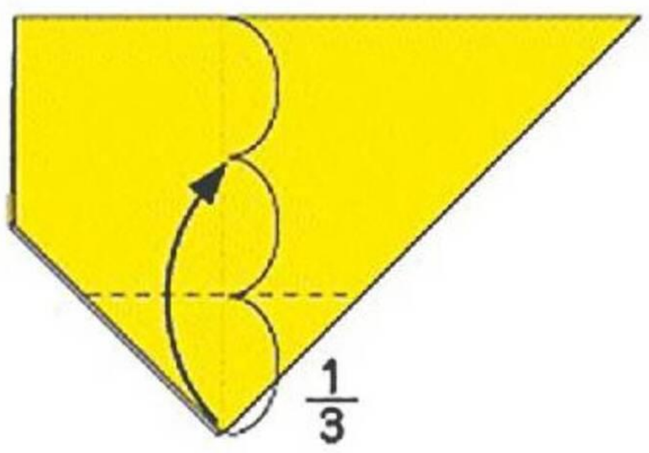
২

এবার বাঁ পাশের ত্রিভুজাকার অংশটি তিরচিহ্ন বরাবর ডান দিকে ভাঁজ করো।



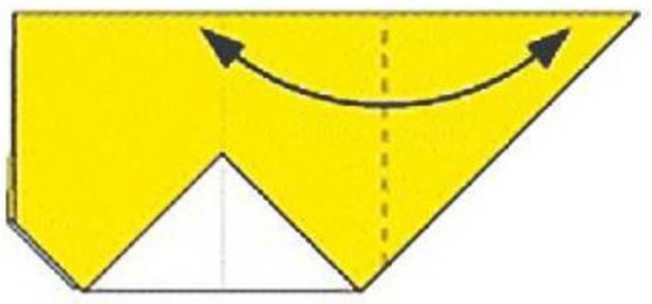
৩

ওপরের অর্ধেক অংশ নিচের দিকে ভাঁজ করো।



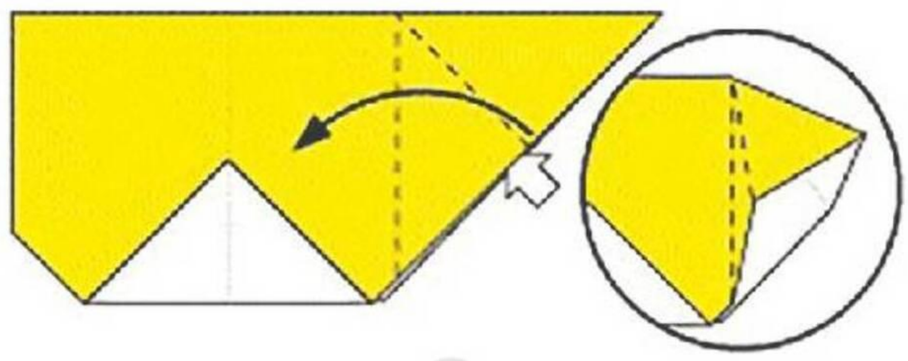
৪

স্কেল দিয়ে মেপে কাগজটির নিচের ৩ ভাগের ১ অংশ পরিমাণ ত্রিভুজাকার ওপরের দিকে ভাঁজ করো।



৫

ডানপাশের ত্রিভুজাকার অংশটি ডটলাইন বরাবর ভাঁজ করে ভাঁজ ফিরিয়ে নাও।



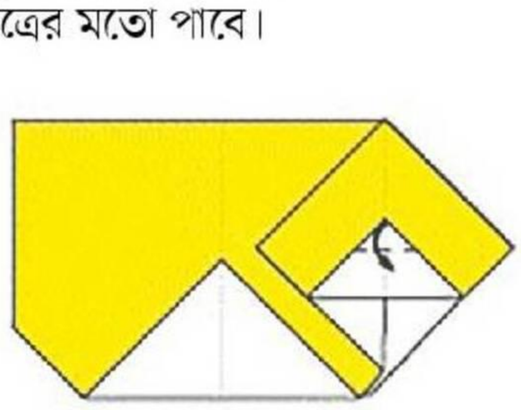
৬

এখানে দুটি ডটলাইন পাবে। ডানপাশের ছোট ডটলাইন বরাবর ভাঁজ খুলে বাঁপাশের বড় ডটলাইন বরাবর চাপ দিয়ে মিশিয়ে দাও। তাতে ৭ নম্বর চিত্রের মতো পাবে।



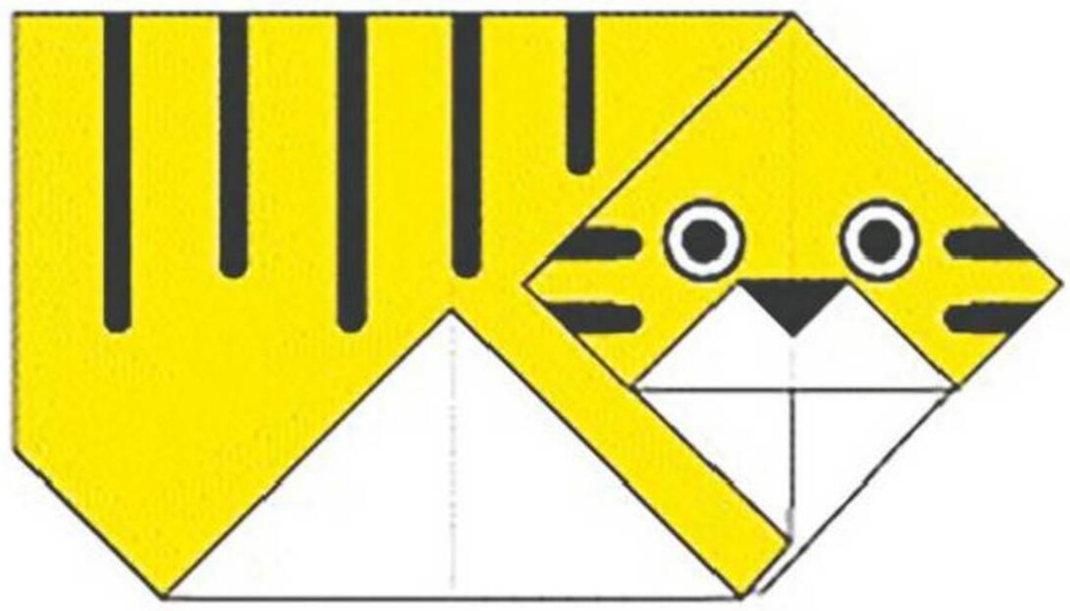
৭

নিচের ত্রিভুজাকার অংশটি ওপরে উঠিয়ে ভাঁজ করো।



৮

এবার ওপরের ছোট্ট ত্রিভুজাকার অংশটি নিচে নামিয়ে নাও।



৯

সবশেষে চিত্রের মতো করে চোখমুখ এঁকে নাও। গায়ে ডোরাকাটা দাগ টেনে নাও। চাইলে কাগজ কেটে চিকন একখানা লেজও জুড়ে দিতে পারো পেছনের অংশে। দেখো তো এবার 'হালুম' বলে ডেকে ওঠে কি না! ডাক শুনে বিরক্ত হলে গান ধরতে পারো, 'ওরে ও বাঘ মামা,

তোর হালুম হালুম থামা।
লেজ উঁচিয়ে বসে থাকিস
লেজটা এবার নামা!'

গ্রন্থনা : এম এ হান্নান

পিরিয়ডের সময় ভালো থাকবে যেভাবে

রাফিয়া আলম

মা-বাবার মতো 'বড় মানুষ' হয়ে উঠতে উঠতে একজন কিশোরী এবং একজন কিশোরের দেহে আসে নানান পরিবর্তন। প্রকৃতির এই স্বাভাবিক নিয়মেই একজন কিশোরীর পিরিয়ড শুরু হয়, যা জীবনের একটা লম্বা সময় পর্যন্ত প্রতি মাসের এক স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। ক্লাস, পরীক্ষা, খেলাধুলা, বেড়ানো—এ সময় সবই চলতে পারে অনায়াসে। পিরিয়ড নিতান্ত সহজ এবং স্বাভাবিক একটি বিষয় হলেও এ সময়টা নিজের একটু বাড়তি খেয়াল রাখা চাই-ই চাই। না হলে অসুস্থ হয়ে পড়ার ভয় থাকে।

স্কয়ার হাসপাতাল লিমিটেডের স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যা বিভাগের অ্যাসোসিয়েট কনসালট্যান্ট ডা. আনিকা তাবাস্‌সুম বলেন, 'পিরিয়ড নিয়ে বহু ভ্রান্ত ধারণার প্রচলন রয়েছে। পিরিয়ডকে অত্যন্ত গোপনীয় এক বিষয় মনে করেন অনেকেই। অনেক কিশোরীই তাই বিষয়টি নিয়ে মন খুলে কথা বলতে পারে না। জানতে পারে না বহু প্রয়োজনীয় বিষয়। আর এসব বিষয় সঠিকভাবে জানা না থাকার কারণে জীবাণুর সংক্রমণের মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়ে তারা।'

পিরিয়ডের সময়ের প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক এই বিশেষজ্ঞের কাছ থেকেই।

পরিচ্ছন্নতার বিকল্প নেই

পিরিয়ডের সময় অবশ্যই চাই স্যানিটারি ন্যাপকিন। খুব একটা রক্তক্ষরণ না হয়ে থাকলেও চার-ছয় ঘণ্টার মধ্যে যেকোনো স্যানিটারি ন্যাপকিন বদলে নেওয়া জরুরি। ব্যবহৃত ন্যাপকিনটি কোনো কাগজ বা টিস্যু পেপারে মুড়িয়ে ঢাকনাযুক্ত বিনে ফেলতে হবে। মনে রাখবে, স্যানিটারি ন্যাপকিন কখনো টয়লেটে বা জলাশয়েও ফেলতে নেই। মেয়াদোত্তীর্ণ ন্যাপকিন ব্যবহার করবে না। আরও মনে রাখবে, কাপড় কখনোই স্যানিটারি ন্যাপকিনের বিকল্প নয়। পিরিয়ডের সময় স্যানিটারি ন্যাপকিন বা এ ধরনের যা কিছুই ব্যবহার করা হয়, এগুলো স্পর্শ করার আগে এবং পরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে ভুলো না।

পরিচ্ছন্নতায় আরও যা

পিরিয়ডের সময় সুতি কাপড়ের ঢিলেঢালা পোশাক পরা উচিত। না হলে ঘামে ভিজে জীবাণুর সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়বে। এ সময় রোজ গোসল করা উচিত। স্বস্তি পেতে কুসুম গরম পানি ব্যবহার করা যেতে পারে গোসলের জন্য। যোনিপথ বা এর আশপাশে কখনোই সাবান বা কোনো রাসায়নিক প্রয়োগ করতে নেই। তাতে এই অংশের স্বাভাবিক সুরক্ষা নষ্ট হয়ে যাবে, ফলে বাড়বে সংক্রমণের ঝুঁকি। বরং দেহের এই অংশ কেবল পানি দিয়ে পরিষ্কার করা যথেষ্ট। যেকোনো সময়ই দেহের এই অংশ পরিষ্কার করার সময় খেয়াল রাখবে, পানির প্রবাহ বা পরিষ্কারের কাজটি যেন সামনে থেকে পেছনের দিকে হয়। উল্টোটা, অর্থাৎ পেছন থেকে সামনের দিকে পরিষ্কার করলে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়বে।

উচ্ছলতা হারিয়ো না

পিরিয়ড নিয়ে মন খারাপ বা ভয়ের কিছু নেই। পিরিয়ডের সময়ও তুমি বিশ্ব জয় করতে পারো অনায়াসে। ঘরের কোণে মনমরা হয়ে বসে থেকো না, খুব বেশি সময় শুয়েও থেকো না। হাঁটাচলা করবে, রোজকার কাজও করবে। দৌড়ানো, সাইকেল চালানো বা যেকোনো ধরনের খেলাধুলা আর শরীরচর্চা করতে পারবে তুমি এ সময়েও। তাতে ব্যথাও কমবে, মন খারাপ ভাবটাও কমবে। বিশেষত রোজ ৪০-৫০ মিনিট হাঁটার অভ্যাস খুব ভালো। তবে যেকোনো ব্যায়ামের ক্ষেত্রেই শরীরের কথা শুনতে হবে। শরীরকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। তবে নির্দিষ্ট কিছু সমস্যার ক্ষেত্রে দড়িলাফ করতে নিষেধ করা হয়। মাসিকের সময় ভারী ব্যায়াম করবে না, অতিরিক্ত ভারী ওজন তুলবে না। পর্যাপ্ত পানি ও তরল খাবার খাওয়া প্রয়োজন এ সময়। মিষ্টিজাতীয় খাবার, জাঙ্ক ফুড বা ফাস্ট ফুড এড়িয়ে হোক সুষম পুষ্টি। তাতে সংক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়বে। হরমোনের প্রভাবে এ সময়টায় মন হতে পারে উচাটন। আসতে পারে অবসাদ। এমন সমস্যা এড়াতে নিয়মিত যোগব্যায়াম বা ধ্যানের অভ্যাস করতে পারো। কাছের মানুষদের সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারো। রাত না জেগে অন্তত সাত ঘণ্টা ঘুমানোও প্রয়োজন।

যা কিছু সমস্যা

তলপেট বা কোমরব্যথা হলে দুবেলা করে উষ্ণ সেঁক দেওয়া যেতে পারে মিনিট কুড়ির জন্য। এ সময় মাথাব্যথাও হতে পারে। যেকোনো ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল খেতে পারবে। তবে অতিরিক্ত ব্যথা হলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে কিংবা মাসিক অনিয়মিত হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক।

ফ্রিডম সুপার ড্রাই স্বাস্থ্য কুইজ

পিরিয়ডের সময় সঠিক পরিচ্ছন্নতা না রাখার ফলে কোন ধরনের জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি?

ক) ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাস　　খ) ভাইরাস

ব্যবহৃত স্যানিটারি প্যাড কোথায় ফেলা উচিত?

ক) ডাস্টবিনে, পলিথিনে মুড়িয়ে　　খ) টয়লেটে

স্বাস্থ্য কুইজ ১ বিজয়ী

হালিমা মিতু
এইচএসসি পরীক্ষার্থী, বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা

নুরে আরশি
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

আন্তা চৌধুরী
বাঁশখালী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

ওপরের কুইজের সঠিক উত্তর দিয়ে জিতে নাও পুরস্কার। সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩ জনকে দেওয়া হবে পুরস্কার। উত্তর পাঠানোর ঠিকানা : স্বাস্থ্য কুইজ ১, কিশোর আলো, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ১২১৫। অথবা ই-মেইল করো editor@kishoralo.com- এ। সাবজেক্টে লিখবে : স্বাস্থ্য কুইজ ২। উত্তর পাঠানোর শেষ সময় ২০ আগস্ট।

ACI

পিরিয়ড? NO STRESS
নিজেকে রাখো CLEAN আর
Super Dry কে দাও তোমার পিরিয়ডের স্ট্রেস!

নিয়মিত ন্যাপকিন
বদলাও

পরিষ্কার থাকো

গোসল করো
নিয়মিত

পিরিয়ডে থাকো সুপার ড্রাই



স্ক্যান করো:

জানো তো?

সস্ মিক্সের আসল স্বাদে
অথেনটিক রামেন মানেই
চপস্টিক রামেন!

চপস্টিক
রামেন

সস্ মিক্স আর সিজনিংয়ের
অথেনটিক কম্বিনিশনে

1st EVER
AUTHENTIC
RAMEN
OF BANGLADESH

বিস্তারিত
জানতে
স্ক্যান
করুন

স্কয়ার
ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ

রুচি



টি-টোয়েন্টিতে নতুন স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ

মৃণাল সাহা

টি-টোয়েন্টি যুগের শুরুর দিকের কথা। এক্সপেরিমেন্ট থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পা ফেলতে শুরু করেছে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাট। বড় বড় নামের বিপরীতে তখন ধরেই নেওয়া হয়েছিল, তরুণ দলগুলো নিজেদের মুনশিয়ানা দেখাবে এই ফরম্যাটে। আর সেই তালিকায় ওপরের দিকে নাম ছিল বাংলাদেশের। টি-টোয়েন্টি ইতিহাসের প্রথম দিকের ম্যাচগুলো, ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পারফরম্যান্স সেই ইঙ্গিতই দিয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফরম্যাট এগিয়ে গেছে অনেক দূর; কিন্তু বাংলাদেশ আটকে আছে ২০০৭ সালেই। হুটহাট একটু ভালো খেলা, আশাজাগানিয়া পারফরম্যান্স—এখানেই আটকে আছে টাইগাররা। কিন্তু অধিনায়কত্বে লিটন দাস আসার পর থেকে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে বোধ হয় নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছে বাংলাদেশ। গত এক মাসে শ্রীলঙ্কা আর পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জয় সেটারই ইঙ্গিত দিয়েছে। ইঙ্গিতটা কি আশাব্যঞ্জক? নাকি আবারও সেই পুরোনো লুপে ফিরতে হবে বাংলাদেশকে?

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ ছিল বাংলাদেশের জন্য এক ইতিহাস! প্রথমবারে মতো লঙ্কানদের মাটিতে গিয়ে লঙ্কানদের সিরিজ হারানোর ঘটনা এটাই প্রথম। অথচ তিন





ফরম্যাটে বাংলাদেশের সূচনায় ছিল হযবরল। সিরিজের আগেই নাজমুল হোসেন শান্তকে ওয়ানডে অধিনায়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া, মিরাজের অধিনায়ক হওয়া। টেস্ট সিরিজ শেষে শান্তর অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়া—এসব নিয়ে কম জল ঘোলা হয়নি। মাঠের ভেতরেও বাজে পারফরম্যান্স আর সহজ ম্যাচ হারার ঘটনা তো আছেই। সব মিলিয়ে টেস্ট আর ওয়ানডে সিরিজ বাংলাদেশ হেরেছিল ০-১ আর ১-২ ব্যবধানে। বারবারই মনে হয়েছিল, আরেকটু চেষ্টা করলেই হয়তো সিরিজটা বাংলাদেশের হয়ে যেত।

কিন্তু সে ইচ্ছা পূরণ হলো একেবারে নতুন টি-টোয়েন্টি দল নিয়ে। তবে লিটন দাসের অধিনায়কত্বে দলটা বেশ গোছানো। তার প্রমাণ মিলেছে সিরিজজুড়ে। প্রথম ম্যাচে ১৫৪ রান করেও জিততে পারেনি বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কা সে রান টপকে গেছে ১ ওভার বাকি থাকতেই। দ্বিতীয় ম্যাচে ফর্মে ফিরলেন অধিনায়ক লিটন দাস। ৫০ বলে ৭৬ রানের অসাধারণ এক ইনিংস খেলে স্কোরবোর্ডে জমা করলেন ১৭৭ রান। খেলতে নেমে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে শ্রীলঙ্কা লুটিয়ে গেল ৯৪ রানে। ৮৩ রানের বিশাল জয় পেল বাংলাদেশ। তৃতীয় ম্যাচে বাংলাদেশকে ১৩৩ রানের টার্গেট দিয়েছিল লঙ্কানরা। তানজিদ হাসান তামিমের ৪৭ বলে ৭৩ ম্যাচটাকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। বাংলাদেশ ১৩৩ রান পেরিয়ে গেছে ২১ বল হাতে রেখেই। আর এ জয় দিয়েই প্রথমবারের মতো শ্রীলঙ্কার মাটিতে যেকোনো ফরম্যাটে সিরিজ জিতল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ইতিহাস গড়া সিরিজ জয়। কিন্তু তখনো পাকিস্তানের বিপক্ষে মূল চ্যালেঞ্জটা বাকি।

শ্রীলঙ্কা থেকে ফিরেই বাংলাদেশ তৈরি হলো পাকিস্তান সিরিজের জন্য। সাধারণত এই সময়ে বাংলাদেশে ক্রিকেট খেলা হয় না। অত্যধিক বৃষ্টির কারণে এই সময়টাকে ধরা হয় 'অফ সিজন'। কিন্তু এই অফ সিজনেই বাংলাদেশে ভিড়েছে পাকিস্তান। লক্ষ্য এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টির আগে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়া। বাংলাদেশও ঝালিয়ে নিল নিজেদের। কিন্তু লিটন দাস নেমেছিলেন নিজেকে প্রমাণ করতে, ঝালিয়ে নিতে নয়। শ্রীলঙ্কা সিরিজের স্পিরিট যেন প্রকাশ পেল পাকিস্তান সিরিজে।

পাকিস্তান সিরিজজুড়ে ছিল বোলারদের কৃতিত্ব। তাতে অবশ্য পিচের দায়ই বেশি। প্রায় ১৪ মাস পর মিরপুরে খেলা ফিরলেও পিচ অবশ্য ছিল আগের মতোই। ফলে বোলাররা স্বাভাবিকভাবেই সুবিধা পেয়েছেন। তবে ক্রেডিট যাবে ব্যাটসম্যানদের কাছে। কয়েক বছর ধরে মিরপুরে দেখা গেছে একই চরিত্র, প্রতিপক্ষের ব্যাটিং কলাপস হচ্ছে, টাইগারদেরও হচ্ছে। থামার কোনো উপায় নেই। পাকিস্তান সিরিজে বন্ধ হলো সেটা।

প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের দেওয়া ১১০ রানের টার্গেটে বাংলাদেশ উতরে গেল ২৭ বল হাতে রেখে। তা-ও মাত্র ৩ উইকেট হারিয়ে। পারভেজ হোসেন ইমনের ৩৯ বলে ৫৬ ছিল ম্যাচ বদলে দেওয়ার নেপথ্যে। দ্বিতীয় ম্যাচে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ল বাংলাদেশ। তবু ১৩৩ রানের মতো সম্মানজনক স্কোর নিয়েই মাঠ ছাড়ল টাইগাররা। সেদিন খেল দেখালেন বোলাররা। পাকিস্তানের ৭ ব্যাটসম্যান আউট হয়েছেন এক অঙ্কের ঘরে। ডাক মেরেছেন চারজন। ৮ রানের জয়ের পেছনে পুরো কৃতিত্ব ছিল সেদিন বোলারদের। টানা দুই ম্যাচ জিতে তৃতীয় ম্যাচ পরিণত হয়েছিল নিয়ম রক্ষার। আর সেই নিয়ম রক্ষার ম্যাচেই দলকে অন্যভাবে গুছিয়ে দেখালেন অধিনায়ক লিটন আর কোচ ফিল সিমন্স। পাকিস্তানের দেওয়া ১৭৯ রানের টার্গেটে বাংলাদেশ লুটিয়ে যায় ১০৪ রানে। ৭৪ রানের বিশাল জয় পাকিস্তানিদের ঘরে। কিন্তু ম্যাচ হারলেও বাংলাদেশ সফল তার নিজের জায়গায়। একে তো সিরিজ জয়, অন্যদিকে দলের সবাইকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখা হয়েছে। বৃষ্টিস্নাত ট্রফি সেরিমনিতে তাই মধ্যমণি হয়ে রইলেন অধিনায়ক লিটন।

লিটন দাস দিনে দিনে নিজেকে টি-টোয়েন্টির উপযুক্ত অধিনায়ক হিসেবে প্রমাণ করছেন। বিদেশের মাটিতে এখন পর্যন্ত খেলা ২৯টি টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের জয় মাত্র ৬টিতে। এর মধ্যে লিটন দাসের অধীনই এসেছে দুটি। ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে ৩-০ ব্যবধানে জয়, আর শ্রীলঙ্কাতে ২-১ ব্যবধানে জয়। রেকর্ডটা কথা বলছে লিটনের পক্ষে। এখন পর্যন্ত ৫টি সিরিজে অধিনায়কত্ব করেছেন লিটন, তার মধ্যে ৩টি জিতেছেন, ২টি হেরেছেন। আরব আমিরাতের বিপক্ষে হার বাদ দিলে ক্রিকেটের ছোট ফরম্যাটে অধিনায়ক হিসেবে বেশ মানিয়ে গেছেন লিটন। ১৬ ম্যাচে অধিনায়কত্ব করে জয় ৯টিতে। বিদেশে দুই জয়ের পর, দেশের মাটিতেও বড় জয় বেশ কনফিডেন্স দেবে বাংলাদেশকে।

আবার মুদ্রার উল্টো পিঠও আছে। ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে আশায় বুক বেঁধেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু মিরপুরের সেই মরা পিচ আসেনি কোনো কাজে, শুধু দলকে বিশ্বকাপে সুযোগ পাইয়ে দেওয়া বাদে। সামনে আসছে এশিয়া কাপ, তার আগে কয়েকটি দলের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ। আরব আমিরাতে বসা টুর্নামেন্টে তাই বাড়তি করে নজর থাকবে লিটন দাসের ওপর। অধিনায়ক হিসেবে নিজের প্রথম বড় টুর্নামেন্ট কীভাবে সামলান তিনি।



ঋতুপর্ণা-মারিয়াদের যে লড়াইয়ের গল্প কেউ জানে না

বদিউজ্জামান মিলন

আফঈদা খন্দকার তখনো তারকা হয়ে ওঠেননি। দুই বোন আফঈদা খন্দকার ও আফরা খন্দকার ফুটবল খেলেন। অংশ নেন বক্সিংয়েও। তেমনই একটা ইভেন্টে বাংলাদেশ যুব গেমসের বক্সিং রিংয়ে মেয়েরা খেলছেন। আর পল্টনের মোহাম্মদ আলী বক্সিং স্টেডিয়ামের এক কোণে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন বাবা খন্দকার আরিফ হাসান প্রিন্স।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'কাঁদছেন কেন?' বলেন, মেয়েরা সোনার মেডেল জিতেছে। এই আনন্দে কাঁদি।'

মেয়েদের নিয়ে এমন স্বপ্নবোনা বাবা আমি খুব কমই দেখেছি। আরিফ হাসানের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এক মেয়ে বক্সার। আরেক মেয়ে আফঈদা বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক। আফঈদাদের হাত ধরে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিয়েছে। আফঈদার বাবার মতো স্বপ্নবান বাবা এ দেশে বিরল। বিশেষ করে নারী দলে যেসব ফুটবলার খেলেন, তাঁদের বেশির ভাগকেই লড়াই করতে হয়। দেশের পশ্চাৎপদ এলাকা থেকে উঠে আসা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এই ফুটবলারদের জন্য এগিয়ে যাওয়ার পথে আরেকটা বাধা, তাঁরা নারী। তাঁদের সারাক্ষণ পরিবারের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। সমাজের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। মাঠে ও মাঠের বাইরেও লড়তে হয়। নারী ফুটবলারদের বেতন পর্যাপ্ত নয়। আবার যে সম্মানী দেওয়ার কথা, বাফুফের পক্ষ থেকে সেই বেতনও বাকি থাকে মেয়েদের। এত এত লড়াইয়ের পরও তাঁরা হার মানেন না। হার মানতে চান না।

জাতীয় দলের স্ট্রাইকার মোসাম্মৎ সাগরিকার কথা ধরা যাক। দলে জায়গা করে নিতে তাঁকে প্রচুর লড়াই করতে হয়েছে। অথচ ঠাকুরগাঁওয়ের রাঙ্গাটুঙ্গীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়ে সাগরিকার মন সারাক্ষণ টানত ফুটবল মাঠে। জার্সি, হাফপ্যান্ট পরে মেয়েরা ফুটবল খেলবে, এটা মোটেও ভালো চোখে দেখত না গ্রামবাসী। একই ভাবনা ছিল সাগরিকার বাবা লিটন আলীরও। কিন্তু মেয়ের জেদের কাছে হার মানতে হয়েছে একসময়।

এলাকার মানুষ বলত, 'মেয়েমানুষ ফুটবল খেললে নষ্ট হয়ে যাবে।' বাবা ভেবেছিলেন মেয়েকে কিছুদিন পর বিয়ে দিয়ে দেবেন। কিন্তু ফুটবলের টানে ঘর ছাড়েন সাগরিকা। ঠাকুরগাঁও থেকে পালিয়ে চলে আসেন ঢাকায়। ২০২২ সালে হওয়া ঘরোয়া নারী ফুটবল লিগে খেলেন এফসি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হয়ে। প্রথম ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করেন। ওই আসরে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কারণে জাতীয় দলের সাবেক কোচ গোলাম রব্বানী ছোটনের নজর কাড়েন।

২০২৩ সালের এপ্রিলে সিঙ্গাপুরে হয়েছিল এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের প্রথম পর্ব। নারী ফুটবল লিগে পারফরম্যান্সের সুবাদে বাংলাদেশের জার্সিতে খেলার সুযোগ পান সাগরিকা। এরপর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। একে একে বয়সভিত্তিক ফুটবল পেরিয়ে সর্বশেষ অনূর্ধ্ব-২০ নারী সাফের চ্যাম্পিয়ন দলেও খেলেছেন। টুর্নামেন্টে লাল কার্ড দেখে তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ ছিলেন। এরপরও সাফের মোস্ট ভ্যালুয়েবল ফুটবলারের পুরস্কার জিতেছেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮ গোল করেছেন ঢাকায় ১১-২১ জুলাই অনুষ্ঠিত



মনিকা চাকমা

এই টুর্নামেন্টে।

অথচ মেয়ে ফুটবল খেলে বলে এক মাস ধরে সাগরিকার সঙ্গে কোনো কথা বলেননি বাবা লিটন আলী। লিটন সাহেব অন্যের জমির ওপরে চায়ের দোকান দিয়ে সংসার চালান। এরপরও তিনি পিছিয়ে থাকা সমাজব্যবস্থার অর্গল ভেঙে মেয়ের পাশে দাঁড়াতে পারেননি। সাফ জেতার পর মেয়েই উল্টো তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। সেই মেয়ে সাফের পর এশিয়ান কাপেও খেলবেন।

ময়মনসিংহের কলসিন্দুরের ফুটবলার তহুরা খাতুনকে কখনো ফুটবল খেলতে দিতে চাইতেন না বাবা ফিরোজ মিয়া। কিন্তু সেই তহুরাকেই বলা হতো ময়মনসিংহের মেসি। তাঁর দ্রুতগতির ড্রিবলিং আর গতিময় ফুটবল দেখে, গোল করার সামর্থ্য দেখে ভালোবেসে এলাকাবাসী এই নাম দিয়েছিল।

ফিরোজ মিয়ার পাঁচ মেয়ে। তহুরা মেজ। ফুটবলে হাতেখড়ি ১০-১২ বছর বয়সে। বাড়ির আঙিনায়। বাড়ির আঙিনায় খেলা সেই তহুরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন এখন দেশ-বিদেশের নানা মাঠে।

একবারের ঘটনা। বয়সভিত্তিক সাফে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ১০ লাখ টাকা দেয় সরকার। সঙ্গে ওয়ালটনের পক্ষ থেকে উপহার একটা রেফ্রিজারেটর। মেয়ে একসঙ্গে এত টাকা পেয়েছেন, বাবা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। তিনি বলছিলেন, 'প্রথমে মেয়ে যখন ফোন করে বলে আমি তো বিশ্বাস করতে চাইনি। একটু পর মনে হলো আমার মেয়ে তো মিথ্যা কথা বলে না।'



মেয়েকে ফুটবল খেলতে বাধা দিতেন বাবা। তবে নিজের ইচ্ছায় নয়। প্রতিবেশীর কথা শুনেই নাকি তহুরাকে খেলতে দিতে চাইতেন না। এরপর আমি তহুরাকে ডেকে বলি, 'মাগো তুমি খেলা ছেড়ে দাও।' তবে বাবাকে অনুরোধ করে তহুরা আরেকবার খেলার অনুমতি চেয়েছিলেন। বাবা এরপর আর কখনো না করেননি।

ময়মনসিংহ থেকে উঠে আসা মিডফিল্ডার মারিয়া মান্দার লড়াইয়ের গল্পটা অন্য রকম। বাবা বীরেন্দ্র মারাত যখন মারা যান, তখন মারিয়া মান্দা পড়তেন তৃতীয় শ্রেণিতে। মারিয়ার ছোট ভাই দানিয়েল মান্দা ছিল মায়ের গর্ভে। সেই থেকে চার ভাইবোনকে নিয়ে মারিয়া মান্দার মা এনতা মান্দার লড়াইটা শুরু।

ময়মনসিংহের মন্দিরগোনা গ্রাম থেকে উঠে এসেছেন মারিয়া। যখন কলসিন্দুর স্কুলে মফিজ স্যারের কাছে ফুটবলের অনুশীলন করতেন, গ্রামের অন্যরা নানা সমালোচনা করত। অনেক বাবা-মা পড়াশোনার ক্ষতি হওয়ার ভয়ে মেয়েদের খেলতে পাঠাতে চাইতেন না। কিন্তু মারিয়ার মা তেমন ছিলেন না। মেয়েকে ফুটবল মাঠে পাঠাতেন।

অথচ মারিয়ার মা অন্যের জমিতে কাজ করতেন একসময়। ধানের মৌসুমে ধান লাগাতেন। মৌসুম শেষে ধান কাটার কাজ করতেন। এ জন্য দিনে ২০০ টাকা পারিশ্রমিক পেতেন। শত অভাবেও মারিয়ার কোনো চাওয়া কখনো অপূর্ণ রাখতেন না। ছোটবেলায় একবার বুট কিনতে চাইলে চাল বিক্রি করে সেটা কিনে আনেন মা। খেলার অন্য সরঞ্জামও কতবার কিনে দিয়েছেন এভাবে!

আরেকটা ঘটনা বলি। মারিয়া মান্দার লড়াইয়ের আরেকটা বড় উদাহরণ এটা।

মারিয়া মান্দাদের গ্রামের নেতাই নদে সেতু নেই। ভোরে নৌকা পাওয়া যেত না। কীভাবে ওপারে পৌঁছানো যাবে, সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা হতো। এমনও হয়েছে, মাঝিকে ফোন করে আগেই বলে রাখতেন মারিয়ার মা। কোনো কোনো দিন মাঝি না থাকলে মারিয়ার মা নৌকা বেয়ে খরস্রোতা নদ পার করে দিয়ে আসতেন। এসব লড়াইয়ের ফল পেয়েছেন মারিয়া। আজ তিনি সফল ফুটবলার।

মারিয়া মান্দার সতীর্থ ঋতুপর্ণা চাকমার কষ্টটা আরও বেশি। তাঁকে পরিবার থেকে কখনো বাধা দেয়নি ফুটবল

ঋতুপর্ণা চাকমা

খেলতে। কিন্তু রাঙামাটির মগাছড়ি গ্রামে এতটুকু উন্নতি হয়নি। ছোট বাঁশের সাঁকো, পাহাড়ি পথ আর ঝিরি ও দুর্গমতা মাড়িয়ে যেতে হয় ঋতুপর্ণা চাকমাদের বাড়ি।

যেখানে এখনো টিনের চালা ও বাঁশের বেড়ার একটি ঘরে থাকেন ঋতুপর্ণা। চার বোন ও এক ভাইয়ের সংসারে ঋতুর বয়স যখন ১১ তখন ক্যানসারে মারা যান তাঁর বাবা। একমাত্র ভাই পার্বণ চাকমাও দুই বছর আগে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারা যায়। বাবা-ভাইবিহীন সংসার টেনে নিচ্ছেন তাঁর মা ভুজপতি চাকমা। চার বোনের মধ্যে ছোট ঋতুপর্ণা। বড় তিন বোনের বিয়ে হয়েছে। তাই বাড়িতে একাই থাকেন মা ভুজপতি চাকমা। সেই মা-ও ক্যানসারে ভুগছেন। মায়ের চিকিৎসার জন্যও দুশ্চিন্তায় থাকেন ঋতুপর্ণা।

স্বপ্ন ছিল ঋতুপর্ণা নিজের এলাকায় একটা বাড়ি করবেন। সরকার তাঁকে একটা জায়গায় দিয়েছে। কিন্তু জেলা প্রশাসনের বরাদ্দ দেওয়া জায়গায় বাড়ি নির্মাণের কাজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ আছে। প্রতিশ্রুত বাড়ি নির্মাণের ফাইল আটকে আছে মন্ত্রণালয়ে।

প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে আসা ঋতুপর্ণাদের মতো নারী ফুটবলারদের বড় সমস্যা আবাসন। বাফুফের মতো ব্যস্ত দাপ্তরিক ভবনের চতুর্থ তলার ১১টি কক্ষে প্রায় ৭০ জন নারী ফুটবলার থাকেন। অথচ এই ভবনে নেই লিফট। দৈনিক একাধিকবার ট্রেনিং, জিম সেরে সেই ভবনের সিঁড়ি বেয়ে ক্লান্ত মেয়েদের পৌঁছাতে হয় কক্ষে। একেকটি কক্ষে ছয় থেকে আটজনকে থাকতে হয় গাদাগাদি করে।

কিন্তু যে মেয়েরা বাংলাদেশকে এত বড় সাফল্য এনে দিচ্ছেন, তাঁদের জন্য আরও ভালো সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন বলে মনে করেন জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার রেহানা পারভীন, 'আমাদের ফুটবলাররা যেখানে থাকে, ওটার পরিবর্তন করা দরকার। ওদের আবাসনব্যবস্থা আরও উন্নত করা উচিত।'

যদিও বাফুফে ভবনে মেয়েদের আর গাদাগাদি করে থাকতে হবে না, এমন আশ্বাস এরই মধ্যে দিয়েছেন বাফুফের নারী কমিটির চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার, 'এই মেয়েদের বাফুফে ভবন থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব। আমাদের পরিকল্পনা আছে বিকেএসপি বা অন্য কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। এক্সক্লুসিভভাবে ওদের রেখে দেব। যেখানে ওরা শুধু ট্রেনিংয়ের মধ্যেই থাকবে।'

আগামী বছর ১-২১ মার্চ অস্ট্রেলিয়ায় বসবে নারী এশিয়ান কাপের আসর। যেখানে স্বাগতিক হিসেবে সরাসরি খেলবে অস্ট্রেলিয়া। আরও খেলবে গত আসরের চ্যাম্পিয়ন চীন। যারা এশিয়ান কাপে নবমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় সরাসরি খেলার সুযোগ পেয়েছে। রানার্সআপ দক্ষিণ কোরিয়া ও তৃতীয় জাপানও সরাসরি খেলবে।

এশিয়ান কাপের ১২ দলের মধ্যে বাকি আটটি দল বাছাইপর্ব পেরিয়ে অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশ 'সি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে খেলবে অস্ট্রেলিয়ায়। বাছাইপর্বে বাংলাদেশ হারিয়েছে বাহরাইন, মিয়ানমার ও তুর্কমেনিস্তানকে।

এরই মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় দু-দুবার শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরেছে বাংলাদেশের মেয়েরা। টানা দুবারের সাফজয়ী নারীদের দক্ষিণ এশিয়ায় আদৌ প্রমাণের কিছু ছিল? সাফ চ্যাম্পিয়ন দলটিকে এশিয়ার মঞ্চে খেলার সুযোগ সেভাবে দিত না বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।

টাকা নেই, এমন অজুহাতে তো ২০২৩ সালে অলিম্পিক বাছাই খেলতে মিয়ানমারে পাঠানো হয়নি নারী ফুটবলারদের। ২০২২ সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আগে কোনো প্রস্তুতি ম্যাচই খেলতে পারেননি মনিকা চাকমারা। জাতীয় নারী দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন অনেক আগেই বলেছিলেন, ছেলেদের আগে মেয়েরা বিশ্বকাপে খেলবে। সেই স্বপ্নের দুয়ারে বাংলাদেশ। সেটা কীভাবে সম্ভব, তা একটু ব্যাখ্যা করা যাক। ২০২৭ সালের ব্রাজিল বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ থাকছে বাংলাদেশের। যদি অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠেয় এশিয়া কাপের সেরা ছয় দলের মধ্যে থাকতে পারে বাংলাদেশ তাহলে খেলতে পারবে বিশ্বকাপে। তবে পরের দুই দলের মধ্যে থাকলেও সুযোগ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে অংশ নিতে হবে। আর এশিয়ান কাপের সেরা আটে থাকলে ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকেও খেলার সুযোগ পেতে পারে বাংলাদেশের মেয়েরা।

বাংলাদেশের মেয়েরা একটা বিশাল অসাধ্য সাধন করেছে। মোসাম্মৎ সাগরিকা, রুপনা চাকমারা প্রথমবার খেলবেন এশিয়ান কাপের মঞ্চে। বিশ্বকাপের স্বপ্ন তো হাতছোঁয়া দূরত্বে।

ঋতুপর্ণা যখন ইউরোপের ফুটবলারদের মতো অবিশ্বাস্য রংধনু শটে প্রতিপক্ষের জালে গোল দেন, উল্লাসে মেতে ওঠে পুরো বাংলাদেশ। সাগরিকা যখন হ্যাটট্রিক করে উদ্‌যাপনে ব্যস্ত থাকেন, সেই আনন্দে চোখে জল এসে পড়ে দর্শকদের। কিন্তু এই মেয়েরা কতটা লড়াই আর সংগ্রাম করে, কতটা কাঁটার পথ মাড়িয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরেন, তা কজনই-বা জানে?



সাগরিকা

কিআ মিম কনটেস্ট ৬

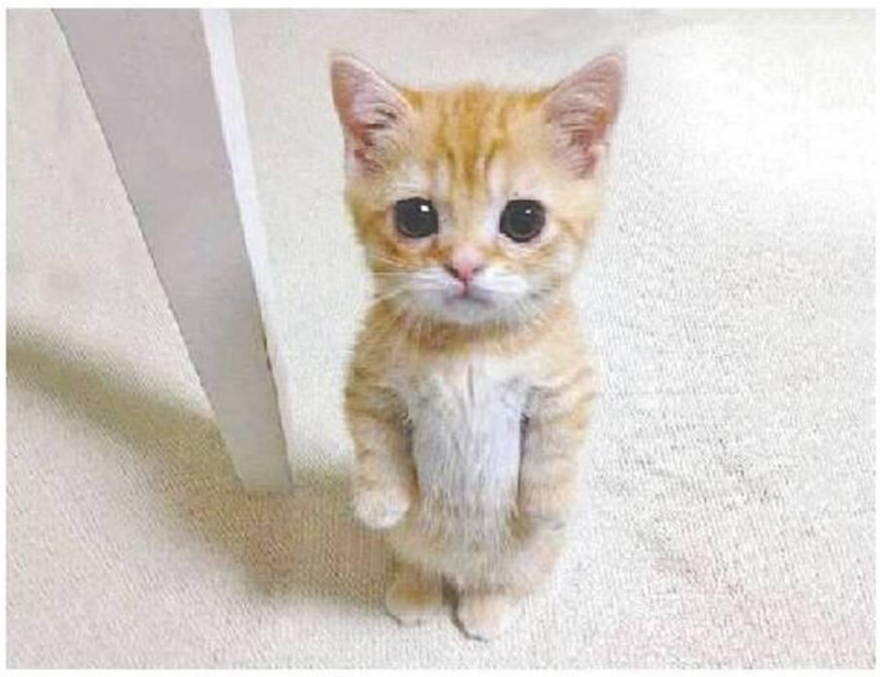
আরও সেরা ১০

১
কাচের মগ ভাঙার পর, নিষ্পাপ আমি
রাফিদ রাফসান
পঞ্চম শ্রেণি, তালপুকুর সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, কুমিল্লা

২
সারা বছর ব্রাজিল ব্রাজিল করে যখন দেখি
শেষকালে কাপ মেসির হাতে, তখন আমি
মো. ইবতেশাম রহমান
অষ্টম শ্রেণি, যশোর জিলা স্কুল, যশোর

সেরা মিম

আমি যখন কোনো কিছু খাই,
তখন আমার ছোট বোন :



সাফওয়াত বিন আজিজ
ষষ্ঠ শ্রেণি, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা

৩
যখন দেখি পরীক্ষার জন্য করোনা
স্থগিত হয়ে গেছে, তখন আমি
মারিয়া ইসলাম
দশম শ্রেণি, শহীদ নজমুল হক বালিকা
উচ্চবিদ্যালয়, রাজশাহী।

৪
যখন জন্মদিনের বানানো খিচুড়ি পুড়ে
যায়, তখন আমি
নাফিসা তাবাসসুম আহমেদ
দ্বিতীয় শ্রেণি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম

৫
কান্না করব নাকি করব
না ভাবতে থাকা আমি
আবিদা রহমান অনন্যা
৫ম শ্রেণি, লাইফ প্রিপারেটরি
স্কুল, উত্তরা, ঢাকা

৬
পরীক্ষা ভালো হয়েছে বলার
পর রেজাল্টের দিন আম্মুর
সামনে আমি
শায়মা বিনতে শহীদ
চতুর্থ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল
অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

৭
সম্পূর্ণ সিলেবাস শেষ করে যখন বন্ধুর
কাছে শুনি সিলেবাস কমানো হয়েছে
কাওসার আহমেদ
সপ্তম শ্রেণি, ধানমন্ডি গভ. বয়েজ হাইস্কুল

৮
পরীক্ষা শেষ হওয়ার
পরদিন মা যখন পড়তে
বসতে বলে
মুবাশশিরাহ আহমেদ
পঞ্চম শ্রেণি, সেন্ট স্কলাস্টিকা বালিকা
উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম

৯
বাবা যখন বলে, ‘মানিব্যাগ থেকে টাকা নিয়েছিস?’
তখন আমি
ইফাজ আহমেদ
চতুর্থ শ্রেণি, সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ

১০
গণিত পরীক্ষায় বাংলা পড়ে যাওয়ার পর আমার অবস্থা
ফাতিহা আয়াত
চতুর্থ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল
অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

**তোমাদের মিমগুলো দারুণ! প্রচুর মিম পেয়েছি আমরা। সেরা কয়েকটি মিম ছাপা হলো এ সংখ্যায়।
মিম কনটেস্ট ছাড়া আরও মিম পাঠাতে পারো তোমরা।**

এস এম হামীম হাসান
ষষ্ঠ শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

পরীক্ষায় ফেল করার পর

যেভাবে ইউরোপ-আমেরিকার পিতামাতারা তাদের সন্তানদের স্বাগত জানায়



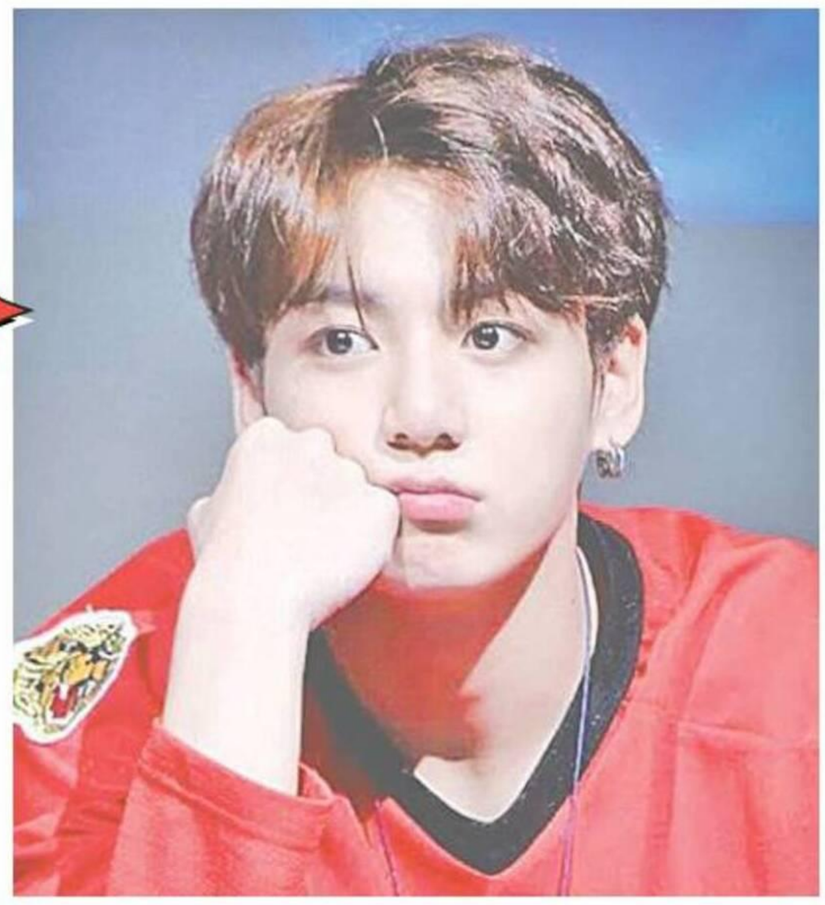
চিন্তা কোরো না, তুমি আবার ভালো করে ট্রাই করো

যেভাবে আমাদের দেশে পিতামাতারা তাদের সন্তানদের স্বাগত জানায়



আইজ একবার বাসায় আসুক

পরীক্ষার বন্ধ শেষে স্কুলে গেলে খাতা দেখাবে, তাই স্কুলে যাব কি যাব না, ভাবতে থাকা আমি :



সামিয়া আহমদ
সপ্তম শ্রেণি, সিলভার বেলস গার্লস হাইস্কুল, চট্টগ্রাম

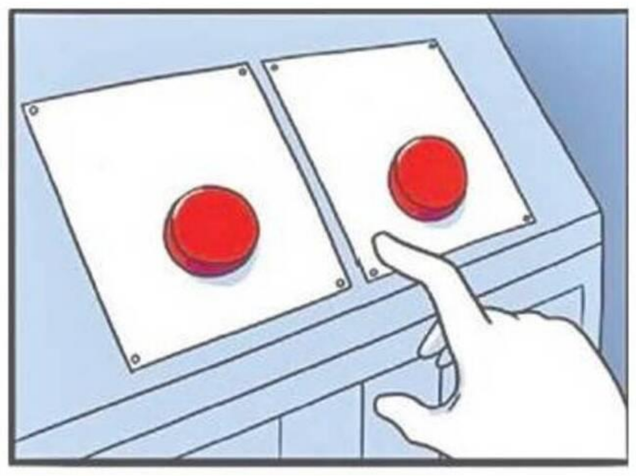
কিআ মিম কনটেস্ট ৭

সারা দিন তো মিম দেখেই কাটাও। এবার মিম বানিয়ে পাঠাও। নিচে আমরা একটা মিমের ছবি দিলাম। তোমরা ক্যাপশন লিখে পাঠাও। নিয়মটা খুব সহজ। কীভাবে পাঠাতে হবে, তা বিস্তারিত লেখা আছে নিচে।

নিশাত
এইচএসসি পরীক্ষার্থী, হলিক্রস কলেজ, ঢাকা



.....





নিয়মটা আগের মতোই। ওপরের ছবিটা ভালোভাবে দেখো। তারপর ফাঁকা বক্সে কী হবে, তা লিখে পাঠাও কিআর ই-মেইলে। বক্সে কী লেখা হবে, শুধু সেটাই লিখবে ই-মেইলের বডিতে। আর সাবজেক্টে লিখবে—'কিআ মিম কনটেস্ট ৬'। লেখার সঙ্গে তোমার নাম, ঠিকানা, মুঠোফোন নম্বর, স্কুলের নাম, শ্রেণি আর ঠিকানা অবশ্যই পাঠাবে। মিম পাঠানোর শেষ সময় **২০ আগস্ট**। মিম কনেটেস্টের বাইরেও তোমরা নিজের বানানো মিম পাঠাতে পারো। সে ক্ষেত্রে ই-মেইলের সাবজেক্টে লিখবে—মিম।

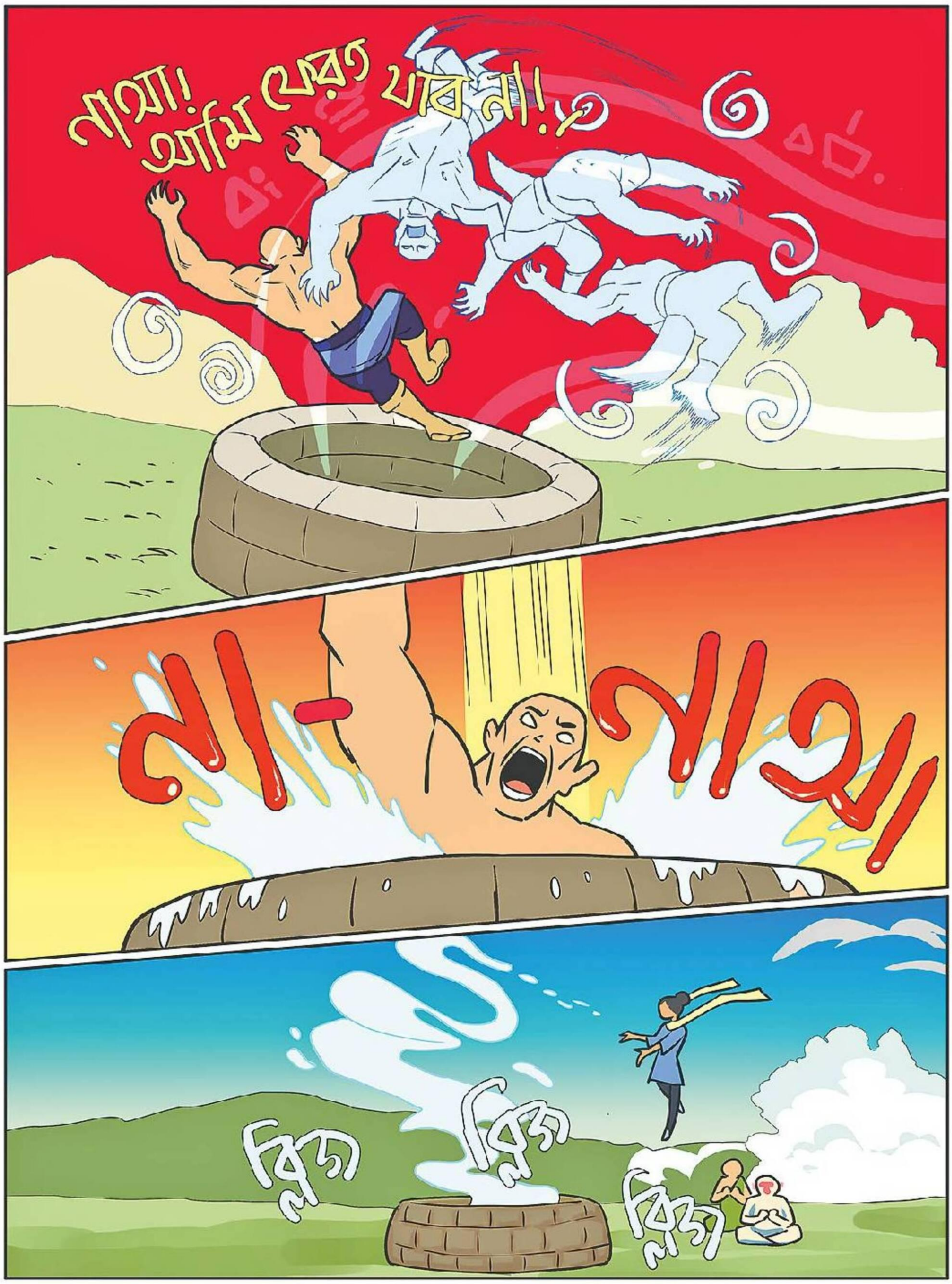
তোমাদের পাঠানো সেরা মিমগুলো ছাপা হবে কিশোর আলোয়।


রুচি
গল্প ও পেনসিল : মেহেদী হক
ইঙ্ক ও রং : সব্যসাচী চাকমা
জাদুশিলা
রহস্য
পর্ব : ১৩
না। এত 'সময়-বন্ধন' আমাকে আবার অতীতে নিয়ে যাবে।
কোনোভাবেই এটা হতে দেব না
বাধা আসবে


RUCHI EXPLORE LIMITLESS
চলো অজানার পথে
মনোমুগ্ধকর স্থানসমূহের ছবি, ভিডিও, ভ্রমণ অভিজ্ঞতা আর প্রয়োজনীয় টিপস জানতে স্ক্যান অথবা ভিজিট করুন-
www.ruchiexplorelimitless.com
স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ
রুচি


ابা
ابা
ابা
..লে


বাড়িয়ে নিন
স্বাদ
রুচি
সস্ এবং কেচাপ
সবই মজা লাগে যে
স্কয়ার
ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ


নাহ্! আমি হেরে যাব না!
ঝিম
ঝিম
ঝিম


কোন্‌টা ছেড়ে
কোন্‌টা খাবো?
রুচি
পটেটো ক্র্যাকার্স
স্কয়ার


ঝিড়া
ঝিড়া
ঝিড়া
উহ!
চলবে...

কিসের আওয়াজ?
নিশ্চয়ই কেউ ঝুরিভাজা খাচ্ছে!
ফ্রেযার
ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ

রুচি
ঝুরিভাজা
রুচি ঝুরিভাজা
দারুণ কুড়মুড়ে! দারুণ মচমচে!

Reedisha
ILUBiLU
Wafer

অ্যাডভেঞ্চার অব ইলু বিলু

পর্ব : ৫৫

লেখা : আদনান মুকিত
আঁকা : সব্যসাচী চাকমা



উত্তর দাও উপহার নাও

- **লোকজন কম আসে কার কাছে?**
  ক. টুইটি খ. দাদু
- **পিৎজা অর্ডার করল কে?**
  ক. ইলু খ. বিলু

সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে ৩ জনকে দেওয়া হবে উপহার।
উত্তর পাঠানোর ঠিকানা : **অ্যাডভেঞ্চার অব ইলু বিলু**
রিদিশা ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড, ৩৬ শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি তেজগাঁও বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২০৮। অথবা,
Email: badsha.rfbl@groupreedisha-bd.com

অ্যাডভেঞ্চার অব ইলু বিলু - গত সংখ্যার বিজয়ী

নওরিন নেওয়াজ, নবম শ্রেণি, যশোর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, যশোর
নাজহা জারিফ, দশম শ্রেণি, খুলনা জিলা স্কুল, খুলনা
আজমাউল হোসেন, সপ্তম শ্রেণি, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম

* শর্ত প্রযোজ্য

Reedisha
ILUBiLU
Wafer



টুইটি, তুই ফ্রেশ হয়ে নে। ভালো লাগবে। আর আঙ্কেল-আন্টিকে কল কর। এতক্ষণে ওনাদের ফ্রি হয়ে যাওয়ার কথা।

তা-ই তো। ভুলেই গেছি আমি।

আচ্ছা, টুইটিদের এই বাড়িটা বেশ পুরোনো। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, এই বাড়িটা নিয়েই কোনো ঝামেলা হয়েছে।

কী রকম?

আরে বোকা, সেটা তো জানি না। জাস্ট মনে হলো।

ভাবতে থাক, পিৎজা অর্ডার দিয়েছি। এলে ডাকিস। আমি দেখি টুইটি কী করে।

তোমরা কারা ভাই?

এই লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছি।

বিলু! এদিক আয় তাড়াতাড়ি!

এই লোকটাকে চিনতে পেরেছি। এ তো শীর্ষ সন্ত্রাসী কবজি কাটা মন্টু!

হোয়াট! কী বলিস! এই লোক এখানে কেন এল!

চলবে

দেখা

আঁকা ও লেখা :
তানভীর আহমেদ




৫ দিন পর
১২টা বাজতে ৩ মিনিট বাকি। কিন্তু ভূত কই! এবার তো মনে হচ্ছে শুভর গাঁজাখুরি গল্পগুলো বিশ্বাস করা উচিত হয়নি।
বসে বসে এই একেকটা হেলিকপ্টার সাইজের মশার কামড় খাচ্ছি।
ছাই!
ভূত না ছাই আসবে। মাঝখান থেকে ডেঙ্গু না হয়ে যায় আমার। শুধু শুধু...


ওরে বাবা, এত জোরে কিসে কামড় দিল! আমার টর্চটা কই! জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে জায়গাটা।
টর্চ, টর্চ!
বাবু
বাবা!

এ কীভাবে সম্ভব! বাবা, তুমি তো ২ মাস আগে...

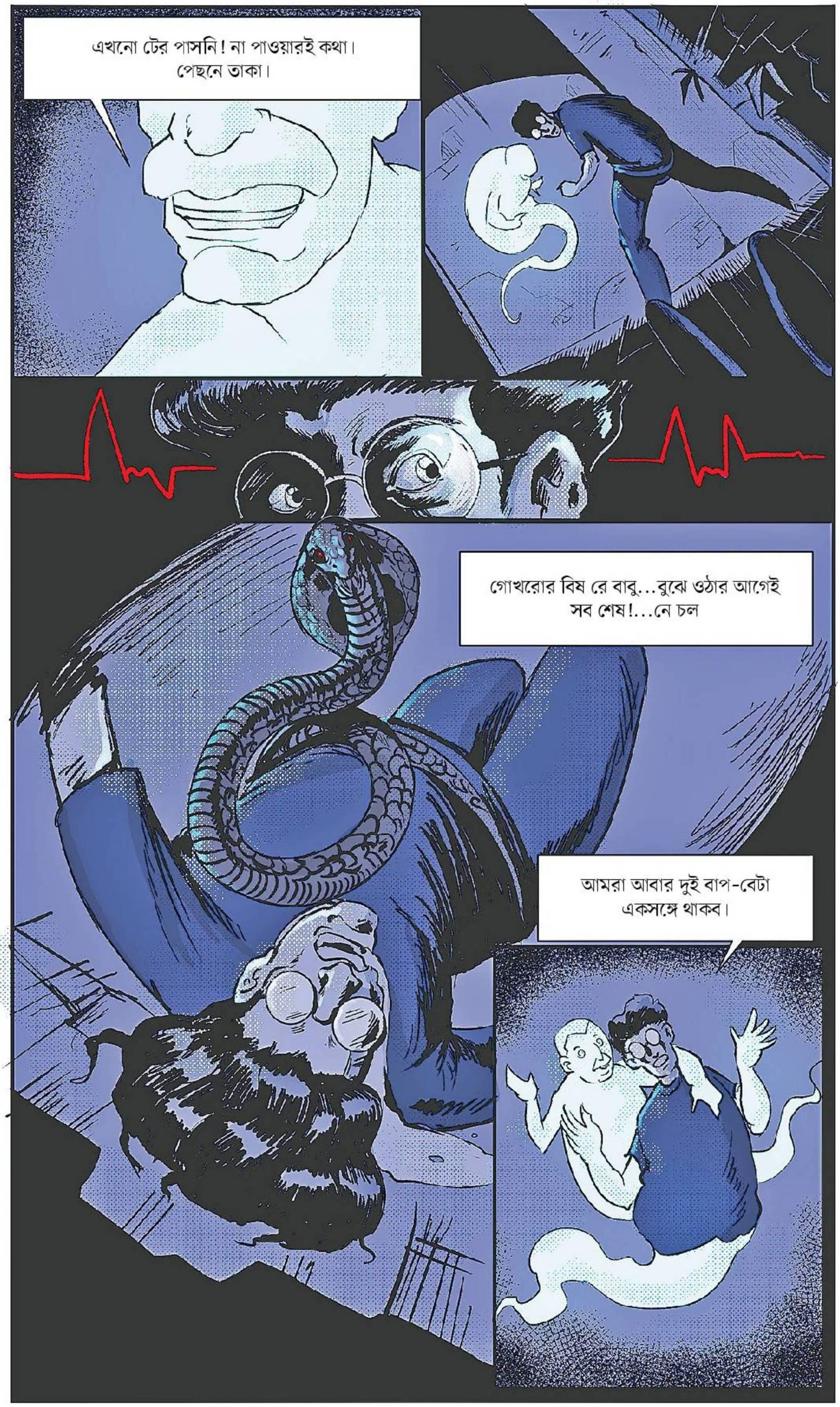
মারা গিয়েছিলাম। হ্যাঁ রে বাবু, তার পর থেকেই তো আমি এইখানে। এই বাড়িতে।

এই বাড়ি হলো মৃতদের আড্ডাখানা...মৃতরা আসে এখানে আড্ডা দিতে। গভীর রাত থেকে এই আড্ডা চলে ভোর অবধি।

আমাদের কোনো জীবিত মানুষ দেখতে পায় না, শুধু আমাদের শব্দ শুনতে পায়।

ওটার কথা জানতে পেরেই মনে হয় এসেছিস ভূত ধরতে। হা হা হা...

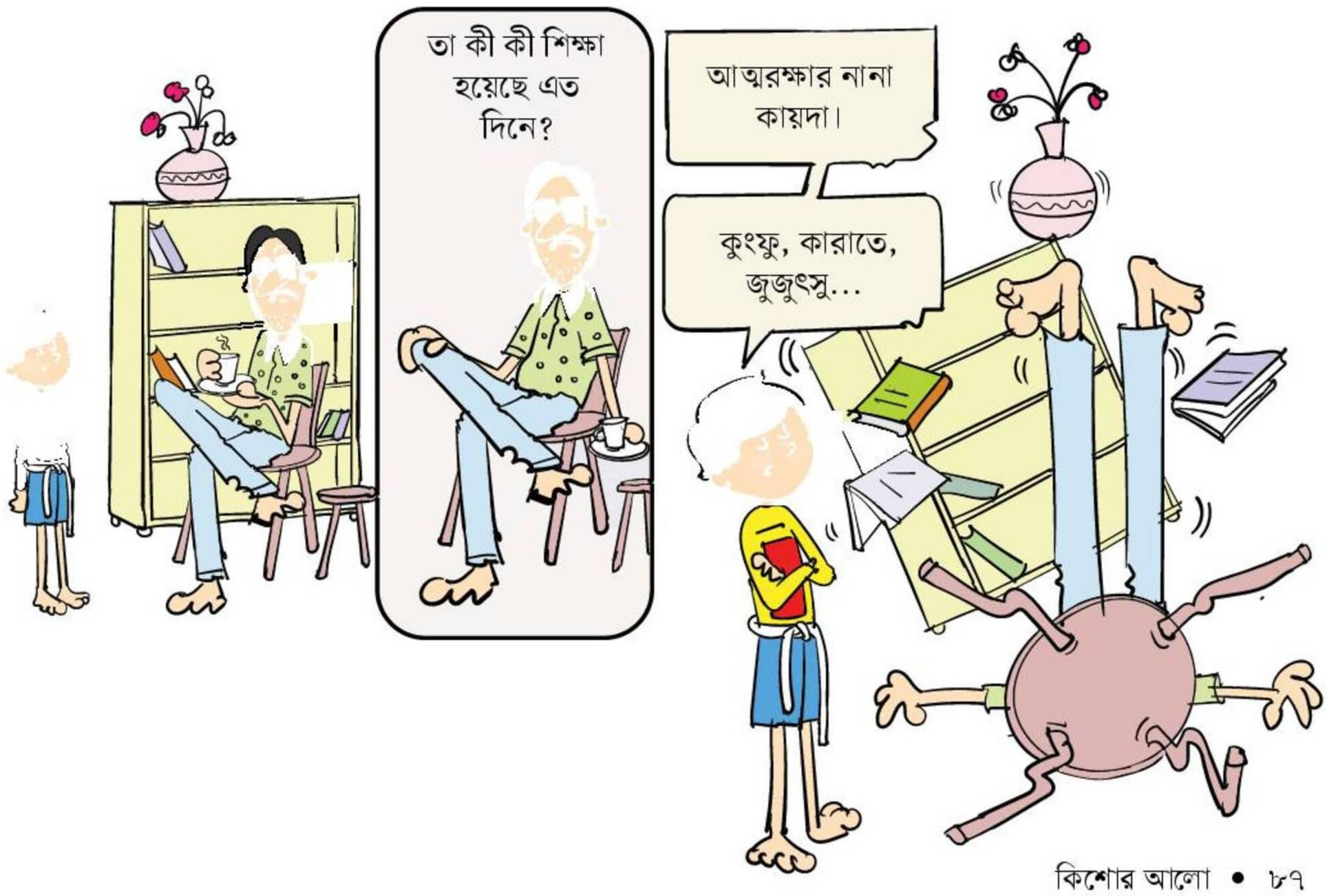
জীবিত মানুষ দেখতে পায় না মানে! তাহলে আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি কীভাবে!


এখনো টের পাসনি! না পাওয়ারই কথা।
পেছনে তাকা।
গোখরোর বিষ রে বাবু...বুঝে ওঠার আগেই
সব শেষ!...নে চল
আমরা আবার দুই বাপ-বেটা
একসঙ্গে থাকব।


এত দিনে এসে গৃহশিক্ষকের কী দরকার পড়ল, কিছুতেই বুঝতে পারছি না কাকুন।
বাসব রায়

এত দিনের শিক্ষা!


তা-ও আবার অঙ্কের। কোনো মানে হয়! অঙ্ক তো আমার কাছে ছেলেখেলা, যোগ-বিয়োগে আমি সুপারম্যান!
যাক গে যাক। আমার আর কিসের ভাবনা।
হাঃ
দীর্ঘশ্বাস
মারধর খাওয়ার চান্স নেই, কী বলো?

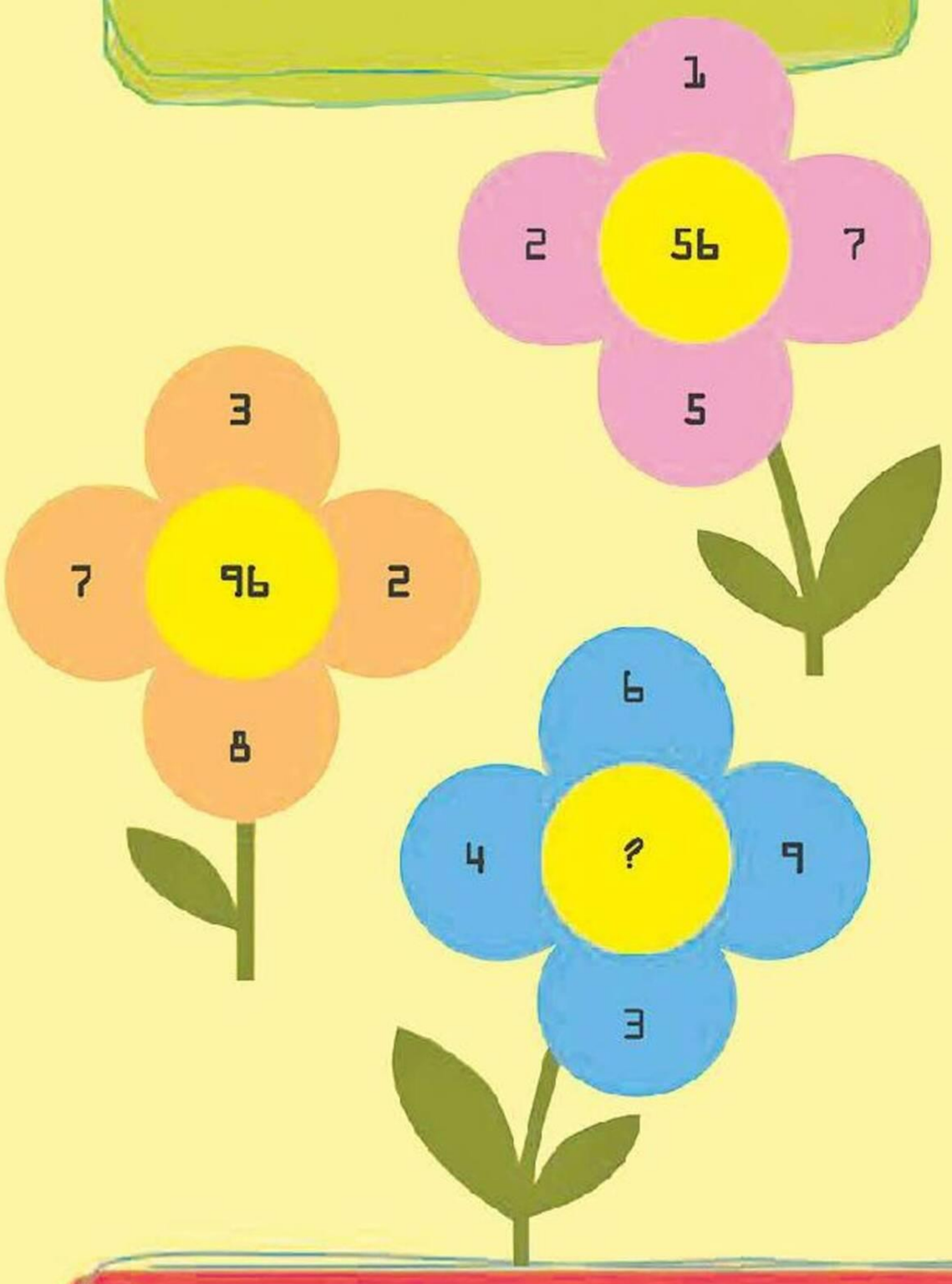

তা কী কী শিক্ষা হয়েছে এত দিনে?
আত্মরক্ষার নানা কায়দা।
কুংফু, কারাতে, জুজুৎসু...

মাথা খাটিয়ে সমাধান করো

তুমি প্রতিদিন বীজগণিত ব্যবহার করো, কিন্তু টেরই পাও না। এখানে কিছু ধাঁধা আছে, সেগুলো সমাধান করতে হলে তোমাকে বীজগণিত ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু প্রতিনিয়ত আমরা এসব সমস্যার সমাধান করি বলে ভয় লাগে না! অনেক সময় বুঝতেই পারি না যে এটা বীজগণিত!

ফুলের পাপড়ির সংখ্যা

নিচের প্রতিটি ফুলের পাপড়ির সংখ্যা একই নিয়মে যোগ ও গুণ করে মাঝের সংখ্যাটি তৈরি করা হয়েছে। তুমি কি এই নিয়মটা বের করে তৃতীয় ফুলের উত্তর বলতে পারবে?





কেক বানাই

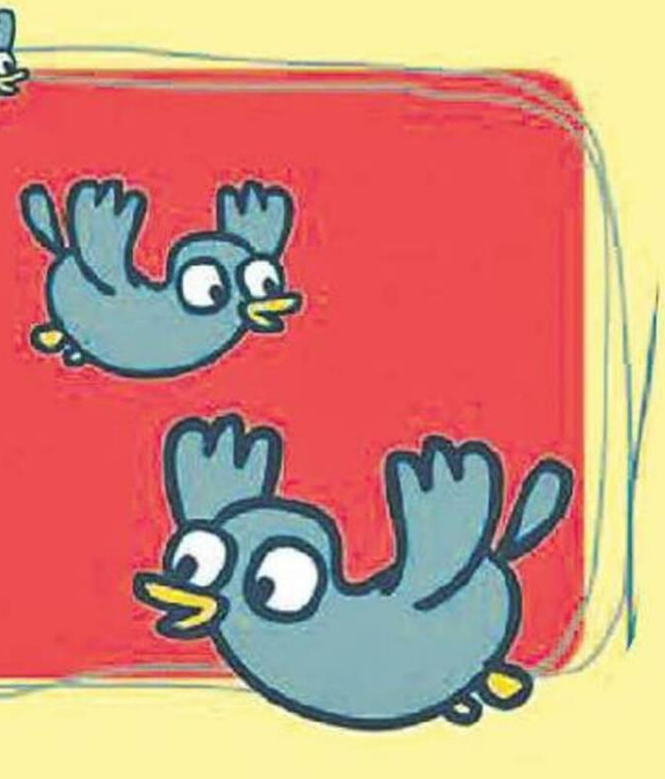
জেনি তার বন্ধুর জন্মদিনে একটা কেক বানাবে। ওর কাছে কেক বানানোর জন্য এই জিনিসগুলো আছে :

- ১৬ চামচ মাখন
- ২ কাপ চিনি
- ৪টা ডিম
- ৪ কাপ ময়দা

শেষ মুহূর্তে জেনি দেখল যে ওর কাছে যথেষ্ট ডিম নেই। দোকানপাট সব বন্ধ। তাই ও ঠিক করল, ৩টা ডিম দিয়েই কেকটা বানাবে। এখন বলো তো, এই হিসাব অনুসারে জেনিকে কতটুকু মাখন, চিনি আর ময়দা ব্যবহার করতে হবে?

পাখির ওড়াউড়ি

সামান্তা পার্কে ১০০ বছরের বেশি বয়সী একটা বটগাছ ও একটা সেগুনগাছ আছে। দুটো গাছেই কিছু পাখি বসে আছে। যদি বটগাছ থেকে একটা পাখি সেগুনগাছে উড়ে যায়, তাহলে দুটো গাছেই পাখির সংখ্যা সমান হবে। এখন বলো তো, দুটো গাছে পাখির সংখ্যার পার্থক্য কত?



ভারসাম্য

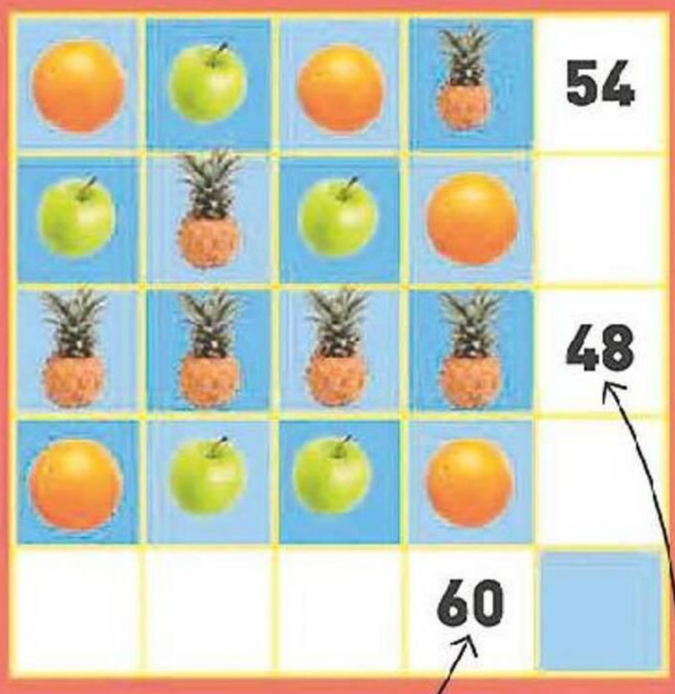
দাঁড়িপাল্লা নিশ্চয়ই চেনো। কোনো কিছু মাপার জন্য এটা ব্যবহৃত হয়। দাঁড়িপাল্লার দুই দিকে সমান জিনিস থাকতে হয়। নিচে তিনটা দাঁড়িপাল্লা আছে। এখন প্রথম দুটি দেখে বলো তো, তৃতীয় দাঁড়িপাল্লাকে সমান করতে কতগুলো গলফ বল লাগবে?



ফলের প্রতিযোগিতা

এই ছকে প্রতিটি ফলের আলাদা আলাদা সংখ্যা আছে। তুমি কি বলতে পারবে, কোন ফলের সংখ্যা কত? প্রতিটি ফলের সংখ্যা বের করে ফাঁকা ঘরগুলো পূরণ করো তো।

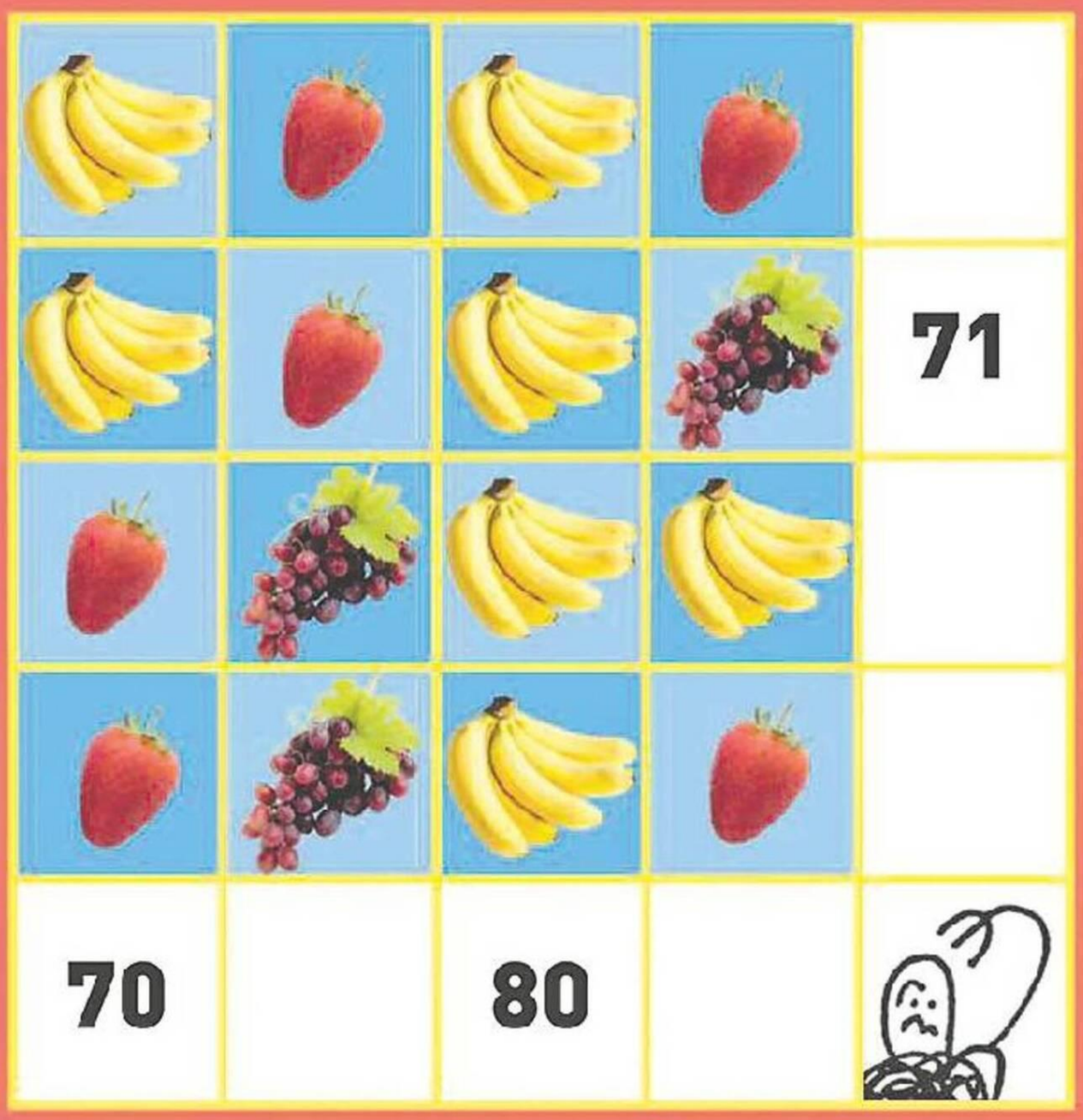
সামান্য সাহায্য



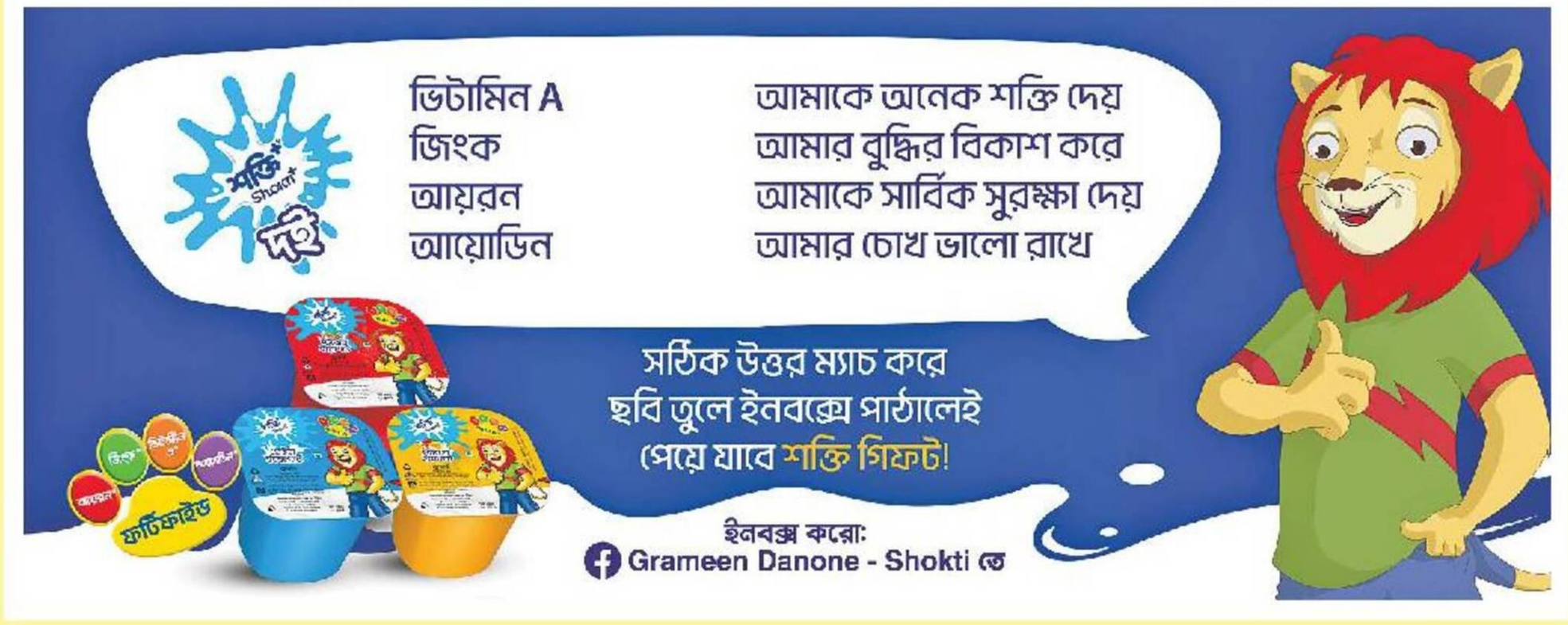
এখানে কয়টা আনারস আছে, তা হিসাব করে সমাধান করো

আনারসের মূল্য বের করতে পারলে কমলার মূল্যও পেয়ে যাবে

নিজে চেষ্টা করো

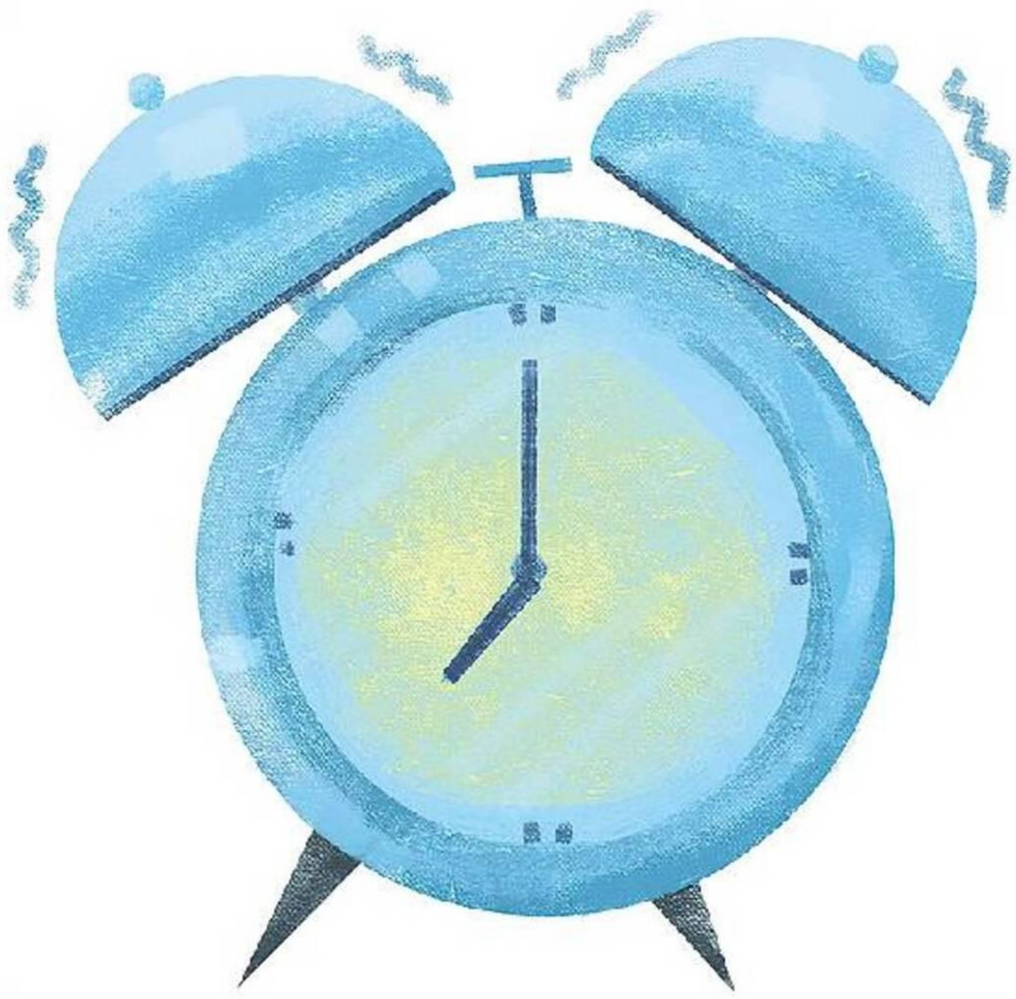


হাউ টু বি আ ম্যাথ জিনিয়াস অবলম্বনে **কাজী আকাশ**



মাথা খাটাও

আড়ং বেভারেজ
Milk for Good



১. আমার একটি বিশেষ ঘড়ি আছে। ঘড়িটি প্রতি ঘণ্টায় ৫ মিনিট দ্রুত চলে। আজ সকাল ৭টায় যদি ঘড়িটি সঠিক সময়ে সেট করি, তাহলে আগামীকাল সকালে একই সময়ে ঘড়িটি কত সময় দেখাবে?



২. তোমার কাছে একটি ৮ x ৮ গ্রিডের চকলেট বার আছে। তুমি একবারে যেকোনো একটি সোজা লাইন বরাবর চকলেট ভাঙতে পারো। কতবার চকলেটটিকে ভেঙে ৬৪টি টুকরায় পরিণত করতে পারবে?





৩. কোন তিনটি পূর্ণসংখ্যাকে গুণ করলে এবং যোগ করলে একই ফল পাওয়া যায়? (সংখ্যাগুলো ১ বা তার চেয়ে বড় হতে হবে)।

৪. তোমার কাছে কিছু ১০ টাকার নোট এবং কিছু ২০ টাকার নোট আছে। মোট নোট ২১টি। সব কটি নোট মিলে হবে ৩০০ টাকা। তাহলে তোমার কাছে কোন নোট কয়টা আছে?



গ্রন্থনা : **কিআ প্রতিবেদক**
অলংকরণ : **সাফায়েত সাগর**



৫. একটি খামারে কিছু খরগোশ আর কিছু মুরগি আছে। সব কটির মাথার সংখ্যা ৩৫ এবং পায়ের সংখ্যা ৯৪। তাহলে খামারে কয়টি খরগোশ ও মুরগি আছে?

মাথা খাটিয়ে বের করো গণিতের ধাঁধার উত্তরগুলো। তারপর নিচের কুপনটা পূরণ করে পাঠিয়ে দাও কিশোর আলোর ঠিকানায়। খামের ওপর অবশ্যই লিখবে : গণিতের ধাঁধা, কিশোর আলো। সেরা তিনজন বিজয়ীর জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। কুপনটি পাঠাতে হবে ২০ আগস্টের মধ্যে। চাইলে কিআর ই-মেইলেও উত্তর পাঠাতে পারো। তাহলে আজই বসে পড়ো গণিতের ধাঁধার সমাধানে।

গতবারের সমাধান

১. ঘড়িতে ৫ ও ৬ যোগ করে হয় ১১, কিন্তু ৬ ও ৭ যোগ করে হয় ১৩। যেহেতু ১৩ নেই, তাই ১২-এর পরে ১টা হয়।

২. ৫ জন। শুধু অ্যাংলেট ৩ জন, শুধু বুট ১ জন ও দুটোই পরেছে ৩ জন। মানে মোট ৭ জন কিছু না কিছু পরেছে। তাহলে খালি পায়ে খেলছে ১২ - ৭ = ৫ জন।

৩. দুজন বাবা আর দুজন ছেলে মানে ওখানে মোট ৩ জন আছে। মানে দাদা, বাবা ও ছেলে।

৪. ওদের বয়স যথাক্রমে ২, ৫ ও ৭ বছর। তাহলে বয়সের পার্থক্য ৭ - ৫ = ২ বছর, ৫ - ২ = ৩ বছর ও ৭ - ২ = ৫ বছর। অর্থাৎ সবই মৌলিক সংখ্যা।

৫. ৫০ ভাগ। কারণ, আগের ফলাফলের ওপর সম্ভাবনা নির্ভর করে না।

গণিতের ধাঁধা ৭৩-এর বিজয়ী

- **তানজিম মাহফুজ**
  নাটোর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, নাটোর
- **নূর-এ-জান্নাত**
  আফরোজ খান মডেল স্কুল, ময়মনসিংহ
- **আহনাফ ওয়াসিফ**
  মসজিদ মিশন একাডেমি, রাজশাহী

‘গণিতের ধাঁধা ৭৪’-এর উত্তর পাঠাও

নাম .....

বয়স ..... শ্রেণি..... ফোন .....

স্কুল-কলেজ .....

ঠিকানা .....

.....

এখানে কাটো

পাঠাবে এই ঠিকানায়

গণিতের ধাঁধা

কিশোর আলো, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ই-মেইল : **editor@kishoralo.com**

আড়ং ডেইরি
Milk for Good



স্মরণ, আবদার আর পরামর্শের আড্ডা

কিআ অনলাইন মিটিংয়ে কী কী প্রশ্ন করব, তা লিখে রেখেছি, যেন ভুলে না যাই। সকাল থেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি কখন বেলা ৩টা বাজবে। শুরু হবে অনলাইন কিআড্ডা। সভা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লিখে রাখা সব প্রশ্ন করে ফেলব।

অনেক অপেক্ষার পর বেলা ৩টায় কিআড্ডার গুগল মিটে ঢুকতে পারলাম। ঢুকেই দেখি চমক। সবাইকে স্বাগত জানাতে বসে আছেন আনিসুল হক। সবার আগে হাত তুললাম। ভাবছিলাম, প্রশ্নগুলো আমিই আগে করে ফেলি। কিন্তু আমার আগেই কিআ সম্পাদক কথা শুরু করলেন। যে যার বাসায় বসা, আমরা তখন চুপ। প্রশ্ন করার কথা ভুলেই গেছি। শুরুতেই মাইলস্টোন স্কুলের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত সবার জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া চেয়ে প্রার্থনা করলেন আনিসুল হক।

আনিসুল হক আমাদের বোঝালেন, এত বড় আঘাতের পরও কীভাবে আমরা এই শোক থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। এমন পরিস্থিতিতে কী করা উচিত।

এই পর্ব শেষ করেই কিআ সম্পাদক কিআ কার্যালয়ের সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কিশোর আলোর সহযোগী সম্পাদক আদনান মুকিত, জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক আহমাদ মুদ্দাসসের, প্রদায়ক আব্দুল ইলা ও নওশিন শারমীন। তারপর শুরু হলো কিআর ভূত সংখ্যা নিয়ে আলোচনা।

ভূত সংখ্যা নিয়ে সবাই মতামত দিতে শুরু করল। একে একে সবার প্রশ্নের উত্তর দিলেন আদনান মুকিত ও আহমাদ মুদ্দাসসের। নতুন বেশ কিছু আইডিয়া দিল অংশগ্রহণকারীরা।

এর মধ্যেই কেউ কেউ জানতে চাইল কীভাবে লেখা পাঠাবে, কেউ পরের সংখ্যায় আরও ধাঁধা চাইল, আবার কেউ জানাল নতুন ধারাবাহিক চালুর অনুরোধ। কয়েকজন তো এটাও বলল, তারা কী কী বিষয়ে আগ্রহী ও কোন কোন বিষয়ে আরও লেখা চায়। দেখলাম, একজন আমাদের সব আবদার, প্রশ্ন আর পরামর্শগুলো লিখে নিচ্ছিল, যেটা দেখে বেশ ভালো লাগল।

জানিয়ে রাখি, প্রতি মাসেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে কিশোর আলোর অনলাইনে আড্ডার। দেশের যেকোনো প্রান্তের পাঠক খুব সহজে যুক্ত হতে পারবে কিশোর আলোর সঙ্গে। পাশাপাশি কিআ কার্যালয়ে অফলাইন আড্ডা তো থাকছেই। অনলাইন কিআড্ডায় অংশ নিতে নিবন্ধন করো :
www.kishoralo.com/4zrv2pfcmh

লেখা : আসহাবিল ইয়ামিন

● আয়োজন

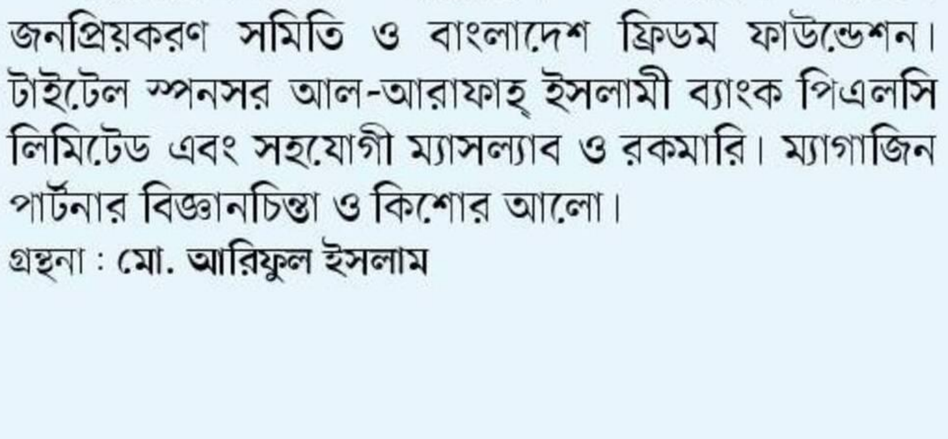
আগস্ট মাসজুড়ে অনুষ্ঠিত হবে বিডিজেএসও

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াড। এরই মধ্যে রেজিস্ট্রেশন শেষ হয়েছে। এই অলিম্পিয়াডের মাধ্যমে ২৩ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিয়ার ২২তম আন্তর্জাতিক জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডের জন্য বাংলাদেশ দল নির্বাচন করা হবে।

বিডিজেএসও তিন ক্যাটাগরিতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাইমারি : তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি। জুনিয়র ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি। সেকেন্ডারি নবম ও দশম শ্রেণি, এসএসসি ২০২৫ এবং একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা (তবে ১ জানুয়ারি ২০১০ সালের পরে জন্ম হতে হবে)।

বিডিজেএসওতে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান—এই তিন বিভাগ থেকে মোট ১০-১২টি প্রশ্ন থাকে, যা সমাধানের জন্য এক থেকে দেড় ঘণ্টা সময় পাওয়া যায়। বিস্তারিত জানা যাবে online.bdjso.org ওয়েবসাইটে।

দেশের ছয়টি বিভাগীয় শহরে আগস্ট মাসজুড়ে বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডের আঞ্চলিক পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। যে বিভাগগুলোতে আঞ্চলিক পর্ব হবে না, তাদের জন্য ই-অলিম্পিয়াডের ব্যবস্থা থাকবে। এ ছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়ে স্কুল অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হবে।



আঞ্চলিক পর্বে বিজয়ীদের নিয়ে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় জাতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।

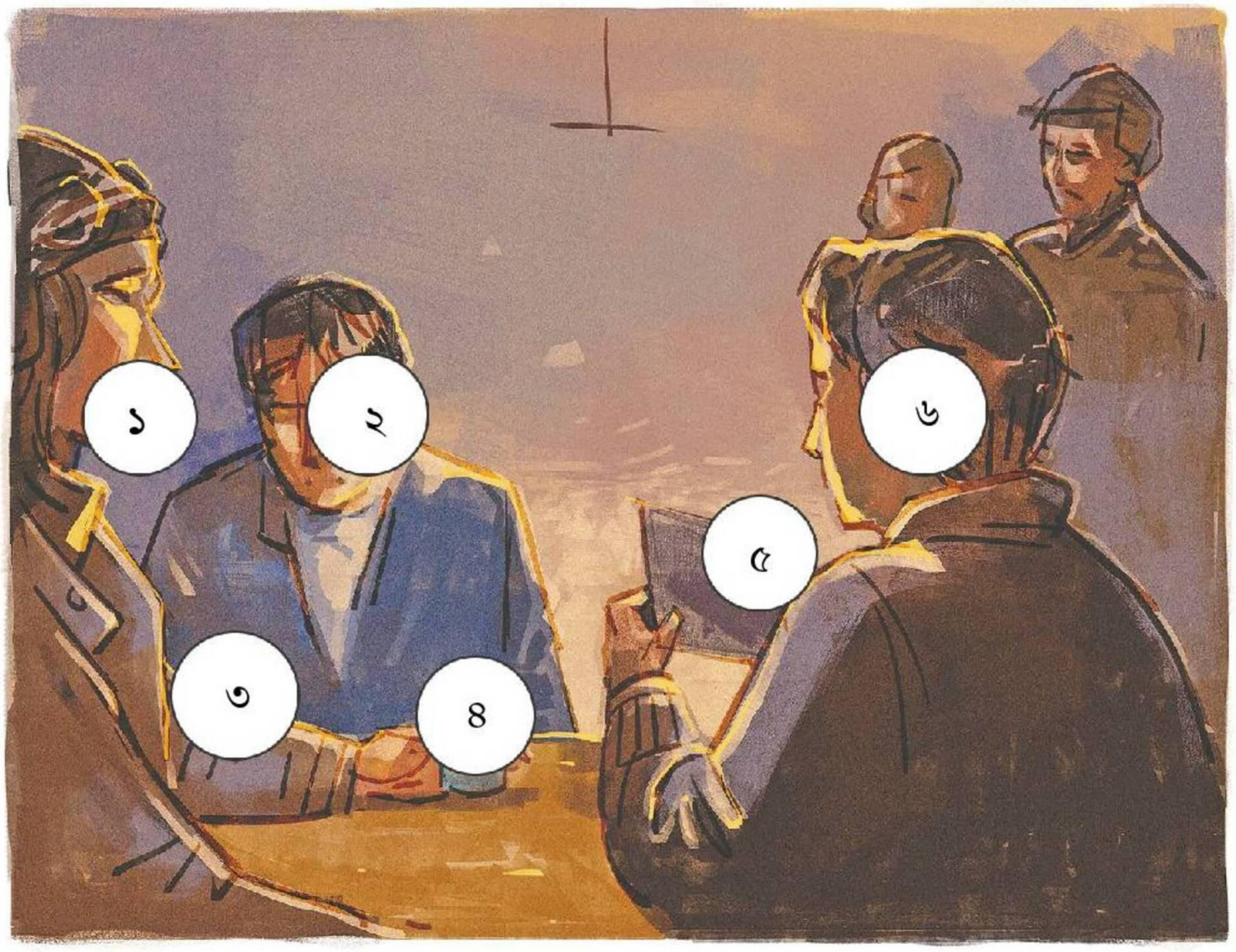
গত ১০ বছরে বাংলাদেশের আইজেএসও দল আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে ১৫টি রৌপ্য, ২৪টি ব্রোঞ্জসহ মোট ৩৯টি পদক জয় করেছে। তবে ২০২৪ সালের রোমানিয়ায় আয়োজিত ২১তম আসরে ভিসা জটিলতার কারণে বাংলাদেশ দল অংশ নিতে পারেনি। বিজ্ঞানের এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশের গৌরব ধরে রাখতে এ বছর ১১তম বিডিজেএসও অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

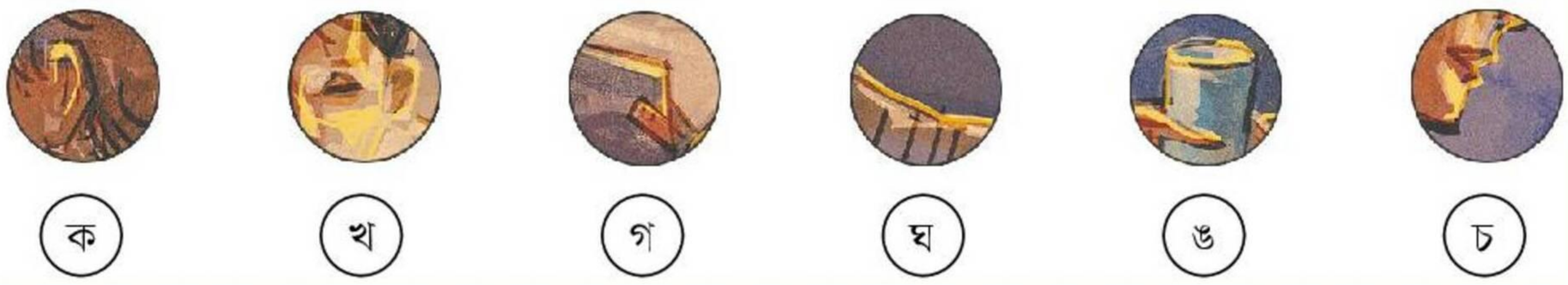
বিডিজেএসও-র আয়োজক বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতি ও বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন। টাইটেল স্পনসর আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি লিমিটেড এবং সহযোগী ম্যাসল্যাব ও রকমারি। ম্যাগাজিন পার্টনার বিজ্ঞানচিন্তা ও কিশোর আলো।

গ্রন্থনা : মো. আরিফুল ইসলাম

টুকরো মেলাও ৪৭

নিচের অলংকরণটির যে অংশগুলো নেই, সেগুলো মেলানোর চেষ্টা করো।





কাকুরো ৪৭

এখানে সাদা খালি অংশে তোমাকে এমন অঙ্ক বসাতে হবে, যেগুলোর লম্বালম্বি কিংবা পাশাপাশি যোগফল হবে ধূসর ঘরে থাকা সংখ্যার সমান। এ ক্ষেত্রে ধূসর ঘরের দাগের ওপরে সংখ্যা থাকলে তা হবে ডানের অঙ্কগুলোর যোগফল। আবার ধূসর ঘরের দাগের নিচে সংখ্যা থাকলে তা হবে নিচের অঙ্কগুলোর যোগফল। লম্বালম্বি কিংবা পাশাপাশি ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো একবারই বসানো যাবে।

			২৪	৭
	২৪	১৩ / ৭		
২১				
১৯				
৯				

কে ভিন্ন ৪৭

চারটি দেশের মানচিত্র দেওয়া আছে এখানে। বলো তো, এগুলোর মধ্যে কোনটি ভিন্ন এবং কেন?



ছায়াছবির ছায়া চেনা ৪৭

নিচের ছবিগুলো ভালোভাবে লক্ষ করো। পাশের কোন ছায়াটি ছবির সঙ্গে মেলে?



খেলাধুলা জিজ্ঞাসা ৬৮

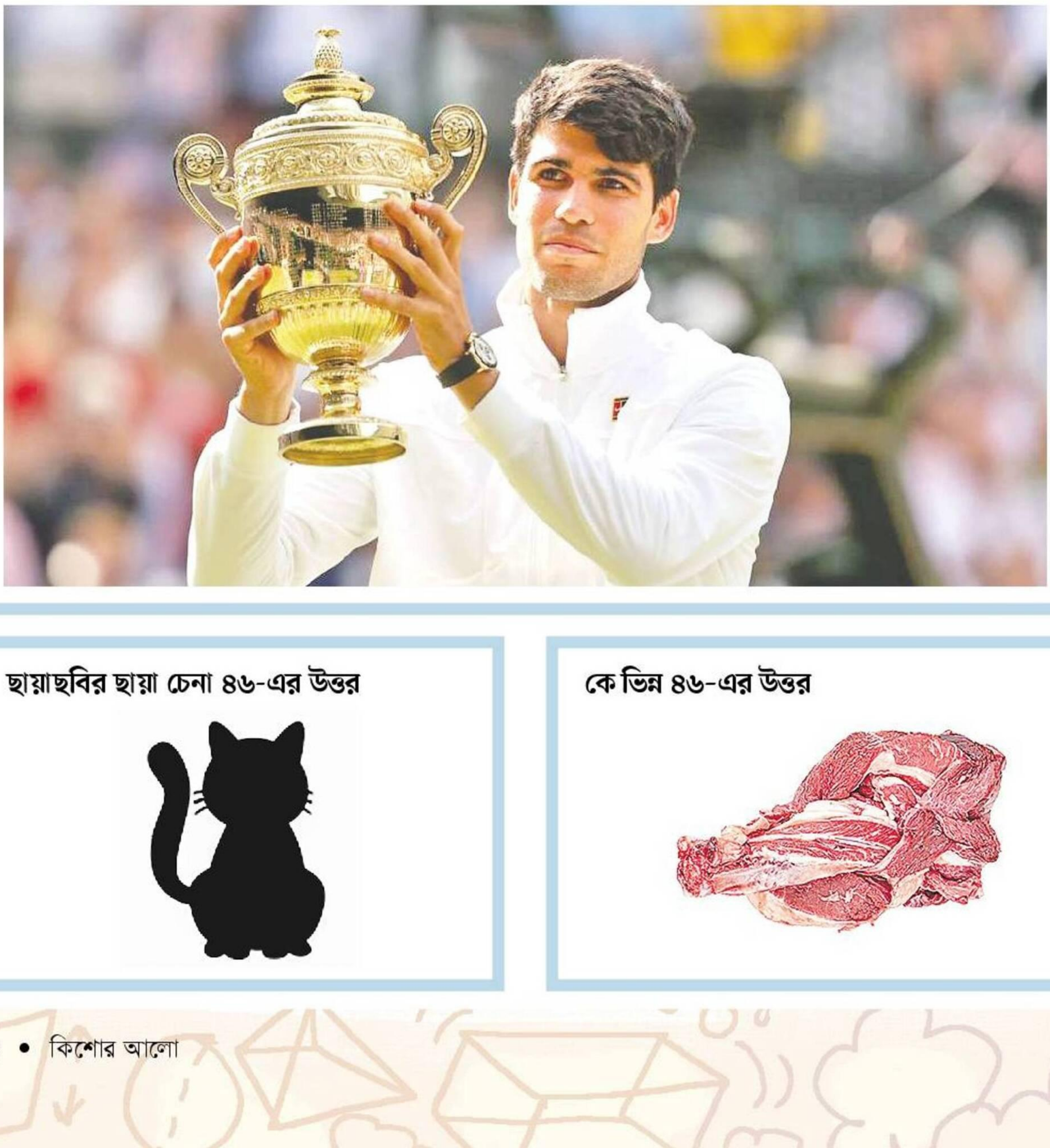
১. ২০২৫ সালের উইম্বলডনে পুরুষ এককে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কে?
ক. নোভাক জকোভিচ
খ. ইয়ানিক সিনার
গ. কার্লোস আলকারাজ

২. সর্বশেষ বাংলাদেশ-পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজে প্লেয়ার অব দ্য সিরিজে হয়েছেন কে?
ক. জাকের আলী
খ. শাদাব খান
গ. তানজিদ হাসান

৩. ২০২৫ সালের উয়েফা নারী ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জিতেছে কোন দল?
ক. স্পেন
খ. ইংল্যান্ড
গ. ইতালি

খেলাধুলা জিজ্ঞাসা ৬৭-এর উত্তর

১. ক. বিরাট কোহলি
২. গ. যুক্তরাষ্ট্র
৩. ক. দক্ষিণ আফ্রিকা



ছায়াছবির ছায়া চেনা ৪৬-এর উত্তর

কে ভিন্ন ৪৬-এর উত্তর

সুডোকু ৭৮

৪		৯				২		
৫			৪	৯	১	৮		
	৬	৮			২		১	
		৫		২			৮	
২	৩						৯	৪
	৮			৪		৭		
	২		৭			১	৫	
		৩	২	৬	৮			৭
		৬				৩		৮

নিয়মাবলি

ছকটি খাতায় এঁকে খালি ঘরে সংখ্যাগুলো বসিয়ে পাঠাও।

সংখ্যার পিরামিড ৪৭

ফাঁকা ঘরে এমনভাবে সংখ্যা বসাও যেন নিচের দুই ছকে থাকা সংখ্যার যোগফল হয় ওপরের সংখ্যা।

		৪৮	
৬			

সংখ্যার পিরামিড ৪৬-এর উত্তর

	২১১		
১১০		১০১	
৬০		৫০	৫১
৫০	১০	৪০	১১

কাকুরো ৪৬-এর উত্তর

		২৭	১২	
	৮ / ৮	৬	২	১৬
২৬	৬	৮	৩	৯
১৪	২	৪	১	৭
	১৫	৯	৬	

কুইজের উত্তর পাঠাও

কুইজের উত্তর চাইলে সব একসঙ্গে পাঠাতে পারো। অথবা তুমি যেগুলোর উত্তর পারো, সেগুলো আলাদা করে আলাদা কাগজেও লিখে পাঠাতে পারো। আগে কাগজে বড় করে কুইজের নাম লিখে পরে উত্তর এবং নিজের পূর্ণ নাম, ঠিকানা, মুঠোফোন নম্বর লিখতে হবে। এই কুপনটি পূরণ করে কেটে পাঠাতে হবে তোমার লেখা উত্তরের সঙ্গে। কুপনের ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। খামের ওপর প্রথমে বড় করে লিখতে হবে 'কুইজ', তারপর পাঠিয়ে দিতে হবে নিচের ঠিকানায়। প্রতিটি বিভাগে তিনজন করে কুইজ বিজয়ীর প্রত্যেকে পাবে রকমারি.com-এর সৌজন্যে ২০০ টাকার বই। কুইজের উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ **২০ আগস্ট**। ই-মেইলে পাঠানো উত্তর গ্রহণযোগ্য নয়।

নাম .....

শ্রেণি.....

ফোন .....

স্কুল-কলেজ .....

.....

পূর্ণ ঠিকানা .....

.....

.....

.....

.....

এখানে কাটো

পাঠাবে এই ঠিকানায়

কুইজ

কিশোর আলো

১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

সুডোকু ৭৭-এর উত্তর

৩	১	৯	৪	৫	২	৮	৭	৬
৮	৫	২	১	৭	৬	৯	৩	৪
৬	৭	৪	৮	৯	৩	১	৫	২
৭	২	৩	৯	৬	৪	৫	৮	১
৫	৯	৬	৭	৮	১	৪	২	৩
৪	৮	১	২	৩	৫	৭	৬	৯
৯	৩	৭	৬	৪	৮	২	১	৫
২	৬	৮	৫	১	৯	৩	৪	৭
১	৪	৫	৩	২	৭	৬	৯	৮

কিআ কিশোর আলো

জুলাই সংখ্যার

কুইজ বিজয়ী

তোমাদের পাঠানো অনেক উত্তরের মধ্য থেকে লটারিতে এই ২৪ জনের নাম উঠে এসেছে। তোমরা প্রত্যেকে পাবে রকমারি.com-এর সৌজন্যে ২০০ টাকার বই।

টুকরো মেলাও

- নাজাহ রাইয়ান, সেন্ট জন পল একাডেমি, ঢাকা
- মেহজাবিন আলম, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মোমেনশাহী, ময়মনসিংহ
- সৌগত সরকার, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী

কাকুরো

- জারিন আহমেদ, সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা
- মাহবুবা শাহাদাৎ, মরিয়ম নেসা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, রংপুর
- মো. নানজিব ফাহিম, বর্ণমালা আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা

কে ভিন্ন

- সুহাদা ইবনাত, কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর
- আলোফা তাহ্‌ফীম, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
- আহনাফ আবিদ, করতোয়া কালেক্টরেট আদর্শ শিক্ষা নিকেতন, পঞ্চগড়

ছায়াছবির ছায়া চেনা

- মির্জা আইশা আইনাজ, অগ্রগামী শিশুনিকেতন, ঢাকা
- জান্নাতুল মাওয়া, ভূঞাপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
- আসহাব তাজওয়ার, ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, ময়মনসিংহ

খেলাধুলার জিজ্ঞাসা

- মো. মুনতাসির ইবতিসাম, দিনাজপুর জিলা স্কুল, দিনাজপুর
- অনন্য জুন্নুরাইন, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা
- আরশিয়া তাহসিন, বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট স্কুল ও কলেজ, বগুড়া

সুডোকু

- কানিশা তাবাসসুম, ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও
- মারজিয়া হক, জামালপুর আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জামালপুর
- ফাতিমা জান্নাত, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

সংখ্যার পিরামিড

- নওহান নেওয়াজ, দাউদ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, যশোর
- দিহান মোল্লা, বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল
- নাবিলা সুলতানা, স্কুল অব লরিয়েটস ইন্টারন্যাশনাল, কুষ্টিয়া

কিআর মাঝে লুকিয়ে আছে

- মানহা মাহনূর, বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা
- তাইয়েবা জাহান, সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা
- কাজী আশরাফুল কবির, ছত্রপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

গত সংখ্যার উত্তর

টুকরো মেলাও ৪৬-এর উত্তর :

১. গ ২. চ
৩. খ ৪. ঙ
৫. ক ৬. ঘ

কিআর মাঝে লুকিয়ে আছে ১২৩-এর উত্তর :

১. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
২. ২০ মিনিট
৩. স্ট্রে কিডস

১২৪

কিআর মাঝে লুকিয়ে আছে

প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে পাঠাও।

১. ঋদ্ধি আর নৈঋতা কোন স্কুলে পড়ে?

২. মল্লিকদের বাসা কয় তলায়?

৩. ফুটবলার তহুরার ফুটবলে হাতেখড়ি কত বছর বয়সে?



কিশোর আলোর
গ্রাহক হও

৬০০ টাকা দিয়ে এক বছরের এবং ৩০০ টাকা দিয়ে ছয় মাসের গ্রাহক হলে কোনো ডেলিভারি চার্জ ছাড়াই ঘরে বসে পেয়ে যাবে কিশোর আলোর পরবর্তী সংখ্যাগুলো।

গ্রাহক হতে ভিজিট করো
https://subscription.palobd.com

অথবা কল করো ০৯৬৬৬-৭০১০৭০ নম্বরে
(ছুটির দিন ছাড়া যেকোনো দিন
সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত)

কিআ কিশোর আলো

/reedisha food & beverage limited

Reedisha™

Choco Fun

CHOCOLATE

Sandwich Cream Biscuits

Reedisha Food & Beverage Limited

Reedisha™

সবার স্বাদ বোঝে ...



মমতায় বাড়াই সম্পর্কের গভীরতা

৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্কগুলোকে মমতায় ঘিরে রেখেছে তীর।
তাইতো সরিষার তেল থেকে শুরু করে রেডি মিক্স পর্যন্ত সবকিছুতেই
বিশুদ্ধতার প্রশ্নে কখনোই আপস করেনি তীর।

ভিডিওটি দেখতে স্ক্যান করুন

www.citygroup.com.bd /TEER1972